পৃথিবীর ইতিহাস : প্রাচীন যুগ

মৌ লি ক লা ই ব্রে রী

সূচিপত্র

প্রাচীন গ্রীস

প্রাচীন রোম

তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে

প্রাচীন গ্রীস **ইতিহাস** বলতে বুঝতো 'বিশ্লেষণ' এবং 'প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা'। আমরা বলি, ইতিহাস হলো বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান যার দ্বারা বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে মানুষ কীভাবে জীবনধারণ করেছে, তাদের শ্রম কীভাবে পৃথিবীর রূপ পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের জীবনধারাও কি করে ও কেন ক্রমশ পরিবর্তিত হতে হতে আজকের এই বিশেষ রূপ লাভ করেছে।

প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাস আসলে **বিশ্ব-ইতিহাসেরই** একটা অংশমাত্র, অংশ সারা পৃথিবীর মানবেতিহাসের।

এখন এই বইটিতে তোমরা যা পড়তে যাচ্ছ তা হলো বিশ্ব-ইতিহাসের প্রথমাংশ — **প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস** — বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গের বৃহদায়তন প্রথম একটি বিভাগ। সুদূর অতীতে মনুষ্যজীবন কেমন ছিল তারই কাহিনী।

কিন্তু হাজার কি লক্ষ বছর আগে মানুষ কেমনভাবে জীবনধারণ করতো তা আমরা জানবো কোত্থেকে?

পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন সব সময়েই 'পায়ের চিহ্ন' রেখে গেছে, এর ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নি। এই 'পদচিহ্ন' ধরে ধরে পথ চলে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন দূর অতীতে মানুষের জীবন সত্যিই কীরকম ছিল।

'মূক চিহ্নের ভাষা'। সুদূর প্রাচীন কালেও মানুষ তাদের জীবনযাত্রার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে, বিভিন্ন ঘটনার তথ্যও। তারা লিখে গেছে গাছের বাকলে, পাথরের উপরে, মসৃণ পশুচর্মের উপরে এবং আরো নানান কিছুতে। পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে লেখাটি পাওয়া গেছে সেটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে। (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় 'কালপঞ্জী' দেখ। লক্ষ্য করো, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সহস্র বৎসরের ব্যবধান।)

অবশ্য প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে খুব কম। উপরন্তু আছে লিপি পাঠোদ্ধার করার সমস্যা। বহু লিপি রচিত হয়েছে শুধুমাত্র চিহ্ন দিয়ে, যা বর্তমানে কেউ কোথাও ব্যবহার করে না। এমন সব চিহ্ন লেখা হয়েছে এমন সব ভাষায় যে ভাষায় বহু পূর্ব থেকেই কেউ কোথাও কথা বলে না। তবু বিজ্ঞানীরা প্রাচীন পৃথিবীর বেশির ভাগ মানবগোষ্ঠীর লিপি পড়ে উঠতে পেরেছেন। পূর্বে অবোধ্য মূক লিপিচিহ্নও আজ আমাদের কাছে 'কথা বলে উঠেছে'। তারা বলেছে সুপ্রাচীন অতীতের মহাবিক্রমশালী রাষ্ট্রের কথা, বলেছে গণ-অভ্যুত্থানের কথা, জ্ঞানবিজ্ঞানের

লিখিত ইতিহাসের আকর-উপাদান। ১. প্রাচীন মিশরে পাথর খোদাই করে রচিত শিলালিপি। শিলালিপির মধ্যে বর্তমান দুটি শব্দ বর্ধিতাকারে বাঁদিকে ছেপে দেয়া হলো। তীরের সাহায্যে দেখানো হয়েছে শিলালিপির ঠিক কোনখানটায় কথাদুটো আছে। এই শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে মিশরীয় প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে বহুকিছু জানা সম্ভব হয়েছে। ২. মৃত্তিকাফলকের উপরে রচিত প্রাচীন লিপি। ৩. রোমে প্রচলিত প্রাচীন 'পুঁথি', যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য রাখা হতো কাঠের বাক্সে। (ইতিহাসের এই আকর-উপাদান সম্বন্ধে ক্রমশ এই বইতেই তোমরা যথাস্থানে সবিস্তারে জানতে পারবে।)

উদ্ভব সম্বন্ধে এবং আরো বহু জিনিস সম্বন্ধেই আমাদের অবহিত করেছে এইসব প্রাচীন লিপি।

যে সমস্ত লিপি থেকে বিজ্ঞানীরা ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছেন, সেগুলোকে বলা হয় **লিখিত ইতিহাসের আকর-উপাদান** অথবা **ঐতিহাসিক দলিল**। এরকম কয়েকটি উৎসস্থল বা দলিলের বিষয়বস্তুর সাথে তোমরা এ গ্রন্থে পরিচিত হবে।

বাঙ্ময় চিত্রাবলী ও বস্তুসামগ্রী। লিপি ব্যতিরেকে প্রাচীন মানুষ অন্য 'পদচিহ্ন'ও রেখে গেছে। পৃথিবীর বুক থেকে এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নি প্রাচীন মানুষের সমাধি, তাদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র, তাদের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ। গণপ্রবাদ বলে: 'আমাকে তোমার বাড়ি দেখাও, বলে দেবো কেমন আছো।' আর বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন: 'আমাদের প্রাচীন মানুষের হাড় দেখাও, আমরা বলে দেবো সে ছিল কেমন। প্রাচীন মানুষের জিনিসপত্র দেখাও আমাদের, অমনি বলে দেবো তারা কী করতো, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ছিল কীরকম, কীভাবে বেঁচেছিল তারা।' প্রাচীন যুগে অঙ্কিত ছবিও বহু কিছু জানায় আমাদের। কেন না ছবিগুলোর মধ্যে তখনকার লোকজনদের জীবনই বিধৃত হয়ে আছে: তাদের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ, সংগ্রাম, উৎসব, তাদের ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী — সব।

প্রাচীন মানুষের আঁকা ছবি আর তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদিকে বলা হয় **ঐতিহাসিক পুরানিদর্শন**। মানুষ তখনো লিপি আবিষ্কার করে নি। তারো

আগেকার এইসব নিদর্শন বিলুপ্ত না হয়ে মহাকালের পথ বেয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

পুরাকালের 'পদচিহ্ন' সন্ধানীর দল। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে, কোনো জিনিস বাইরে কয়েক দিন পড়ে থাকলেই তার উপর ধুলোর পাতলা আস্তরণ পড়ে যায়। প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের জিনিসপত্রের উপর হাজার হাজার বছর ধরে এভাবে ধুলোবালির পুরু স্তর জমা হয়, তার উপর ঘাস আর গাছপালা গজিয়ে ওঠে। সেজন্যই প্রাচীন মানুষজনদের জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়া মোটেই সহজ নয়। প্রথমে খুঁজতে হয় কোথায় ওরকম জিনিসপত্র আছে, তারপর খুঁজে পেলে তখন খননকার্য চালিয়ে তা উদ্ধার করে আনতে হয়।

'পুরানিদর্শনের' উপর নির্ভর করে যে বিজ্ঞান প্রাচীন মানুষের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চায় সেই বিজ্ঞানকে বলে **প্রত্নতত্ত্ব** — এর অর্থ 'প্রাচীন পৃথিবী সম্পর্কিত বিজ্ঞান'। আর যাঁরা খননকার্য চালান, পুরানিদর্শন বিশ্লেষণ ও গবেষণা

১

২

৪

৫
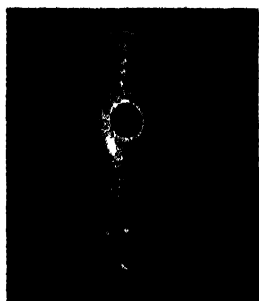
ঐতিহাসিক পুরানিদর্শন। ১. সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্মেনিয়ায় প্রাপ্ত কাঠের তৈরি গাড়ি। ২. গুহাগাত্রে অঙ্কিত আহত বাইসনের ছবি। ৩. পাথরের তৈরি কুড়ুল। ৪. প্রাচীন গ্রীসে আঁকা ছবি। ৫. রোমে একটি প্রাচীন স্মৃতিসৌধ। (এ সমস্ত ঐতিহাসিক পুরানিদর্শন থেকে যে কত কিছু জানা যায়, তা ক্রমশ তোমরা দেখতে পাবে।)

এই আলোকচিত্রটি অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের; তারা তাদের কুঁড়ের সামনে বসে আছে। অস্ট্রেলিয়ার আসল বাসিন্দারা অনুন্নত উপজাতির অন্যতম। ঔপনিবেশিকরা—যারা পরে এসে এদেশে বসবাস করতে শুরু করে, তারা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিন্দাদের বেশির ভাগই ধ্বংস করে ফেলেছে।

করেন, সেই সব বিজ্ঞানীকে বলা হয় **প্রত্নতত্ত্ববিদ**। প্রত্নতত্ত্ববিদরা যে সব পুরানিদর্শন খুঁজে পান সেগুলো সংরক্ষণ করা হয় যাদুঘরে।

চলো যাই, ঘুরে আসি 'দূর প্রাচীনে'। আমাদের এই পৃথিবীর দূরদূরান্তে কিছু দ্বীপ-উপদ্বীপে, কিছু জায়গায় এখনো প্রাচীন যুগের অধিবাসী রয়ে গেছে। সভ্যতাবিকাশের দিক থেকে তারা আমাদের অনেক পিছনে পড়ে আছে। এই কিছুকাল পূর্বেও তাদের কোনো লিপি ছিল না, তারা জানতো না ধাতুর ব্যবহার। আমরা তাদের নাম দিয়েছি **বর্বর আদিবাসী**। প্রাচীন পৃথিবীর আদিম মানবের সাথে এই বর্বর আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এখনো বহুলাংশে মেলে। বর্বর আদিবাসীদের গ্রামে গেলে বিজ্ঞানীদের মনে হয়, তাঁরা যেন হঠাৎ 'দূর প্রাচীনের' মধ্যে এসে পড়েছেন। তাঁরা এদের আচার-ব্যবহার, প্রথা ও ধর্মবিশ্বাস ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। এরকম একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বিখ্যাত রুশ পর্যটক মিক্লুখো-মাক্লাই।

পৃথিবীতে এখনো যে সব অনুন্নত মানবগোষ্ঠী রয়ে গেছে তাদের জীবনধারা লক্ষ্য করলে প্রাচীন পৃথিবীতে মানুষের জীবন কেমন ছিল সে সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে আমরা জানতে পারি।

? ১. প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে আমরা কী জানতে পারি? প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস জানার উৎস কী কী? ২. প্রত্নতত্ত্ব কী? ৩. তুমি কি পূর্বে কখনো প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো কিছু শুনেছো বা পড়েছো? ৪. ইতিহাস আর রূপকথার মধ্যে তফাৎ কী?

নিজে নিজে পড়া

ভালোভাবে যদি ইতিহাস পাঠ করতে চাও তাহলে ইতিহাস বইয়ে যা কিছু লেখা আছে এবং যে সব ছবি দেওয়া আছে সে সব কিছুই তোমাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে।

প্রথমেই মন দিয়ে এই গ্রন্থের সূচিপত্র (পৃ. ৩) দেখ। সমগ্র বইটি চারটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব বিভক্ত আবার কয়েকটি অধ্যায়ে (বইটিতে অধ্যায় আছে মোট ১৬টি), অধ্যায়কে ফের ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি পরিচ্ছেদে (এই বইয়ে পরিচ্ছেদসংখ্যা মোট ৬০টি). পরিচ্ছেদ বিভক্ত উপচ্ছেদে এবং উপচ্ছেদ হলো প্রয়োজনানুযায়ী এক বা ততোধিক অনুচ্ছেদের সমাহার। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু কিন্তু নতুন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রতি পরিচ্ছেদেই স্বতন্ত্র ও নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

সমস্ত পরিচ্ছেদেরই শিরোনামা আছে। শিরোনামা দেখলেই বোঝা যাবে তার অধীনস্থ উপচ্ছেদসমূহে কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ধরো প্রথম পরিচ্ছেদ-শিরোনামা — § ১; [§] চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে এটা একটা পরিচ্ছেদ। আর এর অন্তর্গত উপচ্ছেদে শুধু সংখ্যাবাচক অক্ষর দেওয়া হয়েছে; যেমন § ১-এর মধ্যে মোট ৫টি উপচ্ছেদ। তোমাদের বোঝার জন্যে আরো সহজ করে বলি: প্রথম অধ্যায়ে পরিচ্ছেদ আছে ৩টি এবং উপচ্ছেদ আছে মোট ১৪টি (যথাক্রমে ৫+৫+৪টি করে)।

বহু পরিচ্ছেদে তোমরা ঐতিহাসিক উৎসাদির উল্লেখ পাবে। লিখিতরূপে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিলাদি বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে কিংবা পরিচ্ছেদের শেষে ভিন্নধরনের অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পুরানিদর্শনসমূহের ছবিও দেওয়া হলো।

প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের জীবনযাত্রার পরিচয় যে সব চিত্রে দেওয়া হয়েছে, তা আমাদের সমসাময়িক আধুনিক শিল্পীদের আঁকা। ইতিহাসবিজ্ঞানের দৌলতে

অতীত সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি, ছবিগুলো তারই ভিত্তিতে অঙ্কিত হয়েছে। আদিম মানবের আঁকা ছবি আর আধুনিক শিল্পী-অঙ্কিত ছবির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট; অঙ্কিত চিত্রের নিচে তার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের শিল্পনিদর্শনের রঙিন আলোকচিত্রসমূহের সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে সংখ্যাবাচক অক্ষরের বদলে শব্দে লিখে। বইয়ের মধ্যে এসব ছবির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে: 'দ্র. রঙিন আলোকচিত্র'। আধুনিক শিল্পীদের আঁকা রঙিন ছবি নির্দেশিত হয়েছে সংখ্যাবাচক অক্ষরে। আর গ্রন্থের মধ্যে সে সব উল্লেখিত হয়েছে এভাবে: 'দ্র. রঙিন ছবি'।

পড়ার সময় বইয়ের সাথে যে মানচিত্র দেওয়া হয়েছে তা খুলে রেখে পড়বে, কখন কত নম্বর ম্যাপ মিলিয়ে দেখতে হবে, তা প্রয়োজনীয় স্থানে নির্দেশিত হয়েছে।

যদি দেখ, পরিচ্ছেদের পূর্বে প্রশ্নমালা রয়েছে, তা হলে সেগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো। আর যদি দেখ যে ভুলে গেছ, তাহলে যে সব পরিচ্ছেদে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর আছে তা খুঁজে বের করে ফের পড়ো। এই পদ্ধতিতে বইটি পড়তে পারলে দেখবে যে, নতুন জ্ঞাতব্য বিষয় আরো সুষ্ঠুভাবে জানতে পারছো এবং পূর্বে জানা জিনিসের সাথে নতুন জানা তথ্যাদির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছো।

সব সময়ে পরিচ্ছেদের সবটুকু একসঙ্গে পড়বে। তার মধ্যে যে জিনিসগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার এবং মনে রাখা প্রয়োজন তা হয় **মোটা হরফে।**

কোনো নতুন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছো কিনা সেদিকে নজর রেখো। ভৌগোলিক নাম যেগুলো বইয়ের ভিতরে পাবে সেগুলো মানচিত্রের মধ্যে খুঁজে বের করো। পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত অঙ্কিত চিত্র খুঁটিয়ে দেখো। যদি দেখ, কোনো জায়গায় ঐতিহাসিক দলিল পড়ার নির্দেশ দেয়া আছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা করবে এবং প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর ঐ দলিল থেকে বের করার চেষ্টা করবে।

পরিচ্ছেদ পড়বার পরে পরিচ্ছেদ-শেষে দেওয়া প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রস্তুত করবে। কঠিন প্রশ্নগুলোয় তারকাচিহ্ন(*) দেওয়া হয়েছে।

তোমার পঠিত পরিচ্ছেদ বই না দেখে নিজের ভাষায় বলতে চেষ্টা করো। প্রথমে একটি অনুচ্ছেদ পড়া হলে সেটি বই বন্ধ করে জোরে জোরে বলতে চেষ্টা করো, তারপরে পড়ো পরবর্তী অনুচ্ছেদ এবং একইভাবে সেটিও বলতে চেষ্টা করো; এইভাবে পরপর সব ক'টি অনুচ্ছেদ আলাদা-আলাদাভাবে পড়া এবং বলা হয়ে গেলে তারপর সব পরিচ্ছেদটুকু একসাথে পড়ে নিয়ে সবটাই একবারে বই না দেখে বলার চেষ্টা করবে। না, মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। একেকটি অনুচ্ছেদে কী বলা হয়েছে সেটাই নিজের ভাষায় শুধু বলবে। পঠিত বিষয়বস্তু একবার যদি নিজের ভাষায় গুছিয়ে বলা শিখতে পারো, তাহলে আলাদা অনুচ্ছেদ

ধরে ধরে আর বলতে হবে না, সমস্ত পরিচ্ছেদটাই তুমি একসঙ্গে বলে দিতে পারবে।

হ্যাঁ, বলার সময় কিন্তু সন-তারিখ, ব্যক্তি বা স্থানের নামধাম ভুললে চলবে না। এবং বলার শেষে তোমাকে উপসংহার টানতে হবে, অর্থাৎ সবটা জিনিস জানার পরে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হলো তা বলতে হবে। বইয়ের মধ্যে ছবি বা ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী বা দলিল দেখে যা বুঝেছো তার সাহায্যেও তুমি তোমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করবে।

ছোটোদের জন্য লেখা এরকম একটি সংক্ষিপ্ত-কলেবর গ্রন্থে প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানানো সম্ভব নয়। এরকম বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়াও ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা আরো অজস্র বই রয়েছে।

আদিম মানবের জীবনযাত্রা

প্রথম অধ্যায়

আদিম মানুষের সংগ্রহবৃত্তি ও তার শিকারী জীবন

§ ১. আমাদের পূর্বপুরুষের পরিচয় ও জীবনযাত্রা

১. আদিম যুগের মানুষ। এখন থেকে ২০ লক্ষ বৎসরেরও পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। মানুষের এখন যে আকৃতি তা থেকে তাদের আকৃতিগত পার্থক্য ছিল বিরাট, তারা দেখতে ছিল অতিকায় বানরজাতীয় জীব। তাদের কপালের হাড় ছিল নিচু এবং ঢালু মতো। মাথায় মগজ বানরদের তুলনায় পরিমাণে বেশি ছিল ঠিকই, তবে এখনকার মানুষদের চেয়ে তা ছিল অনেক কম। হাঁটবার সময় তারা সামনের দিকে ঝুঁকে জবুথবু হয়ে হাঁটতো। হাত এত লম্বা ছিল যে হাঁটুর নিচে ঝুলে থাকতো। আমরা যেমন হাতের আঙুল ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করতে পারি, তারা তা পারতো না। সেই সব আদিম মানুষ হাত দিয়ে কেবল সহজ দু-চারটে কাজ করতে পারতো, যেমন: মাটি খোঁড়া, হাতের মুঠোয় কিছু ধরা, আর কোনো কিছু ছুঁড়ে ফেলা।

তারা ছাড়া ছাড়া কিছু ধ্বনি কেবল উচ্চারণ করতে পারতো। সেই কিছু ধ্বনির দ্বারাই ভয় ও ক্রোধ তারা বোঝাতে সক্ষম হতো, সাহায্যের জন্য একে অন্যকে আহ্বানও জানাতে পারতো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাবধান করে দিতে পারতো কোনো আসন্ন বিপদে।

২. শ্রমের হাতিয়ার। হিংস্র বিশালাকার পশুর মতো পুরাকালের মানুষদের হাতের থাবা বিরাট ছিল না, নখ ও দাঁতও ছিল না ভয়ঙ্কর রকমের জোরালো।

১ ২ ৩

৪
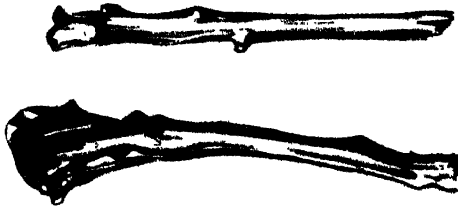
যূথবদ্ধ মানুষের শ্রমের হাতিয়ার। ১, ২, ৩. হাতে তৈরি ধারালো পাথুরে অস্ত্র। ৪. কাঠের লাঠি এবং মাটি খোঁড়ার কাঠের শাবল। **ভাবতে চেষ্টা করো, এধরনের আদিম হাতিয়ার দিয়ে তখনকার মানুষের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করা সম্ভবপর ছিল।**

তবে, তারা কিন্তু ধারালো পাথর ব্যবহার করা জানতো। পাথরে পাথর ঠুকে তারা প্রথমে ছোট আকারের পাথর ভেঙে নিতো, তারপর সেই প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তদেশ ধারালো করতো। এধরনের তীক্ষ্ন প্রস্তরখণ্ডকে বলে **হাতে তৈরি পাথুরে অস্ত্র**। তা দিয়ে হাড় কাটা যেত, কাঠের লাঠি কাটা যেত, তারপর লাঠির অগ্রভাগ শান দিয়ে ধারালো করে মাটি খোঁড়ার শাবল তৈরি করা যেত। এধরনের পাথুরে অস্ত্র যে কোনো পশুর দাঁত বা নখর অপেক্ষা তীক্ষ্নতর ও শক্তিশালী হতো; এরকম অস্ত্রের আঘাত ভালুকের থাবার চেয়েও হতো মারাত্মক।

পাথুরে অস্ত্র, কাঠের শাবল ও কাঠের লাঠি ছিল পৃথিবীতে মানুষের প্রথম **শ্রম-হাতিয়ার**। এগুলোর সাহায্যেই তারা খাদ্য সংগ্রহ করতো। একমাত্র মানুষ ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোন প্রাণীই সহজতম কোনো শ্রম-হাতিয়ারও তৈরি করতে সক্ষম নয়।

পশু এবং আদিম মানুষের মধ্যে প্রধান পার্থক্যই ছিল এই যে, মানুষ তার শ্রম-হাতিয়ার তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছিল।

৩. আদিম মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম। মানুষের খাদ্য বলতে তখন ছিল নানান জাতের ফলমূল আর পাখির ডিম। লাঠি আর পাথুরে অস্ত্র দিয়ে গাছগাছালির গোড়া খুঁড়ে তারা শিকড় (অবশ্য যে ধরনের শিকড় বিষাক্ত নয়, যা খেলে তারা মরবে না) আর কীটপতঙ্গের ডিম বের করতো, ছোটোখাটো বন্য পশুর গর্ত খুঁড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতো। তাদের এহেন দৈনন্দিন ক্রিয়াকান্ডকে আমরা বলতে পারি **সংগ্রহবৃত্তি;** প্রকৃতির ভান্ডারে যা আছে তারা শুধু তাই সংগ্রহ করে বেড়াতো খাদ্যের জন্য।

তখনকার মানুষ দল বেঁধে, হাতে লাঠি, ধারালো পাথুরে অস্ত্র আর শাবল নিয়ে শিকার করতে বেরুতো রুগ্ণ কিংবা পাল থেকে পিছিয়ে-পড়া কোনো বিশালাকার পশু: বন্য ছাগ, হরিণ, বন্য শূকর। (দ্রষ্টব্য রঙিন ছবি ১)

সংগ্রহবৃত্তি এবং শিকার — এ দুটোই ছিল আদিম মানবের প্রথম দৈনন্দিন কর্ম।

৪. আগুনের ব্যবহার। বন্য পশুরা যেমন আগুন দেখলে ডরায়, আদিম মানুষও ঠিক তেমনিই ভয় পেত আগুন। বজ্রপাতের ফলে অরণ্যে বাড়বাগ্নি ঘটলে তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত। তাদের পক্ষে আরো ভয়াবহ ছিল অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উত্থিত আগুনের লাভাস্রোত।

তা সত্ত্বেও মানুষ তখনই লক্ষ্য করেছিল যে, বজ্রপাতের যে বিদ্যুৎবহ্নি তা আসলে বন্ধুর মতো উপকারও করে: ঠান্ডা আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়, হিংস্র পশুদের হাত থেকে তাদের বাঁচায়। বাড়বাগ্নি থেকে কিংবা অগ্ন্যুদ্গীরণের লাভা থেকে আগুন নিয়ে মানুষ শুকনো কাঠ-লতাপাতায় আগুন জ্বালানো শিখলো। দিন-রাত এই আগুন জ্বলতে থাকতো, লোকজন পাহারা দিতো আগুনকে, যাতে না নিভে যায় সেজন্যে সব সময় শুকনো ডালপালা গুঁজে দিতো। যদি আস্তানা উঠিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার প্রয়োজন হতো, তখন জ্বলন্ত কাঠ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলতো না। লাল গনগনে অগ্নিকুন্ডের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা লোকজনদের কাছে হিংস্র ভয়ঙ্কর বন্য পশুরা ঘেঁষতেই পারতো না। কোনো লোকের হাতে জ্বলন্ত কাঠ থাকলে পশু ভয় পেয়ে চলে যেত। মাংস এবং লতাপাতা কাঁচা খাওয়ার চেয়ে ঝলসে খেলে স্বাদও বেশি লাগতো।

আগুনের ব্যবহার জেনে যাবার ফলে মানুষ আর পশুর মধ্যে ব্যবধান আরো বেড়ে গেল।

৫. যূথবদ্ধ মানুষের দল। আদিম মানুষের জীবন ছিল ভয়ানক কষ্টের আর বিপদ ছিল পদে পদে। হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারানো তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসংগ্রহের সুযোগ মানুষ

তখন প্রায়শঃই পেত না। তাদের অর্ধেকের বেশি লোক মারা যেত কুড়ি বছর বয়সের পূর্বেই: একজন যদি প্রাণ হারালো পশুর নখরাঘাতে, তো অন্যজন রোগে এবং অনাহারে।

আদিম মানুষের পক্ষে একক বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করা সম্ভব ছিল না তখন, কেন না তাহলে না পারতো তারা খাবার সংগ্রহ করতে, না পারতো তারা আগুন ধরে রাখতে। না খেতে পেয়ে হয় তারা অনাহারে মারা যেত, নয় তো প্রাণ দিত হিংস্র পশুর আক্রমণে। সেজন্যই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতো, যূথবদ্ধ হয়ে খাদ্যসংগ্রহে বেরুতো, সার্বজনীন অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে সকলে একই সাথে দেহটাকে গরম রাখতো।

এক একটা দলে বড়ো জোর কয়েক ডজন লোক থাকতো; দল খুব বেশি বড়ো হয়ে গেলে এক জায়গায় সকলের জন্য খাদ্য মেলা যে মুশকিল, তা-ই। দল যে সব সময়ে একইভাবে একই আকারে টিকে থাকতো তা নয়। পশুপালের মধ্যে যেমন ঘটে, তাদের বেলাতেও ঠিক তেমনই ঘটতো: কেউ এসে ঢুকলো নতুন করে, কেউ-বা দলছুট হয়ে বেরিয়ে চলে গেল হয়তো অন্য দলে। আদিম মানুষদের এই যে দল বেঁধে বসবাস করা, এর নাম — **যূথবদ্ধ মানুষের দল**।

একমাত্র গরম দেশে, যেখানে প্রকৃতি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং যেখানে বিনা বস্ত্রে ও বিনা বাসস্থানে বেঁচে থাকা সম্ভব সেরকম দেশেই শুধু বসবাস করা সম্ভব হয়েছিল যূথবদ্ধ মানুষদের পক্ষে। আদিম মানুষদের জীবনের পরিচয় পাওয়া গেছে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাবা দ্বীপে এখন হতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে জীবিত মানুষের হাড় ও দাঁত খুঁজে পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা আদিম মানুষের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন। ঐ মানুষদের নাম দেয়া হয়েছে **পিথেকানথ্রোপুস** (Pithecantropus), যার মানে হচ্ছে বানর-মানুষ। বহু কাল যাবৎ এই পিথেকানথ্রোপুসদেরই গণ্য করা হয়েছে পৃথিবীর আদিম মানুষ হিসেবে। কিন্তু আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে আরো পুরনো মানুষের হাড় এবং তাদের ব্যবহৃত আরো আদিম ধরনের পাথুরে হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই আদিম মানুষদের নামকরণ করা হয়েছে **হোমো ইরেক্তুস** (Homo erectus), অর্থাৎ খাড়া-মেরুদণ্ডী মানুষ; বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, এই মানুষ এখন থেকে ১০ লক্ষ বৎসরেরও বেশি পূর্বের। বর্তমানে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, হোমো ইরেক্তুস এখন থেকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর পূর্বে বেঁচে ছিল। আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য এখনো চলছে।

? ১. আদিম মানুষের জীবন সম্বন্ধে তুমি যা জানো বলো দেখি। ২. আদিম মানুষ ও এখনকার মানুষের মধ্যে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান? ৩. আদিম মানুষ ও পশুর মধ্যে

প্রধান ব্যবধান কী ছিল? ৪. আদিম মানুষদের দল বেঁধে বসবাস করাকে কী বলে? এরকম নামকরণের কারণ কী?

§ ২. শিকারী আদিম মানুষের গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী

১. পৃথিবীতে তুষারযুগ। পৃথিবীর বুকে মানুষদের ততদিনে কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেছে। এখন থেকে প্রায় ১ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে তুষারযুগ শুরু হয়েছিল। তুষারযুগ সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল ইউরোপেই। শীতকালের দীর্ঘতা ও প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বেশি ছিল তখন। গ্রীষ্মকালের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে তুষার ও বরফ গলবার সময়ই পেল না। পৃথিবীর একাংশ ঢেকে গেল **বরফের কঠিন আবরণে;** এত পুরু হয়ে বরফ জমলো যে তার পুরুত্ব দু'কিলোমিটার পর্যন্ত এসে দাঁড়ালো। এর অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে বরফ ঢেকে দিলো তুন্দ্রাঞ্চল; তুন্দ্রায় অল্প গাছপালা ছিল। পশু-পাখি, জীবজন্তু যারা এতদিন গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তারা হয় মারা পড়লো ঠাণ্ডায়, নয় তো বহু দূরে সম্পূর্ণ দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তুষারযুগের প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও মানুষ টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছিল।

তুষার যুগের সময়ে পৃথিবীর তুষারাবৃত এলাকা।

২. শ্রম-হাতিয়ারের বিবর্তন। এর মধ্যে লক্ষ বছর ধরে মানুষ ধীরে ধীরে পাথর ভেঙে তা থেকে **তীক্ষ্মমুখ বল্লম, ছুরি, চাঁচবার জন্য র‍্যাঁদা, বিঁধ করার জন্য শূল** তৈরি করতে শিখে গেছে।

বন্য পশুর হাড় ভেঙে তা থেকে মজ্জা বের করে আহার করতে করতে একসময় তারা দেখলো যে, ভাঙা ফাঁপা হাড়ের প্রান্তদেশ তো বেশ ধারালো।
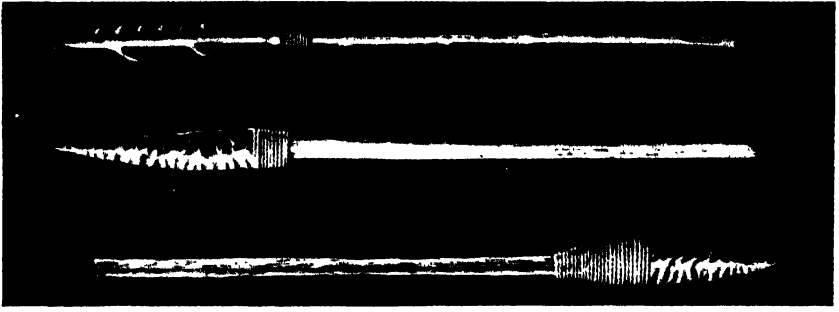
১
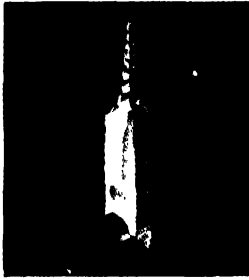
২

৩

এখন থেকে ৩০-২০ হাজার বৎসর পূর্বে মানুষের শ্রমের হাতিয়ার। ১. হাড়ের তৈরি একটি হার্পুন এবং দুটি বল্লম। বল্লমদ্বয়ের সূচালো অগ্রভাগ পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, লক্ষ্য করো। ২. কোনো কিছু ছিদ্র করার জন্য শূল। ৩. র‍্যাঁদা বা চাঁচবার হাতিয়ার। **শূল আর র‍্যাঁদা কোন্ কাজে তারা ব্যবহার করতো বলে মনে কর?**

তখন তারা হাড় এবং শিং থেকে তৈরি করা শুরু করলো নানান ধরনের সূচ, তৈরি করলো **হার্পুন** — হার্পুন হচ্ছে বল্লমের মতোই ছুঁড়ে মারবার তীক্ষ্ণধার সূচীমুখ অস্ত্রবিশেষ, তবে পশু যাতে অস্ত্র থেকে নিজের দেহ বিযুক্ত করে নিয়ে দৌড়ে পালাতে না পারে সেজন্য হার্পুনের ফলায় বাঁকা-বাঁকা দাড়া থাকে। অবশ্য শ্রমের হাতিয়ার হিসেবে পাথুরে অস্ত্রই তাদের কাছে প্রধান ছিল। কেন না, পাথুরে হাতিয়ার ছাড়া গাছপালা কেটে তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার্য করে তোলা, কিংবা হাড় অথবা শিং কাটা ইত্যাদি কোনোকিছুই সম্ভব ছিল না।

কাঠকে নিজেদের প্রয়োজনে নানানভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে আদিম মানুষ দেখলো, শুকনো দুটো কাষ্ঠখণ্ড জোরেসোরে এবং বহুক্ষণ ধরে ঘষলে তা গরম হয়ে ওঠে, আগুনের ফুলকি ছোটে। এভাবেই মানুষ প্রথম আগুন আবিষ্কার করেছিল। আকস্মিকভাবে পাওয়া প্রকৃতিদত্ত আগুন কাজে লাগাবার পরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখার আর প্রয়োজন থাকলো না।

৩. **শিকার।** হাতে বল্লম আর হার্পুন নিয়ে যূথবদ্ধ মানুষ বন্য হরিণ, ষাঁড় আর ঘোড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার করা শুরু করলো। শিকারী আদিম মানুষ পশুপালের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে তাদের তাড়া করতো। ছুঁড়ে মারতো বল্লম, হাতে জ্বলতো দাউদাউ করে কাঠের আগুন, আর ভয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া পশুগুলোকে পিছন থেকে তাড়া করতে করতে ঠেলে নিয়ে যেত হয় পাহাড়ের খাড়া প্রান্তদেশে যেখানে এক পা এগুলেই নিচে পড়ে মৃত্যু, নয় তো তাড়া করে নিয়ে যেত সেই দিকে যেখানে গাছপালার আড়ালে অস্ত্র হাতে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে তাদের বেশির ভাগ সঙ্গীসাথীরা। (দ্র. রঙিন ছবি ৩)
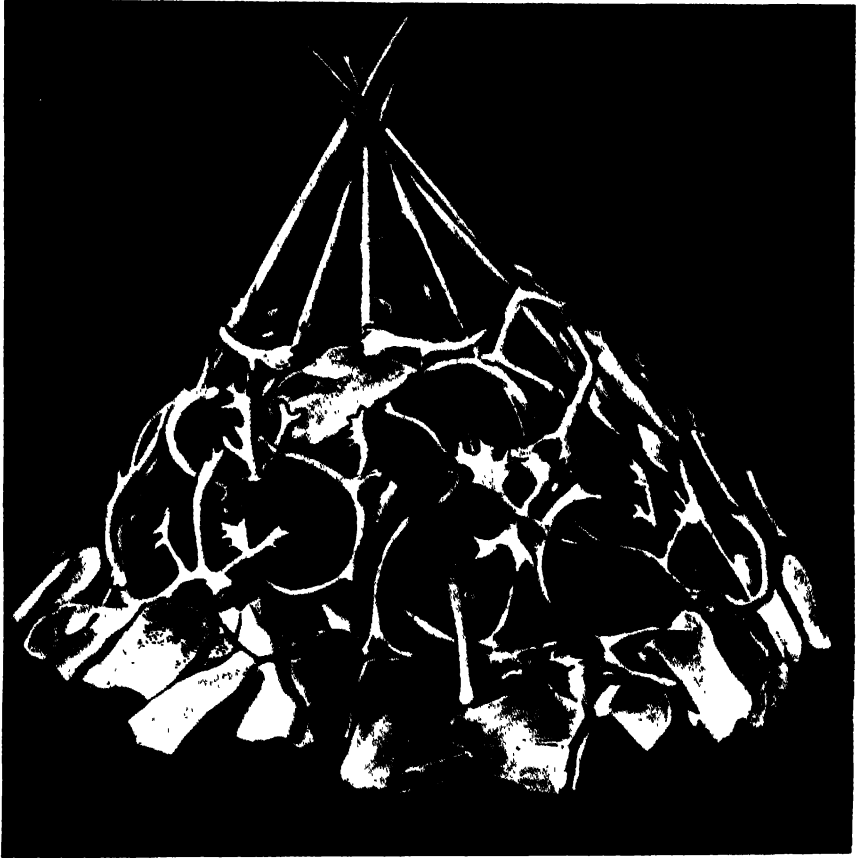
আদিম কালে শিকারীদের আস্তানা। (মস্কোস্থ ইতিহাস যাদুঘরে এই ছাঁচটি রক্ষিত আছে।) ঘরটি কাঠ, হাড় আর পশুর শিং দিয়ে প্রস্তুত। উপরিভাগ পশুচর্মে আবৃত হতো। পর্বতগুহা না পেলে এধরনের ঘর তৈরি করে থাকতো আদিম মানুষ।

তখনকার মানুষ শিকার করতো **ম্যামথ**। ম্যামথ হলো বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অতিকায় আদিম হস্তী, গায়ে বড়ো বড়ো লোম ছিল এদের। প্রচণ্ড শক্তিশালী শুঁড়ের একটা ঝটকাতেই তারা মানুষকে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু শিকারীরা প্রথমে আগুন নিয়ে ভয় পাইয়ে দিতো তাদের, তারপর ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যেত 'খ্যাদা'র দিকে, 'খ্যাদা' আর কিছু নয়, কেবল গভীর বিশাল একটা গর্ত আর তার মুখটা ডালপালা দিয়ে চাপা দেওয়া। একবার ঐ 'খ্যাদা'য় পড়ে গেলে তা থেকে উঠে বেরিয়ে আসা অসম্ভব, তখন তার মধ্যে আটকে পড়া ম্যামথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারীরা তাকে মেরে ফেলতো।

আদিম মানুষের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো শিকার করা। শিকারের ফলে শুধু তাদের খাদ্যসংস্থানই হলো না, তারা পরিধানযোগ্য পোষাকও পেয়ে গেল। পোষাক মানে — মৃত পশুর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাই তারা পরতো।

একটা ম্যামথ মারতে পারলে, হরিণ কি ঘোড়া শিকার করতে পারলে মাংস হতো প্রচুর। কিন্তু মাসের পর মাস শিকার মিলছে না এবং সকলকে অনাহারে থাকতে হচ্ছে — এরকমই ঘটতো বেশির ভাগ সময়।

আদিম মানুষের প্রথম বাসস্থান ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে **পর্বত গুহা**। এইসব গুহা থেকে বিশালদেহী ভল্লুক আর হিংস্র সিংহদের হটিয়ে তবেই মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিল মানুষ। তার পরে অবশ্য তারা হাড়গোড় আর পশুচর্ম দিয়ে ক্রমশঃ কুঁড়ে বানাতে শিখলো।

হার্পুন দিয়ে মাছও তারা ধরতো। কতক্ষণে তীরের পানে ভেসে আসবে বড়ো একটা মাছ, সে আশায় ওৎ পেতে বসে থাকতো, তারপর যেই দেখা সঙ্গে সঙ্গে হার্পুন ছোঁড়া।

৪. **আদিম মানুষ কীভাবে আর কেনই-বা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছিল।** আদিম মানুষের শ্রম-হাতিয়ার আর জীবনযাত্রার পদ্ধতিই যে শুধু পাল্টালো, তাই নয়, তারা নিজেরাও ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে লাগলো। পাথর, জীবজন্তুর শিং আর পশুচর্ম ইত্যাদি কেটে ঘষে মেজে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী করতে করতে, এবং আগুন জ্বালাবার কায়দা রপ্ত করার মধ্য দিয়ে মানুষ তার হাতকে ব্যবহার করতে শিখলো নানাভাবে, এর ফলে তার হাতের কর্মক্ষমতা বেড়ে গেল, আরো সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলো হাত দিয়ে, হাতের আঙুল আরো বেশি সক্রিয়তা ও চলৎশক্তি অর্জন করলো।

বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরির সময়ে মানুষকে নিশ্চয়ই ভাবতে হয়েছে কোন্ জিনিস দিয়ে অস্ত্র বানাতে হবে, তার আকারই-বা হবে কী রকম, ভাবতে হয়েছে কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে খাটলে বাঞ্ছিত অস্ত্রটি প্রস্তুত করা সম্ভব হবে তার পক্ষে। শিকারে বেরুবার পূর্বে নিশ্চয়ই তাদের পরিকল্পনা ছকে নিতে হতো — শিকারীরা কে কোথায় ওৎ পেতে থাকবে, কখন এবং কোথায় পশুপালের
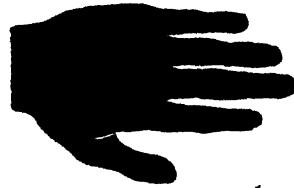
আদিম মানব থেকে 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষে ক্রমপরিণতি। ১. বিভিন্ন মানুষের মাথা — প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে, প্রায় ১ লক্ষ বৎসর পূর্বে এবং প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে এরকম ছিল। (আবিষ্কৃত করোটি বিশ্লেষণ করে মুখের এ ধাঁচগুলো বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন।) আদিম মানুষের মাথার খুলি (বা করোটি) কেমন পাল্টে গেছে দেখছো? ২. বানরজাতীয় প্রাণীর হাতের থাবা এবং প্রায় ৩০ হাজার বছর আগেকার মানুষের হাত। (প্রাপ্ত প্রাচীন অস্থির ভিত্তিতে বিজ্ঞানী দ্বারা এগুলো পুনঃকল্পিত।)

উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য এই পরিশ্রমই তাই তার চিন্তাভাবনার শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিলো। মানুষের মাথার মধ্যে ক্রমশঃ মগজের পরিমাণ বেড়ে গেল, ফলে পিছন পানে ঢালু কপাল ধীরে ধীরে সামনে সরে এসে খুলির ভিতরে ক্রমবর্ধমান মগজকে তার জায়গা ছেড়ে দিলো, পরস্পরের মধ্যে

ভাব বিনিময়ের জন্য মানুষ কথা বলতে শিখলো। এখন আমরা যে রকম দেখতে অবিকল সেই রকম আকৃতিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হলো আদিম মানুষ; এটা ঘটেছিল এখন থেকে আনুমানিক ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে। বিজ্ঞানে এই মানুষদের নামকরণ করা হয়েছে: **হোমো স্যাপিয়েন্স** (Homo sapiens), অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন মানব।

বিশ্ববিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও বিপ্লববাদী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলেছেন যে, শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে।

৫. গোত্র বা 'ক্লান' (clan)-**ভিত্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভব।** বাঁচার তাগিদে সকলের সম্মিলিত শ্রম এবং বিপদের বিরুদ্ধে সকলের সম্মিলিত সংগ্রাম মানুষকে একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বেঁধেছিল। প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে **গোত্র ভিত্তিক গোষ্ঠী** বা **গোত্র ব্যবস্থার** উৎপত্তি হয়েছিল।

একটি গোত্রে কয়েক ডজন থেকে শুরু করে কয়েক শ' জন পর্যন্ত লোক অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো। তারা একে অন্যকে আত্মীয় জ্ঞান করতো; সবাই একই পূর্বপুরুষের বংশধর হতো বলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের **জ্ঞাতি**। সকলের জন্য ব্যবহার্য যৌথ কোনো পর্বতগুহায় কিংবা বড়ো বড়ো কুঁড়েঘর তুলে সেখানে একই গোত্রভুক্ত এইসব জ্ঞাতিরা একসাথে বসবাস করতো। পুরুষেরা শিকার করতো, মাছ ধরতো। মেয়েরা ভক্ষণযোগ্য লতাপাতা ফলমূল সংগ্রহ করতো, পরিচর্যা করতো শিশুদের, পশুচর্ম থেকে চর্বি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তা দিয়ে পোষাক তৈরি করতো। গোত্রের মধ্যে নারীকে অত্যন্ত সম্মান করা হতো। শিশুদের বয়স তিন-চার বৎসর হলেই তারা বয়স্কদের কাজে সাহায্য করতো। নারী ও পুরুষ মিলে যে খাদ্য সংগ্রহ করতো তা-ই সমস্ত জ্ঞাতির মধ্যে ভাগ করে যেতো। পশুচর্ম, জীবজন্তুর হাড়গোড়, শিং ইত্যাদি সবই ছিল তাদের সকলেরই যৌথ সম্পত্তি। গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিরা হলো **দলপতি**; এই দলপতিরাই শিকার, হাতিয়ার প্রস্তুত এবং শিকারে অর্জিত খাদ্য বণ্টন প্রভৃতিতে কর্তৃত্ব করতো। (দ্র. রঙিন ছবি ২)

সকলে মিলেমিশে একত্র বসবাসকারী কর্মরত এবং যৌথ সম্পত্তির অংশীদার এই যে একই গোত্রভুক্ত জ্ঞাতিদের সংঘবদ্ধ দল, এরই নাম গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী বা গোত্র ব্যবস্থা।

যূথবদ্ধ মানুষের দল অপেক্ষা গোত্র ছিল অনেক বেশি মজবুত এবং সংগঠিত। যূথবদ্ধ আদিম মানব থেকে গোত্রভুক্ত জ্ঞাতিতে মানুষের এই উত্তরণে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষ এক নতুন উন্নততর স্তরে নিজেদের নিয়ে যেতে পেরেছে।

কিন্তু যূথবদ্ধ মানুষের দল ও গোত্রের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল বৈকি: উভয় অবস্থাতেই মানুষ একই সাথে মিলেমিশে পরিশ্রম করেছে, অর্জিত বস্তুর মালিকানা ছিল যৌথ, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না এবং তাদের প্রয়োজনীয়

জীবন-উপকরণ তারা লাভ করতো এত সামান্য পরিমাণে যেটুকু না হলে টিকে থাকা অসম্ভব।

আদিম মানবের এই যে জীবনধারা যেখানে তারা সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করেছে এবং অর্জিত দ্রব্যের মালিকও হয়েছে সবাই একসাথে, এই জীবনধারাকে বলা যায় আদিম গোষ্ঠী সমাজ। আর এই জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল যারা তাদের নাম আদিম মানুষ।

? ১. 'শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে' কথার অর্থ বুঝিয়ে বলো। ২. আদিম মানব প্রচণ্ড শীতেও কেন মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি? তোমার ধারণা অনুযায়ী প্রধান তিনটি কারণ বলো। তোমার উত্তর যথার্থ কিনা তা বুঝতে নিচের প্রশ্ন তিনটি তোমাকে সাহায্য করবে: (ক) শ্রম-হাতিয়ার কীভাবে পরিবর্তিত হলো? (খ) মানুষের জীবনে আগুনের ভূমিকা কী ছিল? (গ) গোত্রের নিয়মকানুন ভঙ্গকারীকে গোত্র থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হতো; বহিষ্কৃত লোকটির অবস্থা তারপরে কী হতো একবার ভেবে দেখ। ৩. গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী মানে কী? বর্তমান গ্রন্থে এই সংজ্ঞা খুঁজে বের করো। ভেবে দেখ, 'গোষ্ঠী' শব্দটির দ্বারা কী কী তুমি বুঝবে, আর 'গোত্রভিত্তিক' শব্দ দ্বারাই বা সঠিকভাবে কী বোঝা সম্ভব। যূথবদ্ধ মানুষের দল আর গোত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? ৪. আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থা বলতে মূলত কোন্ কোন্ জিনিস বুঝবে? ৫. আদিম মানুষ কাদের বলা হয়ে থাকে?

§ ৩. শিল্পকলা ও ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব

১. প্রাচীন পৃথিবীর শিল্পকলা। প্রাচীন যুগে মানুষ বসবাস করে গেছে এরকম কিছু গুহা জনৈক স্পেনীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পর্যবেক্ষণ করে দেখছিলেন প্রায় শ'খানেক বৎসর পূর্বে। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, গুহার ছাদে জীবজন্তুর রঙিন ছবি আঁকা। প্রথম দিকে বিশেষজ্ঞেরা ভেবেছিলেন যে, এসব ছবি খুব বেশি দিনের আঁকা নয়: আসলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে, প্রাচীন মানুষ আঁকতে পর্যন্ত পারতো। এর পরে একই ধরনের আরো অনেক শিল্পনিদর্শন আরো বহু গুহায় আবিষ্কৃত হলো। পশুর হাড় ও শিং থেকে নির্মিত মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি আবিষ্কার করলেন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ। তার পর আর কারো সন্দেহ রইলো না যে, আবিষ্কৃত গুহাচিত্র এবং মূর্তিগুলো বহু বহু বৎসর পূর্বে জীবিত প্রাচীন মানুষদের শিল্পনির্মাণ।

শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে তা হলে প্রায় ৩০ হাজার বৎসর আগে। 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষ তার চারপাশে যা দেখেছে তাই তার শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করে গেছে। যার দ্বারা তারা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারছিল সেই শিকারের দৃশ্যই তাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অঙ্কিত। বিস্ময়কর দক্ষতার সাথে প্রাচীন শিল্পী 'ম্যামথ' আঁকার সময় এমন কি শুঁড়ের নমনীয়তা পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে

১. ক্ষতবিক্ষত ভল্লুক। (আদিম মানুষ কর্তৃক গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্র।) ২. মৃগচর্ম পরিহিত মানুষ হরিণের নকল করছে (গুহাচিত্র)। ৩. শিকারের প্রাক্কালে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী।

সক্ষম হয়েছে, এঁকেছে মাথার উপরে ডালপালার মতো বাঁকানো শিংওয়ালা হরিণ, আহত ও রক্তাক্ত ভল্লুক। শিকারীদের হাতে ক্ষতবিক্ষত মরণোন্মুখ বাইসন এবং তার শিংয়ে নিহত শিকারীর ছবিও অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। কোনো গুহায় এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজন্তুর আকারে অঙ্কনরত মানুষদের দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে শিং এবং পিছনে লাঙ্গুল পরিহিত মানুষেরও ছবি আছে; কে জানে হয়তো এভাবে তখন মানুষ হরিণের অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে নাচ করতো। পশুদের অনুকরণ করে তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করার মধ্য দিয়ে শিকারজীবী প্রাচীন মানুষ প্রথম নৃত্য আবিষ্কার করেছিল।

প্রাচীন পৃথিবীর শিল্পকলা প্রমাণ করে যে, 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষ অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল ছিল, জীবজন্তু সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান রাখতো আর পাথরের উপরে কিংবা হাড়ের উপরে নির্ভুল সুষ্ঠু রেখা অঙ্কনে তাদের হাত দক্ষ হয়ে উঠেছিল। (দ্র. রঙিন ছবি ৪)

২. প্রকৃতির সামনে মানুষের অসহায়তা ও ভয়। প্রাচীন মানুষ ঝড়, বন্যা বা শক্ত অসুখবিসুখে খুব অসহায় বোধ করতো। বৃষ্টি বা বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণ তারা বুঝতো না।

নিজের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে থাকা প্রকৃতিকে 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষ ঠিক সেই রকমই ভয় পেতো যেমন ভয় পেয়েছিল তারো বহু পূর্বে পৃথিবীর আদিম মানুষেরা। প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রা অনুসরণ করে বেঁচে আছে এরকম আদিবাসী এখনো পৃথিবীতে আছে; এধরনের এক স্থানের আদিবাসীরা তাদের জীবন নিয়ে গবেষণারত জনৈক বিজ্ঞানীকে বলেছিল: 'আমরা খারাপ আবহাওয়াকে খুব ভয় পাই, ফসল ফলাতে হলে তার সাথে যুদ্ধ করতে হয় আমাদের। ঠান্ডা কুঁড়েঘরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও অন্নের অভাবকে আমরা ভয় পাই। যা নিজের চারপাশে প্রত্যহ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই রোগকে আমরা ভয় পাই। মৃত মানুষ ও শিকারে নিহত পশুর আত্মাকে আমরা ভয় পাই। যা-কিছু আমাদের অজানা সেই সবকিছুতেই আমাদের ভয়।'

আদিম মানুষের সাথে 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষের তফাৎ ছিল এই যে, প্রকৃতির ক্ষমতা যে কতখানি তা এরা জানার চেষ্টা করেছিল। **প্রাকৃতিক রহস্যের কার্যকারণ** তারা বুঝতো না বলে প্রাকৃতিক ঘটনাকে তারা ব্যাখ্যা করতো এইভাবে যে, ঐ সবই ঘটছে তাদের অজ্ঞাত গুপ্ত **অলৌকিক শক্তির** ফলে। তখন তারা চেষ্টা করতে লাগলো কী করে এই অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে নিজেদের উপকারে কাজে লাগানো যায়।

৩. ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব। শিকারে বেরুবার পূর্বে প্রাচীন মানুষ প্রথমে পশুর ছবি এঁকে আগে সেই ছবিকে 'হত্যা' করতো। এই পদ্ধতিতে তারা চাইতো পশুদের 'যাদু করে' তাদের উপর সম্মোহনপ্রভাব বিস্তার করতে এবং মনে করতো যে, এর ফলেই তারা ভালো শিকার পাবে।

আমাদের মতো ঘুমের মধ্যে তারাও স্বপ্ন দেখতো। স্বপ্ন দেখতো হয়তো এমন সব লোকজন যারা তাদের কাছ থেকে দূরে কোথাও থাকে, কিংবা এমন কি হয়তো বা মারাও গেছে। এর কারণ জানা না থাকায় স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিল তারা এইভাবে — দেহের ভিতরে আছে 'আত্মা', ঘুমের সময়ে দেহ থেকে সেই 'আত্মা' বেরিয়ে গিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, অন্য লোকজনদের 'আত্মার' সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে। আর মৃত্যু হয় তখন, যখন এই 'আত্মা' দেহ ছেড়ে চলে যায়।

প্রাচীন মানুষ ভাবতো আত্মা আছে সকলেরই — মানুষ, জীবজন্তু-পশুপাখিরও যেমন, তেমনি গাছপালা-লতাপাতারও। সমস্ত প্রকৃতিতে 'আত্মা' নামক এক অলৌকিক সত্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; সমস্ত কিছুরই 'আত্মা' বর্তমান। 'আত্মা' আবার দু-প্রকার — ভালো এবং মন্দ। শিকারের সময় ওরাই হয় ভালো করে, নয় মন্দ করে, মানুষকে রোগে ফেলে ওরাই। অসুখকে (অর্থাৎ অসুখের আত্মাকে) ভয় দেখিয়ে অসুস্থ রোগীর দেহ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাই

তারা রোগীর চারদিক ঘিরে চিৎকার করতো, লাঠিসোঁটা ঘুরিয়ে তাকে ভয় দেখাতো, চারদিক ধোঁয়া দিয়ে একাকার করে ফেলতো।*

'আত্মা' এবং অন্যান্য অলৌকিক শক্তি যে সবকে তারা মনে করতো প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবনের পরিচালক, সে সবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় **ধর্মবিশ্বাস**।

৪. প্রাচীন মানুষদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানলেন কী করে। আদিম মানব মৃত ব্যক্তির দেহ পশু-পাখির খাদ্য হিসেবে সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রেখে দিতো। এর বহু পরে তারা মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া শুরু করে। সমাধিস্থ করার সময় মৃত দেহের সাথে খাদ্যবস্তু, শ্রম-হাতিয়ার এবং গয়নাগাঁটিও দিয়ে দিতো।

প্রত্নতত্ত্ববিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন সমাধি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, লোকজনরা 'আত্মায়' বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো, দেহ ছেড়ে চলে-যাওয়া 'আত্মা' আবার ফিরে আসতে পারে এবং যদি ফিরে আসে তাহলে জীবিত মানুষের যা-যা প্রয়োজন তা সেই 'আত্মার'ও দরকার পড়বে। আদি কালের ধর্মবিশ্বাসের চিহ্ন মানুষের ধ্যানধারণায় এমন কি বর্তমান কাল পর্যন্ত রয়ে গেছে: ধার্মিক লোকজন আজো গোরস্থানে সিদ্ধ ডিম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়ে রেখে আসে।**

প্রাচীন মানুষের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় তাদের রচিত শিল্পনিদর্শনেও ধরা পড়ে: বল্লমবিদ্ধ ভল্লুকের মূর্তি, বুকে হার্পুনবিদ্ধ ষাঁড়ের ছবি এর নিদর্শন। বন্য আদিবাসীদের জীবনধারা জানার ফলে ঐসব চিত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে। একই ধরনের শিল্পনির্মাণ তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। যেমন, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা শিকারে যাবার প্রাক্কালে ক্যাঙ্গারু এঁকে বল্লম ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে বেঁধে (দ্র. ২৮ পৃষ্ঠার ৩ নং ছবি)। **প্রাকৃতিক রহস্যের কার্যকারণ অনুসন্ধানে মানুষ প্রবৃত্ত হতে পারে নি আদিম ধর্মবিশ্বাসের জন্যই।**

? ১. প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল? § ২ এবং § ৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদের বক্তব্যের ভিত্তিতে উত্তর দাও। ২. আদিম মানুষের উন্নতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কীভাবে জেনেছেন? ৩. ধর্মবিশ্বাস কি মানুষের মনে গোড়া থেকেই ছিল? আদিম মানুষদের মধ্যেই বা ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব প্রথম হলো কেন? ৪. কোন্ ধরনের অলৌকিক শক্তিতে আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো? এই ধর্মবিশ্বাসে তাদের কী ক্ষতি হয়েছিল?

* ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য এই একই পদ্ধতি আজকের আধুনিক বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে, বাংলা দেশে তো বটেই। — অনু.

** ডিম রেখে আসার এই নিয়মটি রাশিয়াতে বুড়োবুড়িদের ভিতরে এখনো চালু আছে। আমাদের দেশে পীরের দরগায় বা দেব-দেবীর থানে আহার্য দ্রব্য উৎসর্গ করার পিছনে ঐ একই আদিম বিশ্বাসের অনুসৃতি চলে আসছে। — অনু.

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষিজীবী ও পশুপালক আদিম সমাজ

§ ৪. পশুপালন ও কৃষিকর্মের উদ্ভব

আদিম মানুষের গোত্রবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনে শ্রমের বণ্টন কীভাবে হয়েছিল, মনে রেখো (দ্র. § ২:৫)।

১. তুষার যুগের অবসান ও মানুষের বসতি সম্প্রসারণ। প্রায় ১৮ হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবী পুনরায় উষ্ণতাপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। বরফ ধীরে ধীরে গলতে লাগলো এবং আরো উত্তরে সরে গেল। ভূপৃষ্ঠ বরফ থেকে মুক্ত হবার ফলে পৃথিবী বনজঙ্গলে ছেয়ে গেল। জীবজন্তু যারা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারা চলে গেল উত্তরে। ম্যামথ তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল।

মানুষদের একটা অংশ ঐসব পশুদের অনুসরণ করতে করতে গেল। নদী ও হ্রদ আর তার সামনে অলঙ্ঘ্য বাধা হয়ে রইলো না। ততদিনে মানুষ জলে ভাসার উপায় জেনে ফেলেছে; দু-তিনটি কাঠের গুঁড়ি বেঁধে সে এখন ভেলা তৈরি করে। আরো পরে তারা বিশাল গাছের মোটা গুঁড়ি কেটে ডিঙি বানাতেও শিখে গেল।

ধীরে ধীরে মানুষ বসতি স্থাপন করতে লাগলো ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে।

২. বন্য পশুকে পোষ মানানো। পশুশিকারী মানুষের জনবসতির আশেপাশে বন্য কুকুর বেড়াতো খাদ্যের উচ্ছিষ্ট পাবার লোভে। বসতির ধারেকাছে কোনো হিংস্র জীবজন্তুর আগমন ঘটলে কুকুরেরা চিৎকার করে মানুষদের সতর্ক করে দিতো।

শিকারী মানুষ প্রথমে এই কুকুরদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে তুললো। **পৃথিবীতে কুকুরই প্রথম গৃহপালিত জীব** — বাসগৃহের বিশ্বস্ত প্রহরী ও শিকারীদের সহায়ক বান্ধব। শিকারের সময় তারা পশুদের পিছুপিছু ছুটে তাদের তাড়া করতো।

গাছের কোনো সরল ডাল বাঁকালে বা নোয়ালে তাতে অধিক শক্তি সঞ্চয় হয় এবং তাকে যে প্রয়োজনে লাগানো যায়, তা মানুষ জেনে ফেলেছিল। ডালকে বাঁকিয়ে তার দু'প্রান্তদেশে **ছিলা** পরিয়ে তারা **ধনুক** বানালো। তীর মেরে শ'খানেক কি কয়েক শ' হাত দূরের পশুর উপর আঘাত হানতে পারতো।

তীর আর কুকুরের সাহায্যে এখন পূর্বাপেক্ষা সফলভাবে শিকার করা সম্ভব হতে লাগলো। সকলের খাবারের মতো যথেষ্ট মাংস পাওয়া গেলে শিকারীরা আর ধৃত শূকরছানা, কিংবা ছাগলছানা বা অন্য কোনো পশুশাবকও মেরে ফেলতো না, কোনো একটা ঘেরা জায়গায় শক্ত খুঁটিতে সেগুলোকে বেঁধে রাখতো। শূকর, ছাগল, ভেড়া ও গরুকে পোষ মানিয়ে মানুষ পশুপালন করতে শুরু করলো। এইভাবে **শিকারের মধ্য দিয়েই উদ্ভব হলো পশুপালনের।**

৩. **কৃষিকাজে কোদাল ব্যবহার।** মেয়েরা খাদ্যশস্য জোগাড় করতে করতে মস্ত বড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেললো: তারা লক্ষ্য করলো, শস্যবীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায়। তখন তারা মাটিতে শস্যবীজ পুঁততে আরম্ভ করলো। এভাবে ধীরে ধীরে **সংগ্রহবৃত্তি থেকেই উদ্ভব হলো কৃষির।** এটা ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় ৯ হাজার বছর পূর্বে। (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় 'কালপঞ্জীর' মধ্যে লক্ষ্য করো।)

কৃষিকর্মের জন্য অপরিহার্যরূপে দরকার হয়ে পড়েছিল **কুড়ুল, কোদাল ও কাস্তে।**

কাঠের লাঠির সাথে ধারালো প্রস্তরখন্ড বেঁধে তারা তৈরি করেছিল কুড়ুল। সবচেয়ে প্রথমে গাছের ডাল দিয়ে কোদালের কাজ চালানো হতো, পরে প্রাচীন মানুষ কোদালের প্রান্তদেশ হাড় বা শিং দিয়ে তৈরি করতে শিখলো। আর পশুর চোয়ালের সাথে ধারালো পাথরের টুকরো সংযুক্ত করে তৈরি হয়েছিল কাস্তে। সংগ্রহ-করা খাদ্যশস্য প্রচুর পরিশ্রম করে চূর্ণ করতে হতো পাথরের তৈরি উদূখলে (দ্র. ৩৩, ৩৫ পৃষ্ঠার ছবি)। যেহেতু প্রাচীন কৃষিকাজে শ্রমের হাতিয়ার মুখ্যত ছিল কোদাল, তাই সে কৃষিকাজকে **কোদালের কৃষিকাজ** বলা যায়। কোদাল দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল যা পাওয়া যেত ত খুবই কম। তা সত্ত্বেও সংগ্রহবৃত্তির চেয়ে এ অবস্থা অনেক ভালোভাবে গোত্রভুক্ত মানুষদের ফসলজাত খাদ্যের যোগান দিতে পারতো।

৪. **হস্তশিল্পের শুরু।** কৃষিকাজ ও পশুপালনের সাথে সাথে তখনকার মানুষদের মধ্যে আরো একটি জিনিস আবির্ভূত হলো—**হস্তশিল্প** অর্থাৎ কারিগরি। শুধুমাত্র
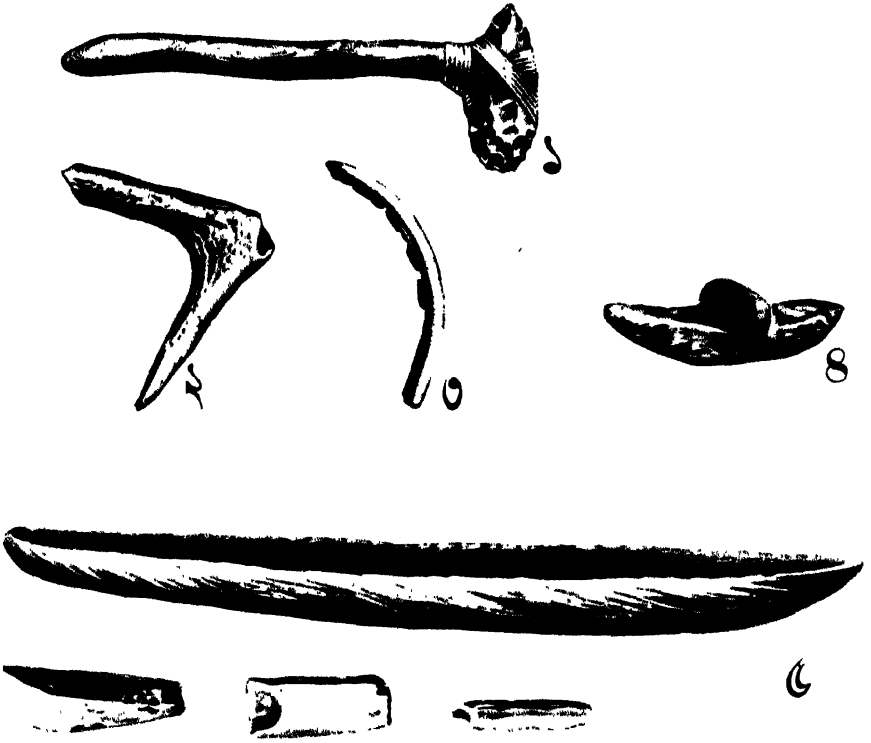
১-৩. কৃষিকর্মে ব্যবহৃত প্রাচীন মানুষদের তৈরি শ্রম-হাতিয়ার: কুড়ুল, কোদাল এবং কাস্তে। ৪. শস্য চূর্ণ করার জন্য উদূখল। ৫. বিশাল বৃক্ষের মোটা গুঁড়ি কুঁদে কুঁদে বানানো প্রাচীন মানুষদের তৈরি ডিঙি; পাশে পাথুরে যন্ত্রপাতি যা দিয়ে তারা এধরনের ডিঙি তৈরি করতে পেরেছিল।

নিজের দুটো হাতের ব্যবহারে কোনো বস্তু নির্মাণ করা সম্ভব হলে সেই বস্তুকে বলা চলে হাতের কাজ বা হস্তশিল্প।

হাতের কাজ করতো যে সব কারিগর বা হস্তশিল্পী তাদের বেশির ভাগই পাথর নিয়ে ব্যস্ত থাকতো: প্রায় ৭ হাজার বৎসর পূর্বে পাথর ছিদ্র করা বা তাকে ঘষে-মেজে মসৃণ করা ইত্যাদি তারা শিখে নিয়েছিল।

কাঁচা মাটি পুড়লে শক্ত কঠিন হয়ে যায় দেখে তারা হাঁড়ি, থালা-বাটি ইত্যাদি মাটি দিয়ে তৈরি করে পোড়াতে লাগলো। মাটি ও পাথর থেকে তারা চুলোও তৈরি করলো।

গাছের ডাল ও ছাল দিয়ে তারা ঝুড়ি বুনতে শিখলো। এতে অভ্যস্ত হবার ফলে জাল বোনা, সুতো কাটা এবং পশুলোম ও শন দিয়ে কাপড় বানানো সহজতর হয়েছিল তাদের পক্ষে।
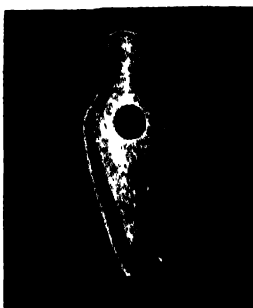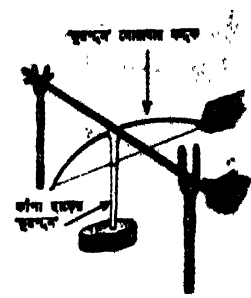
আদিম হস্তশিল্প: শ্রম-হাতিয়ার ও প্রস্তুত দ্রব্যাদি। ১. প্রস্তর ছিদ্র করার যন্ত্র। ২. পাথরের কুড়ুল, মধ্যিখানে হাতল লাগাবার ছিদ্র। **কৃষিকর্ম ও পশুপালনে অভ্যস্ত প্রাচীন মানুষের কাছে পাথুরে কুড়ুলের অর্থ কী ছিল?** ৩. প্রাচীন কালে কাপড় বোনার তাঁত। (প্রাপ্ত নমুনা ও প্রাচীন বর্ণনার ভিত্তিতে এই চিত্রটি কল্পনা করা হয়েছে।) ৪. মাটির ঘড়া।

৫. গোত্র ও কৌম (tribe)। পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার দিয়ে মানুষ একলা জমি চাষ ও ফসল ফলাতে পেরেছিল ভাবলে ভুল হবে। বনজঙ্গল-ঝোপঝাড়ের একটুখানি অংশও পরিষ্কার করা, সেখানকার জমি চষা, জমির ফসল ও গৃহপালিত পশুকে হিংস্র বন্য প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গোত্রের সমস্ত লোক আপ্রাণ পরিশ্রম করতো। যৌথ জমিতে উৎপন্ন ফসল এবং গৃহপালিত সমস্ত পশু সামগ্রিক-ভাবে সারা গোত্রের সম্পত্তি হতো। পাথর, মাটি, পশম বা শন দিয়ে চমৎকার জিনিসপত্র তৈরি করতে পারে এমন জ্ঞাতিরা সমস্ত গোত্রকেই ঐ সব জিনিস সরবরাহ করতো।

একই স্থানে বসতি স্থাপনকারী কয়েকটি গোত্র মিলে গঠিত হতো **কৌম**। সারা কৌম কথা বলতো একই ভাষায় এবং প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও ছিল এক।

কৌমের কাজকর্ম সম্পন্ন করতো কৌমভুক্ত সমস্ত গোত্র-দলপতিদের মিলিত

কৃষিকর্ম ও পশুপালনে নিয়োজিত প্রাচীন মানুষদের একটি জনবসতি। (এটি আমাদের সমসাময়িক কোনো আধুনিক শিল্পীরই আঁকা ছবি।) লক্ষ্য করো ছবিটিতে কী কী শ্রম-হাতিয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং লোকজন তা দিয়ে কোন ধরনের কাজ করছে।

সভা: **গোত্র-পঞ্চায়েত**। শিকারের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্দেশ, গৃহপালিত পশুর চারণক্ষেত্র ও কৃষিকর্মের জমি নির্বাচন এবং জ্ঞাতিদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদে মধ্যস্থতা করা ছিল এই পঞ্চায়েতের কাজ। সাধারণভাবে সকলের বিশ্বাস অর্জন করতো গোত্র-পতিগণ এবং পঞ্চায়েতের নির্দেশ বিনাবাক্যে নির্দ্বিধায় পালন করতে হতো কৌমকে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে পঞ্চায়েতের সদস্যরা কৌমের সভা ডাকতো।

চাষবাসের জমি কিংবা পশুচারণক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন কৌমের মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধবিবাদ লেগে যেত। যুদ্ধের সময়ে সব পুরুষ মিলে তাদের **সর্দার** নির্বাচন করতো, এই সর্দারই যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করতো।

আদিম মানুষের জীবনে কৃষিকর্ম ও পশুপালন ব্যবস্থা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ শুধু প্রকৃতির দানই হাত পেতে নিচ্ছিল: ফল-মূল সংগ্রহ করেছে, শিকারে জীবজন্তু মেরেছে, মাছ ধরেছে। কৃষিজীবী ও পশুপালক মানুষ গাছপালার আবাদ করেছে এবং পশুর প্রতিপালন করেছে।

? ১. মানুষদের সবচেয়ে পুরনো কোন্ ধরনের কাজ থেকে পরবর্তীকালে কৃষিকর্ম ও পশুপালনের উদ্ভব হলো? এবং কোন উপায়েই-বা উদ্ভব হয়েছিল? ২. আদিম

কৃষিজীবী মানুষদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে গল্প শোনাও দেখি। ৩. কৃষিজীবী ও পশুপালক প্রাচীন মানুষদের মধ্যে তার আদিম গোষ্ঠীজীবনের কিছু কি আর অবশিষ্ট ছিল? যুক্তি সহকারে তোমার নিজের ধারণা সুপ্রমাণ করো। ৪. মোটামুটি কোন্ সময়ে মানুষ তীর-ধনুক আবিষ্কার করেছিল 'কালপঞ্জীর' (পৃ. ৪৪) সহায়তা নিয়ে তা দেখাও।

§ ৫. মানুষে মানুষে বৈষম্যের সূত্রপাত

১. ধাতুর ব্যবহার। কিছু কিছু কৌম এমন কিছু জায়গায় বাস করতো যেখানকার মাটিতে **তামা** ছিল। তারা লক্ষ্য করলো, পাথরের সাথে রয়ে যাওয়া তামার টুকরো চুলোর মধ্যে দিলেই আগুনের তাপে গলে যায় এবং নতুন রূপ নেয়। তামার এই গুণ পর্যবেক্ষণ করে মানুষ তামাকে প্রয়োজনানুযায়ী কাজে লাগাতে চেষ্টা করলো। মাটিতে কিংবা অপেক্ষাকৃত নরম পাথরে গর্ত করে তারা ছাঁচ তৈরি করলো এবং গলিত তরল তামা তার মধ্যে ঢেলে দিলে সেই তামা পরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ঐ ছাঁচের মাপে জিনিস তৈরি করা সম্ভব হলো। এই প্রক্রিয়ায় প্রাচীন মানুষ কুড়ুল, ছোরা, কাস্তে ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করলো। একই পদ্ধতিতে তারা সোনা ও রূপা দিয়ে বিভিন্ন অলঙ্কারও নির্মাণ করতে লাগলো।

যে সময়ে শ্রম-হাতিয়ার তৈরির প্রধান উপাদান ছিল পাথর সে সময়কে বলা হয় প্রস্তর যুগ। তামা যখন মানুষের হাতে এলো তার পর থেকে প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে গিয়ে তার স্থান অধিকার করলো **তাম্রযুগ**। এই যুগ শুরু হয়েছিল প্রায় ৬ হাজার বছর পূর্বে (৪৫ পৃষ্ঠায় 'কালপঞ্জীর' মধ্যে লক্ষ্য করো)।

তামা ধাতু হিসেবে বেশ নরম; ফলে তাম্রনির্মিত জিনিসপত্র অতি অল্পেই জীর্ণ হয়ে যেতো। কৃষিজীবীদের বেশির ভাগ তখনো পূর্বের মতোই কাঠ ও হাড়ের কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি নিয়ে কৃষিকাজ করছে। তবে কাঠ ও হাড় কাটা, ঘষা-মাজা ইত্যাদি করে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির ব্যাপারে ধারালো পাথরের চেয়ে তামার হাতিয়ার ব্যবহার করা বেশি সহজ ছিল। কাঠের এবং হাড়ের তৈরি হাতিয়ারেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

২. লাঙ্গল আবিষ্কার। কৃষিজীবী মানুষ পূর্বাপেক্ষা বড়ো আকারে কোদাল তৈরি করে এবার তাতে হাতল লাগালো। কয়েকজন মিলে এই কোদাল (হাতল ধরে) সামনে টানতে থাকতো আর একজন অন্য হাতল ধরে চেপে ধরে থাকতো যাতে কোদালের ফলা মাটির ভিতরে আরো বেশি গভীরে ঢুকে যায়। এভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল **লাঙ্গল** ক্ষেত চষার জন্য। পরে ষাঁড় জুতে দেওয়া হলো লাঙ্গলে। লাঙ্গল
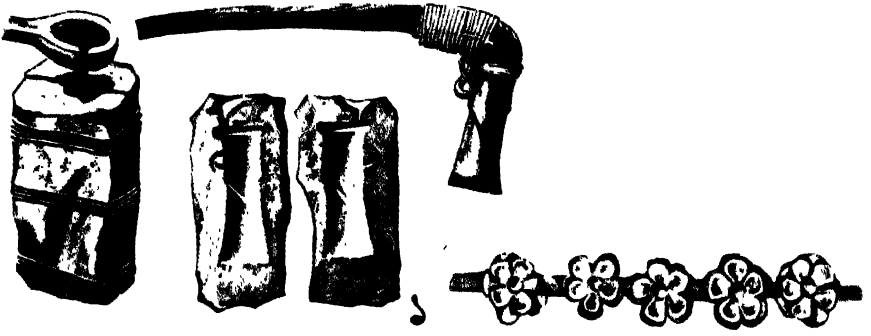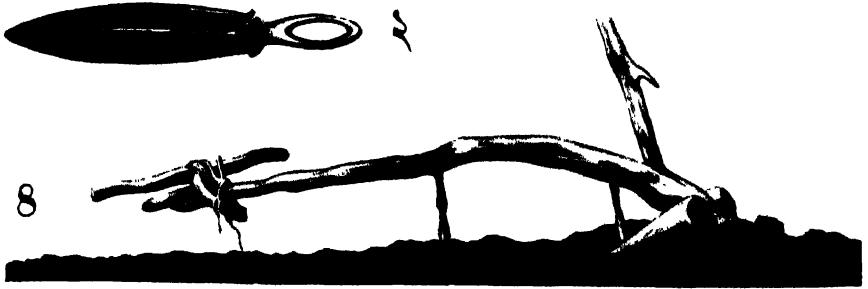
১. তামার তৈরি কুড়ুল এবং তা ঢালাইয়ের ছাঁচ। ২. তাম্র নির্মিত হাতিয়ার: সূচীমুখ বল্লম এবং ছোরা। ৩. সমাধি খননের ফলে আবিষ্কৃত সোনার গয়না। ৪. কাঠের লাঙ্গল। (পুনঃকল্পিত।)

আবিষ্কারের ফলে চাষাবাসের জন্য জমিকে আরো দ্রুতভাবে ও আরো বেশি উপযোগী করে তোলা সম্ভব হলো। লাঙ্গল ঠেলে হাল চাষ করা, গরু সামাল দেওয়া মেয়েদের পক্ষে কঠিন ছিল বলে এ কাজ মূলত পুরুষরাই করতো।

৩. গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে উত্তরণ। জমি পূর্বের মতোই সারা গোষ্ঠীরই সম্পত্তি ছিল। গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষজনই সকলের ব্যবহার্য সার্বজনীন চারণভূমিতে পশু চরাতে নিয়ে যেতো, শিকারও করতো সকলের ব্যবহার্য একই অরণ্যে।

লাঙ্গল দিয়ে ছোটো একটুকরো জমি চাষ করা এবং ফসল তোলার কাজ করতে একটা পরিবারের বেশি লোকজন দরকার পড়তো না। সারা গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ
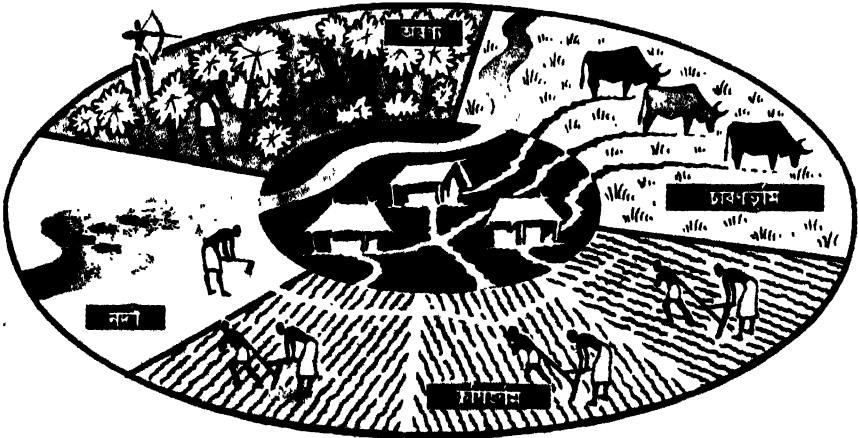
গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে ধীরে ধীরে প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে উত্তরণ। (নক্সায় কেবলমাত্র তৎকালীন জীবনধারার মূল ভিত্তি ও প্রধানতম বিষয়গুলোই শুধু এ'কে দেখানো হয়েছে।) **দুটি নক্সার মধ্যে প্রতিতুলনা করে দেখাও দ্বিতীয় নক্সায় লোকের জীবনযাত্রা কোথায় পাল্টেছে আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। কমপক্ষে চারটি পরিবর্তন খুঁজে বের করো।**

মিলে একটুখানি জমির পিছনে খাটাখাটুনি করা আর অপরিহার্য ছিল না। এমতাবস্থায় গোষ্ঠীর দলপতি চাষবাসের জমিকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করে দিলো, একেকটি জমিখণ্ডকে বলা হলো — **ক্ষেত**; যে ক'টি পরিবার গোষ্ঠীতে আছে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো ক্ষেতগুলো।

প্রতি পরিবারের নিজস্ব ক্ষেত থাকলো এখন থেকে, আর থাকলো তার নিজ শ্রম-হাতিয়ার এবং কিছু গৃহপালিত পশু। ঐ নির্দিষ্ট ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের মালিকও হলো পরিবার। গোষ্ঠীজীবনে সার্বজনীন মালিকানা যে সব বৃহদাকার জিনিসপত্রে প্রযুক্ত হতো সে সবই এখন পৃথক পৃথক পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল।

গোষ্ঠীর গঠনও পাল্টে গেল। এর পর হতে গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল প্রতিবেশীও — যাদের সাথে মিলেমিশে বনজঙ্গল পরিষ্কারাদি করতে হতো তাদের। **গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে।** প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে যারা অংশীদার তাদের বলা যেতে পারে — **গোষ্ঠী-চাষী।** জমির মালিকানা সকলে যৌথভাবে ভোগ করতো বটে, তবে এ ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পত্তি আলাদা-আলাদাভাবে ছিল একেক জনের ব্যক্তিগত ধন।

৪. গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের ভিতর থেকে তৈরি হয়ে গেল স্বতন্ত্র ব্যক্তি — সম্ভ্রান্ত পুরুষ। গোত্রের সার্বজনীন বিষয়-সম্পত্তি বিভক্ত হয়ে আলাদা-আলাদা পরিবারের বিষয়-সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে পূর্বে গোষ্ঠীভুক্ত সকলের মধ্যে যে সাম্য ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। দলপতি আর সর্দারেরা সবচেয়ে উর্বরা জমির বড়ো টুকরোগুলো নিজেরা নিয়ে নিল। যুদ্ধজয়ের ফলে অর্জিত ধনসম্পদের — পশু, তামা, সোনা — বেশির ভাগ তারাই গ্রাস করতে লাগলো। এভাবে দলপতি আর সর্দারেরা ক্রমশ ধনী হতে লাগলো এবং গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য সবাই গরিব হয়ে পড়তে লাগলো তাদের তুলনায়।

সর্দারের পদ পূর্বে যেখানে ছিল সাময়িক, এখন তা হয়ে পড়লো পুরুষানুক্রমিকভাবে চিরন্তন। সর্দারের ছেলে হলো সর্দার, গোষ্ঠীপতির ছেলে হলো গোষ্ঠীপতি। যোগ্যতা ও গুণের উপর আর মানুষের অবস্থা বা পরিচয় নির্ভর করলো না, নির্ভর করতে লাগলো কোন্ পরিবার থেকে সে এসেছে, তার উপরে। সর্দার বা গোষ্ঠীপতির পরিবারকে বলা হতে লাগলো **সম্ভ্রান্ত** পরিবার। যারা **সম্ভ্রান্ত মানুষ** তারাই সমস্ত কৌমের উপর খবরদারি করতে শুরু করলো।

মানুষে মানুষে বৈষম্য যে শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে প্রাচীন কালের সমাধি পর্যবেক্ষণ করে। খননকার্যরত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কৃত কবরের মধ্যে কোনো কোনোটায় কখনো পেয়েছেন খাদ্যাদি রাখার মৃন্ময় পাত্র, কোনোটায়-বা শ্রমের হাতিয়ার, আর অন্যগুলোয় — মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ও দামী অলঙ্কার।

গোত্রের যৌথ মালিকানার অবসান ও মানুষের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হওয়ায় আদিম মানুষের গোষ্ঠীজীবন ধ্বংস হয়ে গেল।

১. রেড ইণ্ডিয়ানদের কাষ্ঠনির্মিত দেবমূর্তি। ২. দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ ও পশু বলিদান। (প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোনো দ্বীপে দেখা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে এই চিত্রটি জনৈক ইউরোপীয় শিল্পী এ'কেছেন।) বলির জন্য ধরে আনা মানুষটি বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। দুটি লোক সজোরে মাদল বাজাচ্ছে যাতে হতভাগ্যের চিৎকার তাতে চাপা পড়ে যায়। সামান্য পিছনে মানুষের অসংখ্য করোটি দেখা যাচ্ছে — ইতিপূর্বে একইভাবে যাদের বলি দেয়া হয়েছে এগুলো তাদেরই মাথার খুলি। বধ্যভূমিতে আরো দেখা যাচ্ছে — বলির জন্য নিয়ে আসা পশু।

৫. কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীজীবনে ধর্মবিশ্বাস। মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পাল্টে গেল। পরিবর্তিত হয়ে গেল তার ধর্মবিশ্বাসও।

প্রকৃতির যে সব জিনিসের উপর তাদের জীবন নির্ভরশীল ছিল সেগুলোর 'আত্মা' তাদের কাছে অত্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দিলো: যেমন, সূর্যের (যার তাপে ফসল পাকে), মেঘের (যার বারিধারায় জমি আর্দ্র হয়), শস্যবীজের (যা মাটির বুক থেকে ফসল ফলিয়ে তোলে) 'আত্মা'।
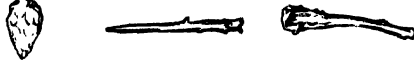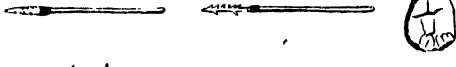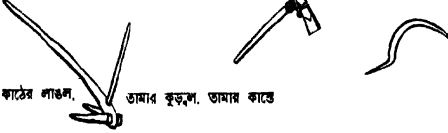
তারা মনে করতো, এই সব 'আত্মা' নিশ্চয়ই বিভিন্ন শক্তিশালী দেবতাদের দান, যাদের ইচ্ছায় পৃথিবীতে বসন্ত আসে, বৃষ্টি পড়ে, ফসল ফলে।

তারা আরো ভাবতো যে, এই দেবতারা মানুষ বা পশুর রূপ ধারণ করে থাকে। কাঠ বা পাথর দিয়ে তারা মূর্তি বানালো তাদের কল্পিত দেবতাদের আদলে। এগুলোকে বলা হলো **দেবমূর্তি**। দেবতাদের করুণা পাবার জন্য তারা দেবমূর্তিদের সামনে বশ্যতাস্বীকারের পরিচয় স্বরূপ ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণত হতে লাগলো এবং দেবতাদের কাছে আনতে লাগলো তাদের উপহার, অর্থাৎ **বলি**: কখনো গৃহপালিত জীবজন্তু, কখনো-বা এমন কি মানুষ পর্যন্ত হত্যা করে

দেবতাদের উৎসর্গ করা হলো। দেবমূর্তির ওষ্ঠ বলির রক্তে রঞ্জিত করে দেওয়া হলো।

? ১. গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীব্যবস্থার মধ্যে কী কী সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য ছিল? ২. আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থা জীবনের কোন্ লক্ষণাদি প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনেও টিকে থাকলো এবং বিলুপ্ত হয়ে গেল কোন্গুলো? ৩. 'সম্ভ্রান্ত' বলা হতো কাদের? গোষ্ঠীর অন্য সকলের অবস্থার চেয়ে এই সম্ভ্রান্ত লোকদের অবস্থা অন্যরকম ছিল কোন্ দিক থেকে? ৪. শিকারী প্রাচীন মানুষদের ধর্মবিশ্বাস ও কৃষিজীবী মানুষদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই উভয় ধরনের ধর্মবিশ্বাসেরই উদ্ভব কী থেকে? ধর্মবিশ্বাসের অপকার সম্বন্ধে ৫ম পরিচ্ছেদে নতুন কী তথ্য তুমি জানতে পারলে?

মানুষের আদি ইতিহাস মনে আছে কি না দেখে নাও

সময়	শ্রমের হাতিয়ার	অন্যান্য দ্রব্য নির্মাণ
অজানা আদিম কাল থেকে ২ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের	হাতে তৈরি ধারালো পাথুরে অস্ত্র, কাঠের শাবল ও লাঠি	—
এখন থেকে ৩০-২০ হাজার বছর আগে	বল্লম, হাপুন, রাঁদা	পশুচর্ম থেকে পারিচ্ছদ তৈরি
এখন থেকে ১৩-৭ হাজার বছর আগে	তীর-ধনুক, কুড়ুল, কোদাল, কাস্তে, ডিঙি এবং কাপড় বোনার তাঁত	কাপড়ের পোষাক ও মাটির পাত্র
এখন থেকে ৬-৫ হাজার বছর আগে	কাঠের লাঙল, তামার কুড়ুল, তামার কাস্তে	তাম্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র এবং সোনা ও রুপোর তৈরি অলংকার

আধুনিক মানুষদের তুলনায় পৃথিবীর আদিম মানুষেরা ছিল একেবারে অন্য রকম।

পৃথিবীতে আদিম মানবের উদ্ভব কখন? পশুর সাথে তাদের পার্থক্য কী ছিল? আধুনিক মানুষের সাথেই-বা তাদের তফাৎ কোথায়?

শ্রম-হাতিয়ারের বদৌলতে মানুষ উন্নততর হতে লাগলো,

মানুষের বিকাশ হলো কীভাবে? 'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষের উদ্ভব কবে? এই বইয়ের কোন্ কোন্ চিত্র 'হোমো সাপিয়েন্সদের' উদ্ভব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে?

শ্রম-হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধন করলো তারা,

আদিম মানুষদের শ্রম-হাতিয়ার ক্রমশ কীভাবে উন্নততর হতে লাগলো, তার পরিচয় দাও। উপরের নক্সা দেখে মিলিয়ে নাও — তুমি কোনো তথ্য বাদ দিয়ে যাচ্ছ না তো।

চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জরুরী পর্যবেক্ষণও তারা করেছিল।

প্রকৃতি সম্বন্ধে আদিম মানুষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণগুলো কী ছিল? এই পর্যবেক্ষণকে তারা কাজে লাগিয়েছিল কীভাবে?

জীবিকানির্বাহের প্রধান মাধ্যম	আদি কালের মানুষ	ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পকলা
সংগ্রহবৃত্তি এবং একটি-দুটি করে বিচ্ছিন্নভাবে পশু শিকার	যূথবদ্ধ আদিম মানুষের দল	তখনো জন্মায় নি
পশু শিকার, মাছ ধরা, সংগ্রহবৃত্তি	'হোমো সাপিয়েন্স' মানুষের আবির্ভাব। গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভব	যাদুবিশ্বাস, এবং মানুষ ও প্রকৃতির সমস্ত কিছুর 'আত্মা'য় বিশ্বাস করা শুরু। গুহাচিত্র, মানুষ ও পশুর মূর্তি নির্মাণ
শিকার, সংগ্রহবৃত্তি, পশুকে পোষ মানানো, কৃষিতে কোদালের ব্যবহার, হস্তশিল্প	গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী ও কুল	কৃষিকর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার। দেবমূর্তি, দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান
কৃষিকর্ম, পশুপালন, হস্তশিল্প	গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠীর অবসান এবং প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীতে তার সম্প্রসারণ। কুলপতি ও সর্দারদের শক্তিবৃদ্ধি	

লোকজনদের দৈনন্দিন কাজকর্মের পদ্ধতি আরো উন্নত হলো এবং তাদের নিত্য কর্মাদি আরো অনেক বেড়ে গেল।

আদিম মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে দাও। তাদের বিভিন্ন কর্মধারা কোন্ কোন্ শ্রম-হাতিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল?

আদিম মানুষের কাছে প্রকৃতির বহু কিছুই ছিল অজ্ঞেয়, বহু কিছুতেই তারা ভয় পেত।

প্রকৃতির সামনে এই অসহায়ত্ব ও ভয় আদিম মানুষকে শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নিয়ে গেল? আদিম মানুষদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব সম্বন্ধে এই বইয়ে কোন্ চিত্র দেখতে পাচ্ছ?

দশ লক্ষ বছরেরও বেশি মানুষ আদিম গোষ্ঠীজীবন যাপন করেছিল।

আদিম গোষ্ঠীসমাজের প্রধান লক্ষণ ছিল কি? কেন আদিম মানুষ শুধুমাত্র যূথবদ্ধভাবে একত্রে বাস করতে ও কাজ করতে বাধ্য হতো? প্রাচীন মানুষদের এরকম দল কোন্ কোন্ ধরনের ছিল?

কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে মানুষে মানুষে বৈষম্যের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল।

মানুষের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হলো কীভাবে? কোন্ ব্যাপারে এই বৈষম্য ধরা পড়তো?

ইতিহাসের যুগবিভাগ

১. পুরাকালে কীভাবে সময় গণনা করা হতো। কৃষিজীবী প্রাচীন মানুষেরা জানতো যে নির্দিষ্ট সময়ব্যবধানে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ ফসল তোলার সময় আসে। একটা ফসল কাটার সময় থেকে আরেকটা ফসল কাটার সময়ের মধ্যে যে কালগত ব্যবধান তাকে তারা একটা নির্দিষ্ট সময়পরিমাণ হিসেবে বুঝতে পেরেছিল। বৎসর সম্বন্ধে ধারণার উৎপত্তি এভাবেই প্রথম ঘটে।

বিশেষভাবে মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা যদি কোনো বৎসরে ঘটতো তা হলে সেই বৎসরকে প্রথম বৎসর ধরে নিয়ে বৎসর গণনা চলতো। যেমন, কোনো জায়গায় ভয়ানক প্লাবন হলে সে স্থানের লোকজন বৎসর গণনা শুরু করতো সেই বছর থেকে, আবার কোনো স্থানে হয়তো নগর পত্তনের সময় থেকে শুরু হতো বৎসর গণনা — যেমনটা হয়েছে রোমের ক্ষেত্রে। স্মরণযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হবার বৎসর হতো প্রথম বৎসর, পরবর্তী বছর হতো দ্বিতীয় বৎসর, তার পরেরটা হতো তৃতীয় — এইরকম। ফলে বিভিন্ন জায়গায় বৎসরের হিসাবে কোনো মিল ছিল না, একেক স্থানে তা ছিল একেক রকম। খুবই অসুবিধার ব্যাপার, সন্দেহ নেই।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
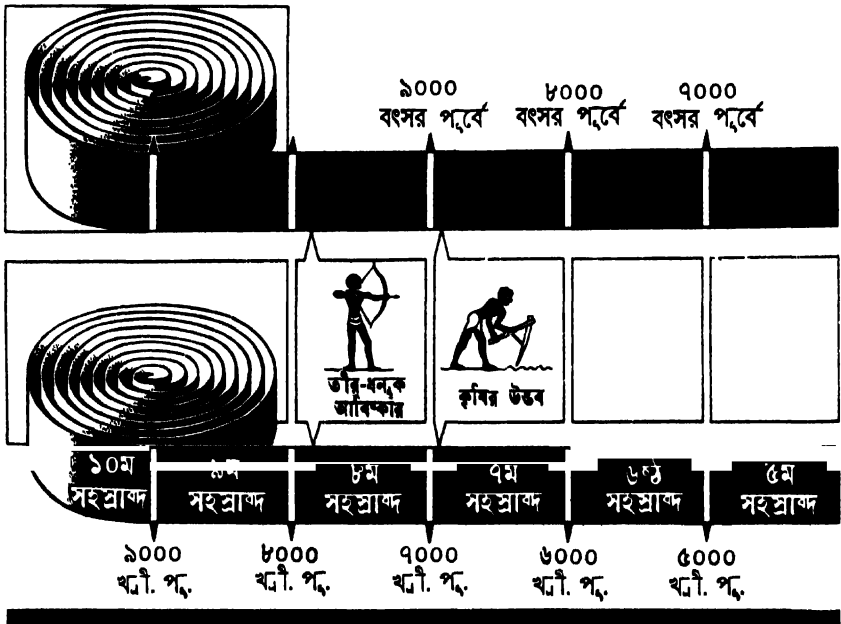
২. **খ্রীষ্টাব্দ**। এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা। পৃথিবীতে রটে গেল যে, যিশু খ্রীষ্টের দেহ ধারণ করে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে। এই কাহিনী কল্পনাপ্রসূত হলেও বহু লোক তা বিশ্বাস করেছিল। (যিশু খ্রীষ্টের কাহিনীর উদ্ভব কীসে এবং লোকে কেনই-বা তা বিশ্বাস করেছিল সে সম্বন্ধে তোমরা এ বইতেই আরো পরে ৫৮ম সংখ্যক পরিচ্ছেদে পড়বে।)

৫০০-৬০০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর বহু দেশেই এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো। তখন চিন্তাভাবনা করে দেখা হলো রোম শহর পত্তনের কত পরে তথাকথিত যিশু জন্ম নিয়েছিলেন এবং তার পর যিশুর জন্মবৎসর থেকে বৎসর গণনা করা হতে লাগলো। বর্তমানে এ নিয়মেই আমরা বৎসর গণনা করে থাকি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এ নিয়ম ছড়িয়ে পড়েছে। যদি আমরা লিখি ১৮৭০ কিংবা ১৯১৭, তা হলে আমেরিকা বা জাপানেই হোক, কিংবা পোল্যাণ্ডেই হোক — সর্বত্রই সকলে বুঝবে কোন্ সময়ের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রথম বৎসর থেকে বর্তমান কাল অবধি সময়কে আমরা নাম দিয়েছি **খ্রীষ্টাব্দ**, সংক্ষেপে কখনো বা লিখি **খ্রী.**।

এক শ' বৎসরকে একসাথে হিসাবে ধরে আমরা বলি **শতাব্দী** কিংবা **শতক**। দশ শতাব্দীকে একসাথে হিসাবে ধরে আমরা বলি **সহস্রাব্দ**। খ্রীষ্টাব্দ শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রায় দু'হাজার বছর হতে চললো।

কালপঞ্জ
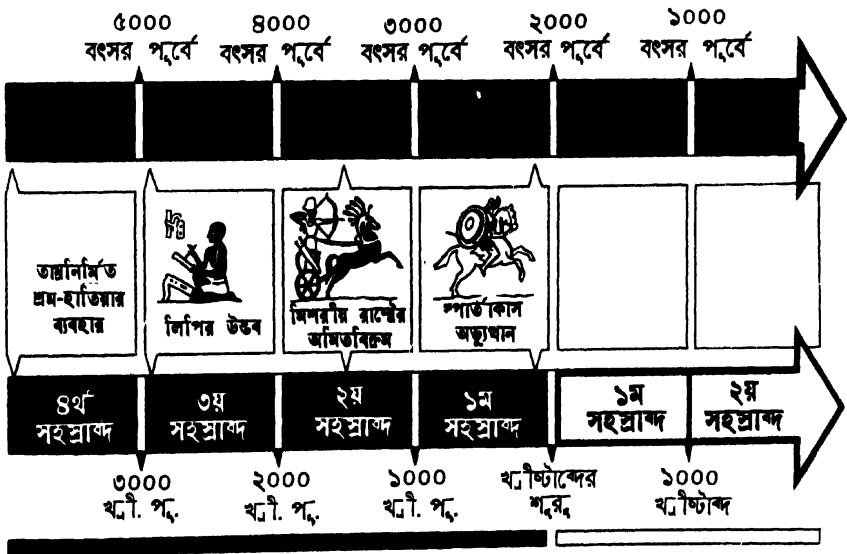
৩. খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বৎসর গণনা। খ্রীষ্টাব্দ শুরু হবার পূর্বে পৃথিবীতে অনেক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সে সব উল্লেখের সময় আমরা বলি তা ঘটেছে **খ্রীষ্টপূর্বাব্দে,** লেখার সময়ে সংক্ষেপ করে হয়তো লিখি **খ্রী. পূ.।**

৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় 'কালপঞ্জী' ভালো করে দেখা যাক। ডানদিকের চৌকো ঘরদুটোর অর্থ দু'হাজার বর্ষব্যাপী খ্রীষ্টাব্দ। এ দুটো ঘরের বাঁদিকের সব ক'টা ঘর খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বোঝাচ্ছে। 'কালপঞ্জীর' ভিতরে কৃষিকর্মের উদ্ভব কবে হয়েছে লক্ষ্য করো। খ্রীষ্টাব্দ শুরু হবার প্রায় ৭ হাজার বৎসর পূর্বে তার উদ্ভব। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত তা হলে কত হাজার বছর কাটলো বলো তো?

খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কেটেছে ৭ হাজার বছর + খ্রীষ্টাব্দ প্রায় ২ হাজার বছর মিলে সবসুদ্ধ তা হলে দাঁড়াচ্ছে: প্রায় ৯ হাজার বছর।

খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৪ সহস্রাব্দ পূর্বে তাম্রনির্মিত শ্রম-হাতিয়ারের উদ্ভব। তার মানে, ৪ + ২ = প্রায় ৬ হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা।

গণনার নিয়মটা শেখো: কত বৎসর আগে ঘটনাটা ঘটেছে যদি জানি, **খ্রীষ্টাব্দের** কত হাজার বৎসর পূর্বে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, কীভাবে বের করবে বলো। 'কালপঞ্জীতে' উপরের যে কালো মোটা রেখা আছে, সেটা দেখে তোমার হিসাব মিলিয়ে নাও।

লিপির উদ্ভবকাল প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে। তা হলে কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাপারটা ঘটেছিল? ৫ হাজার বছর থেকে আমাদের খ্রীষ্টাব্দের ২ হাজার বছর তো বাদ পড়লো (৫ − ২ = ৩), মানে থাকলো ৩ হাজার বছর, অর্থাৎ ৩ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

গণনার এ নিয়মটাও শেখো: যদি জানি কত সহস্র বৎসর **পূর্বে** ঘটনাটি ঘটেছে, তা হলে তা কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ঘটনা কীভাবে হিসাব করবো বলো।

অনুশীলনী:

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে তীর-ধনুক আবিষ্কার করেছে মানুষ। এখন থেকে প্রায় কতদিন পূর্বের ঘটনা এটা? ('কালপঞ্জীর' সাহায্য নাও।)

লিপির উদ্ভব প্রায় ৫ হাজার বছর আগে আর তামার ব্যবহার শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে। তা হলে সময়ের দিক থেকে কোন্‌টি আগের ঘটনা এবং উভয় ঘটনার মধ্যে কালব্যবধান কতখানি?

*** 'আদিম মানবের জীবনযাত্রা' পর্বের সম্পূরক প্রশ্নাবলী:**

* ধরা যাক, কোনো একটা কৌমে পশুচর্ম, বেড়া, হাঁড়ি, ঘরের চাল, বল্লম, দাঁড়, কুঁড়ে, বপন করা, গলানো অর্থজ্ঞাপক শব্দ সেখানকার লোকজন বলছে। তা হলে ঐ কৌমে জীবনযাত্রার পদ্ধতি কীরকম ছিল বলে তোমার মনে হয়?

* দু'পুরুষ বা যুগের মধ্যে গড়পড়তা ২০ বছরের ব্যবধান ধরে নিয়ে হিসাব করে বলো দেখি — ১০ লক্ষ বৎসরে আদিম মানুষেরা কত পুরুষ ধরে নিজেরা পরিবর্তিত হয়েছে?

* আদিম মানুষদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎস কী?

সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমি

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন মিশর

পৃথিবীতে আদি কালে সমস্ত মানুষ আদিম গোষ্ঠীজীবন যাপন করতো, তাদের মূল কাজ ছিল খাদ্যসংগ্রহ ও শিকার। ধীরে ধীরে তারা কৃষিকাজে ও পশুপালনে অভ্যস্ত হলো। যেখানে নরম উর্বরা মাটি মিলতো, যে জায়গা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়াসম্পন্ন ছিল, সে সব স্থানে কৃষিকাজ দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। পৃথিবীর যে সব দেশে কৃষিকর্মের এরকম অনুকূল অবস্থা ছিল না, সেখানে কৃষির উদ্ভব ঘটেছে আরো কয়েক সহস্র বৎসর পরে। এখনো পৃথিবীতে কিছু কিছু অধিবাসী রয়ে গেছে যারা আজ পর্যন্ত কৃষিকর্ম কাকে বলে জানেই না।

একটি দেশ আছে যেখানে বহু পূর্বে সর্বপ্রথম কৃষিকাজ ও পশুপালন ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। দেশটি **উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায়** অবস্থিত, নাম — **প্রাচীন মিশর।**

§ ৬. প্রাচীন মিশরের নিসর্গ ও তার অধিবাসী

(মানচিত্র ১ ও ২)

১. প্রাচীন মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বিরল এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। এখানে হাজার হাজার মাইল জায়গা জুড়ে বালি-কাঁকরময় মরুভূমি।

মরুভূমির উপর দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান একটি নদী — **নীল নদ। আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে** অবস্থিত বড়ো বড়ো

নীল নদের উপত্যকা। (আলোকচিত্র।)

শাদুফ্। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) প্রাচীন মিশরীয়দের অর্থনীতির ক্ষেত্রে শাদুফের গুরুত্ব কীরকম ছিল?

হ্রদের জল নীল নদ দিয়ে বয়ে চলে। (১ নং মানচিত্রে হ্রদ ও নীল নদ খুঁজে বের করো।) নদীপ্রবাহকে আবার বহুস্থানে ব্যাহত করেছে জলপ্রপাত। এই সব বাধা অতিক্রম করে নীল নদ প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে পড়েছে **উপত্যকার** বুকে। ঢালু নিম্নভূমির উপর দিয়ে গিয়ে অবশেষে নীল নদ মিলিত হয়েছে **ভূমধ্যসাগরে**। এখানে নীল নদ থেকে বহু শাখানদী বেরিয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে **ব-দ্বীপ**। (২ নং মানচিত্রে নীল নদের উপরে জলপ্রপাত, উপত্যকাভূমি এবং ব-দ্বীপ অঞ্চল খুঁজে দেখ।)

জলপ্রপাতের অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এলাকার উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল **প্রাচীন মিশর**।

২. নীল নদের বন্যা। গ্রীষ্মকাল শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। যাদের জল নীল নদ দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই হ্রদগুলো তখন অত্যধিক বারিপাতের ফলে প্লাবিত হয়ে যায়। পাহাড়ী এলাকায় যেখানে নীল নদের উপনদীগুলির উৎস, সেখানে বরফ গলে; পাহাড়ী মাটি ক্ষয় করে খরস্রোতা জলপ্রবাহ গিয়ে মেশে নদীতে। নীলের জল অতি দ্রুত এত বেড়ে যায় যে দু'কূল ছাপিয়ে যায় তার জলধারা এবং তখন ভয়ানক বন্যা দেখা দেয়।
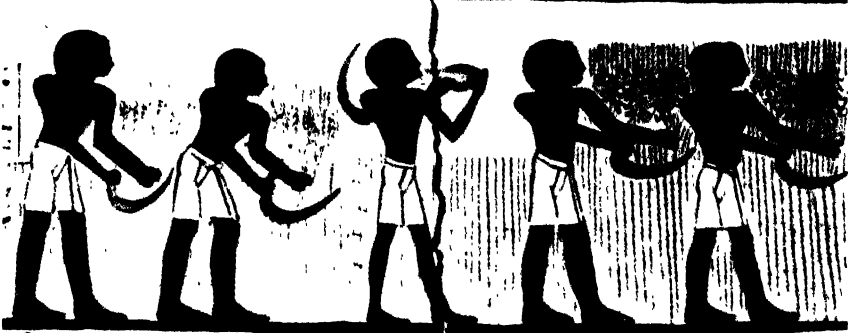
প্রাচীন মিশরে কৃষিব্যবস্থা। (সমাধিগাত্রে প্রাপ্ত দেয়ালচিত্র; কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত।) **বর্তমান গ্রন্থে পঠিত বক্তব্যের ভিত্তিতে বোঝাও এই ছবিগুলোয় লোকজনেরা কী করছে। ছবি তিনটি বিশ্লেষণ করে লোকগুলোর কর্মের ধারাবাহিকতার বিবরণ দাও।**

দু'কূল প্লাবিত নীল নদের জলে ভেসে আসে অজস্র জলজ উদ্ভিদ। তার পরিমাণ এত বেশি যে নীলের জল একেবারে টলটল হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে, পাহাড়ী এলাকার লাল পাথুরেমাটি ভাসিয়ে নিয়ে খরস্রোতা জলপ্রবাহ এসে নদীতে মেশার ফলে জলের রং হয়ে যায় রক্তের মতো লাল। গাছগাছড়া পচে গিয়ে এবং তার সাথে জলধারা বাহিত লাল পাথুরেমাটি মিশে যে পলি সৃষ্টি হয় তা বন্যাপ্লাবিত নদীতীরের উপর থিতিয়ে বসে। নভেম্বর

মাসে বন্যার জল নেমে গিয়ে নদী তার পূর্বের আকার ধারণ করে। বন্যার পরে উপত্যকা অঞ্চলের মাটি শুধু যে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় তাই নয়, অত্যন্ত উর্বরা কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটির স্তরে তা ঢেকে যায়।

নীল নদের জল অবশ্য সমগ্র উপত্যকায় সমভাবে সর্বত্র জলসিঞ্চন করতে পারতো না। আপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে যেখানে বন্যার জল গিয়ে পৌঁছাতে পারতো না, সে সব স্থান অনুর্বর মরুভূমিই থেকে যেত। আর অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় জল জমে থেকে সৃষ্টি হতো জলাশয়, গজিয়ে উঠতো নলখাগড়ার বন, ঝোপঝাড়। এইরকম ঝোপঝাড়-জংলা জায়গায় ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকতো সিংহ, আর জলাভূমিতে অসংখ্য জাতের বিষাক্ত সাপ। জলাশয়ের হাজারটা রকমের কীটপতঙ্গের দূষিত প্রভাবে নানান ধরনের জ্বরজ্বালা এ অঞ্চলে লেগেই থাকতো।

৩. বালুকারাশি ও জলাশয়ের বিরুদ্ধে লোকজনের সংগ্রাম। নীল নদের উপত্যকায় ফসল ফলাবার জন্য সেখানকার মানুষকে একাধারে মরুভূমি, জলাশয় ও ঝোপঝাড় আগাছার সাথে লড়াই করতে হয়েছে।

নিচু জলাভূমি থেকে **মিশরীরা** — অর্থাৎ মিশরের অধিবাসীরা — খাল কেটে নিয়ে যেত যাতে জলাশয়ের অপ্রয়োজনীয় বাড়তি জল বেরিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে, এবং ঝোপঝাড়, নলখাগড়ার জঙ্গল সব তারা কেটে সাফ করে ফেলতো। তারা এঁটেল মাটির সাথে কেটে ফেলা ঝোপঝাড়ের পাতা-ডালপালা মিশিয়ে বাঁধ তৈরির ব্যবস্থা করেছিল; সমগ্র উপত্যকা অঞ্চল **বাঁধ দিয়ে** কয়েকটি ভাগে তারা বিভক্ত করে নিল। তার পর প্রত্যেক বাঁধে গেট তৈরি করলো। উদ্দেশ্য, বন্যার সময় জমিতে যতটুক জল প্রয়োজন ততটুকুই শুধু তারা ছাড়বে। যে সব জায়গার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু বলে বন্যার জল পৌঁছাতো না, সেখানে খালের জল কপিকল বা **শাদুফ-য়ের** (দ্র. ৫০ পৃষ্ঠার ছবি) সাহায্যে উঁচুতে তুলে তারা জলসেচনের ব্যবস্থা করেছিল।

হাওয়ায় মরুভূমি থেকে সব সময়েই বালি উড়ে এসে পড়তো খালে, খাল ভরাট হয়ে গভীরতা কমে যেত, ফলে প্রত্যেক বৎসর লোকজনকে খাল পরিষ্কার করতে হতো। বন্যায় বাঁধও ভেঙে যেত, সেই বাঁধ আবার নতুন করে দিতে হতো তাদের।* মানুষের বিপুল শ্রমের সামনে শেষ পর্যন্ত বালুকারাশি আর জলাশয়কে পিছু হটতে হয়েছিল।

৪. মিশরীদের প্রধান জীবিকা ছিল — কৃষিকাজ। বন্যার পরে নরম সিক্ত মাটিতে কোদাল চালানো সহজ হতো, কাঠের তৈরি হালকা লাঙ্গল দিয়ে হালচাষ করা অল্প পরিশ্রমে সম্ভব হতো। কর্ষিত ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে মিশরীরা তার উপরে ছাগল,

* বর্তমানে আসোয়ান শহরের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় নীল নদের উপরে বিশাল বাঁধ বেঁধে নীল নদের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

মিশরীয় হস্তশিল্প তৈরি করা হচ্ছে। (সমাধিগাত্রে প্রাপ্ত দেয়ালচিত্র।) হস্তশিল্প প্রস্তুত করাই যাদের কাজ তারাই হস্তশিল্পী বা কারিগর। **হস্তশিল্পীরা কোন্ কোন্ ধরনের কাজ করছে এবং সে কাজে কী কী বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বলো। এমন কিছু যন্ত্রপাতি কি লক্ষ্য করছো যা বর্তমান কালেও আমরা ব্যবহার করে থাকি?**

ভেড়া ও শূকরের পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেত: এই সব পশুদের পায়ের চাপে ছড়ানো শস্যবীজ ভালোভাবে জমিতে গেঁথে বসতো। শস্যমঞ্জরী থেকে ফসল ঝাড়তো তারা মাটিতে ফসলের আঁটি আছাড় মেরে মেরে এবং কাটা ফসলের উপরে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিয়ে।

মিশরীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ। নীল নদের উপত্যকা ও ব-দ্বীপাঞ্চলে যব ও গমের মঞ্জরীতে ভরে থাকতো মাঠ, শণের চাষ হতো; ঘরের পাশের জমিতে ফলতো শাকসব্জী হরেক রকমের আর বাগানে — ফলের সম্ভার।

৫. প্রাচীন মিশরে হস্তশিল্প ও পণ্যের বিনিময় প্রথা। চাষীরা মাটির সাথে ডালপালা নলখাগড়া মিশিয়ে ঘর তৈরি করতো, পুরু মোটা কাপড় বুনতো, লাঙ্গল-কোদাল ইত্যাদি বানাতো, তৈরি করতো মাটির বাসনকোসন। যারা এসব কর্ম অন্যদের চেয়ে দ্রুত ও উৎ করতে পারতো তারা ধীরে ধীরে

কৃষিকর্ম ছেড়ে দিলো। পেশার দিক দিয়ে তারা কেউ হলো ছুতোর, কেউ কুমোর, কেউ-বা তাঁতী, কিংবা অন্য কোনো ধরনের কারিগর। ছেলেপিলেরা বাল্যকাল থেকেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে করতে নিজেরাও রপ্ত করে নিল সেই কাজ, তারাও হলো কারিগর। বিশেষভাবে দক্ষতার প্রয়োজন হতো তামা থেকে অস্ত্রশস্ত্র বা অন্যান্য শ্রম-হাতিয়ার তৈরি কিংবা সোনা দিয়ে গহনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে।

প্রথম দিকে হস্তশিল্পী বা কারিগরেরা জিনিস তৈরি করতো নিজেদের গোষ্ঠীর লোকজনদের জন্য, বিনিময়ে গ্রহণ করতো রুটি বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু পরে তারা নিজেদের তৈরি দ্রব্যাদি ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের কাছেও বিনিময় করতে লাগলো।

জিনিসপত্র লেনদেন বা বিনিময়ের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে নীল নদের জলপথ ছিল অত্যন্ত সুবিধাজনক উপায়। গম, কাঠ ও নানাবিধ হস্তশিল্প বোঝাই নৌকো নীল নদের উপরে ভেসে যেত উজানে-ভাটিতে সারা বছর ধরে। নীল নদের তীরে গড়ে উঠলো ছোটো-বড়ো শহর। ঐসব শহরেই হতো এইসব লেনদেন, এখানেই বাস করতো এবং কাজকর্ম করতো কারিগরের দল।

মানুষের বিপুল শ্রমের বিনিময়ে নীল নদের উপত্যকার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছিল। মনুষ্য বসবাসের প্রায় অনুপযোগী একটি স্থান থেকে মিশর রূপান্তরিত হচ্ছিল ঘন বসতি বহুল কৃষিপ্রধান দেশে।

? ১. তোমার দেশের প্রকৃতি ও প্রাচীন মিশরের প্রকৃতির মধ্যে কী তফাৎ? ২. নীল নদে যদি বন্যা না হতো, তা হলে নীল উপত্যকার অবস্থা কী হতো? ৩. প্রকৃতির কোন্ বিশেষ অবস্থার জন্য মিশরী কৃষকদের কৃষিকাজে সুবিধা ও অসুবিধা হতো? ৪. জীবনযাত্রা ও চাষবাসের জন্য নীল উপত্যকাকে কীভাবে জনগণ নিজেদের উপযোগী করে নিয়েছিল?

§ ৭. প্রাচীন মিশরীয় সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব

মনে করতে চেষ্টা করো — কৃষিকর্ম, পশুপালন ও হস্তশিল্পের বিকাশের ফলে দলপতি ও সর্দারদের অবস্থার কীরকম পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং সম্ভ্রান্ত মানুষ-বা বলা হতে লাগলো কাদের (§ ৫: ৪)।

১. লোকজনকে শোষণ করা কেন সম্ভব হয়ে উঠলো। আদিম শিকারীজীবনে একজন মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের খাদ্যসংস্থান করাই সম্ভব ছিল; অবস্থা এমন ছিল যে, এমন কি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করতে বাধ্য হতো। নিজের জন্য অন্য লোকজনকে খাটিয়ে নেবার কোনো সুযোগই ছিল না তখন। নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টায় একজন যা সংগ্রহ করতে পারতো সেটুকুই সে ভোগ করতে পারতো।

মিশরের কৃষিজীবী মানুষ নিজেদের শ্রমে যে খাদ্যসামগ্রী ফলাতে পেরেছিল শিকারী মানুষ সে পরিমাণ খাদ্যবস্তু কখনো সংগ্রহ করতে পারে নি। নীল উপত্যকার উর্বরা জমিতে ফসল ফলতো প্রচুর, বিশেষত লাঙল দিয়ে জমি চাষের ফলে। যতটুকু তাদের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল ফলাতো তারা এবং গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত। ক্ষেতে কাজ করে ফসল যারা ফলাতো তাদের অন্নসংস্থান সে ফসল থেকে হতো তো বটেই, উপরন্তু বেঁচেও যেত। এরকম অবস্থায় লোককে আরো বেশি কাজ করিয়ে আরো বেশি বাড়তি ফসল পাবার চিন্তা মাথায় এলো। উদ্দেশ্য, সংগৃহীত খাদ্যশস্য ও পশুর বিনিময়ে তামা, সোনা, রুপো এবং কারিগরদের তৈরি নানান হস্তশিল্পদ্রব্য পাওয়া যেতে পারে।

মিশরে কৃষিব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকজনকে শোষণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। লোকজনকে শোষণ করা — এর অর্থ, অন্যের মেহনতের ফল তাকে ভোগ করতে না দিয়ে নিজে ভোগ করা। **শোষণ** মানে অন্যের শ্রমে উপার্জিত জিনিস নিজে ভোগ করা।

২. দাস প্রথার উদ্ভব ও দাসমালিক কর্তৃক তাদের শোষণ। বিভিন্ন কৌমের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের পরে বিজয়ী কৌমের হাতে পরাজিত কৌমের যে সব লোকজন বন্দী হতো, প্রথমদিকে তাদের মেরে ফেলা হতো। বন্দীকে সেজন্য মিশরীরা বলতো ‘নিহত’। যখন দেখা গেল যে, বেশি পরিশ্রমের ফলে বাড়তি উপার্জন সম্ভব, তখন বন্দীদের আর মেরে না ফেলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নিয়ে নিলো এবং তাদের **দাস** বানালো। এই দাসদের বলা হলো ‘জীবন্ত নিহত’।

ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত দাসদের খাটানো হতো: তারা কপিকলে (শাদুফ্) করে জল তুলে জমিতে দিতো, খাল খনন করতো, বাঁধ বাঁধতো, নির্মাণের জন্য পাথর ভাঙতো। নিজের বলতে কিছু ছিল না তাদের। তারা ছিল তাদের মালিকের সম্পত্তি। তাদের শ্রমের ফলে প্রাপ্ত সমস্ত কিছুই হতো তাদের মালিকদের সম্পত্তি। এমন কি তাদের খেতে দেওয়া হতো শুধু ততোটুকুই যেটুকু না দিলেই নয়, যতটুকু খেলে তারা না মরে গিয়ে টিকে থাকবে এবং কাজ করতে পারবে। তাদের প্রহার করা, অন্য লোকের কাছে বিক্রী করে দেওয়া, এমন কি মেরে ফেলারও অধিকার ছিল মালিকদের।

গোষ্ঠী-চাষীদের তুলনায় মিশরে দাসের সংখ্যা কম ছিল। তবু জমিতে জলসেচ ও জলনিষ্কাশন প্রভৃতি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও কঠিন কর্ম তাদের দিয়েই করানো হতো। দাসদের যারা মালিক ছিল সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই কাজের পরিচালনাভার এবং জমিতে জল বণ্টনের ব্যবস্থা নিজেদের দখলে রাখতো।

৩. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কৃষকশোষণ। মিশরে কৃষিযোগ্য জমির বেশির ভাগই চাষবাস করতো **গোষ্ঠী-চাষীরা**। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিখণ্ডে নিজস্ব

১   ২

১. 'জীবন্ত নিহতের দল'। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) এই লোকগুলোর ভাগ্যে কী আছে বলতে পারো? ২. নুবিয়া অঞ্চল থেকে ধরে আনা 'লুঠের মাল'। (মিশরীয় চিত্র।) এদের যে বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা হতো তা ১ম ও ২য় চিত্রে শিল্পী কীভাবে বুঝিয়েছেন? প্রাচীন এইসব চিত্রের ভিত্তিতে এমন কি প্রমাণ করা সম্ভব যে, ক্রীতদাসেরা তাদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো কখনো?

শ্রম-হাতিয়ার দিয়ে কৃষিকাজ করতো। উপরন্তু দাসদের সাথে মিলে ক্ষেতখামারকে আগাছামুক্ত করা, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা ইত্যাদি কাজও করতো।

জমিতে জলসেচ ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আরো বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে গেল এবং চাষীদের উপরেও কর্তৃত্ব করার সুযোগ হাতে পেল। পরিষ্কৃত জমির মধ্যে সবচেয়ে সরেস যে জমিগুলো তা চলে গেল তাদের দখলে। চাষীদের কাছ থেকে তারা আরো দাবী করলো যে, চাষীদের জমিতে উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ এবং গৃহপালিত পশুর যে সব বাচ্চা হবে তারও একাংশ তাদের দিতে হবে। এই দাবী মেটানোর ফলে চাষীদের নিজেদের জন্য যা অবশিষ্ট পড়ে থাকলো তাতে অতি কষ্টে তাদের সংসার চলতো।

৪. **মিশরে শ্রেণীর উদ্ভব।** খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় সহস্রাব্দে মিশরের অধিবাসীরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল: **শোষক শ্রেণী** এবং **শোষিত শ্রেণী**।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দাস শ্রেণীর।

দাস ব্যতিরেকে আর যারা শোষিত হতে লাগলো তারা হলো কৃষক শ্রেণী।

শোষক-দাসমালিকদের যে শ্রেণী তাতে ছিল শুধু সম্ভ্রান্ত মানুষেরাই। দাসমালিকেরা কোনো কাজ করতো না, তারা দাস এবং কৃষকদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করতো। এমন কি বাহ্যিক পোষাকআশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মিশরের বাকী অধিবাসীদের থেকে এরা দেখতে ছিল স্বতন্ত্র। দাসমালিকদের কাপড়চোপড় ছিল হালকা মিহি বস্ত্রে তৈরি; কোমরবন্ধে ঝুলতো তামার ছোরা, যার বাঁটে আবার সোনার নক্সা কাটা থাকতো। হাতে তারা সোনার বালা পরতো, বুকে ঝোলাতো সোনার হার। গাছগাছালি ভরা ছায়াচ্ছন্ন বাগানের মধ্যে নির্মিত বিশাল ধনাঢ্য

প্রাচীন মিশরে শ্রেণীসমূহ

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস	তাদের কী ছিল	শোষক ছিল কিংবা নিজেরা শোষিত হতো
দাসমালিক	জমিজমা, দাসদাসী, পশুসম্পদ, শ্রমের হাতিয়ার, সোনা	দাস এবং কৃষকদের মেহনতের ফসল ভোগ করতো
কৃষক	দু-এক টুকরো ভূমিখণ্ড, নিজেদের কাজকর্ম করার সামান্য দু-চারটে যন্ত্রপাতি (অর্থাৎ তাদের শ্রম-হাতিয়ার), অল্পসংখ্যক পশু	নিজেদের মেহনতে প্রাপ্ত ফসলের অংশ তুলে দিতে হতো মোড়লদের হাতে
দাস	কোনো কিছুতেই অধিকার ছিল না; নিজেরাও পর্যন্ত ছিল দাসমালিকদের সম্পত্তি	তাদের মেহনতে প্রাপ্ত সবকিছু ছিল দাসমালিকদের সম্পত্তি

গৃহে বাস করতো দাসমালিকেরা। কৌমপ্রধানরাই দাসমালিকদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হতো।

দাসমালিকভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল মিশরে। এই ব্যবস্থায় একটি শ্রেণীই — দাসমালিক দাসদের অধিকারী ছিল, শোষণ করতো তাদের এবং তাদের শ্রম ও জীবনের মূল্যে তাদের অর্জিত সমস্ত কিছুই ভোগ করতো নিজেরা।

১. শোষণ অর্থে তুমি কী বোঝো ব্যাখ্যা করো। কিছু লোক কর্তৃক কিছু লোকের শোষণ কেন সম্ভব হয়েছিল? ২. মিশরে প্রথমদিকে বন্দীদের কেন মেরে ফেলতো, আর কেনই-বা পরে খ্রী. পূ. ৪র্থ-৩য় সহস্রাব্দে তাদের আর না মেরে বাঁচিয়ে রাখা হতো? ৩. কৃষক ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? তাদের মধ্যে কী মিল ছিল? কাদের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল? উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করে দেখাও যে তোমার উত্তর সঠিক। ৪. গ্রন্থভুক্ত পঠিত বিষয়, তালিকা বা ছক এবং ছবির সাহায্য নিয়ে প্রাচীন মিশরে (ক) দাস, (খ) কৃষক ও (গ) দাসমালিকদের অবস্থা কেমন ছিল বলো। ৫. আদিম গোষ্ঠী সমাজের এবং দাসমালিকদের সমাজ—এই দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সম্বন্ধে যা জান, বলো।

§ ৮. প্রাচীন মিশরে রাষ্ট্রের উদ্ভব

মনে করতে চেষ্টা করো—গোত্রবদ্ধ গোষ্ঠীজীবন ধ্বংস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কৌমের মধ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছিল (§৫: ৪)।

১. মিশরে প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব। শোষক ও শোষিত শ্রেণী উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে তাদের জমি ছিনিয়ে নিত, তার বিরুদ্ধে চাষীরা রুখে দাঁড়াতো; নিজেদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে যা উপার্জিত হতো, তা তারা দিতে চাইতো না। যারা দাস ছিল তারা কী করে স্বাধীন হবে সেজন্য চেষ্টা করতো, দাসমালিকদের অধীনে তারা কাজ করতে চাইতো না। একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই শুধু সম্ভব হতো কৃষক ও দাসদের এই বিরুদ্ধতা দমন করা এবং দোষী হিসেবে তাদের অভিযুক্ত করা।

কৌমপ্রধানদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতো দাসমালিকরা। প্রচুর ধনসম্পত্তি সঞ্চয়ের ফলে সর্দারদের পক্ষে সম্ভব ছিল প্রচুর প্রহরী এবং পুরো একটা সেনাদল জোগাড় করা। প্রহরী এবং সৈন্যদের কাজ ছিল পলাতক দাসদের পাকড়াও করে ধরে আনা, দাসমালিকদের ক্ষেতখামার, পশুপাল ও ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়া। বিদ্রোহী দাস ও কৃষকদের বেত মারা হতো, কয়েদে পুরে অত্যাচার করা হতো এবং হত্যা করা হতো।

প্রহরী ও সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্দারদের ক্ষমতাও বেড়ে যেত। তখন তারা কৌমের মধ্যে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সর্বেসর্বা ব্যক্তি হয়ে যেত এবং কৌমের যাবতীয় কর্ম নিজেই পালন করতো। এই সর্দাররাই পরে রাজা হিসেবে দেখা দিলো।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দে মিশরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো: সৈন্যদল, প্রহরী, জল্লাদ আর কয়েদখানা ইত্যাদি ব্যবস্থা পত্তন করে রাজাদের শাসন চালু হলো।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে তার সহায়তায় দাসমালিকরা তাদের শোষিত কৃষক ও দাস শ্রেণীর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারলো।

২. ফারাওনদের অধীনে মিশরের ঐক্য ও সংহতি লাভ। প্রথমদিকে মিশরে প্রায় চল্লিশটি ছোটো ছোটো রাষ্ট্র ছিল। এই সব রাজ্যের রাজারা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। যুদ্ধে জয়ী রাজা পরাজিত রাজার রাজ্য দখল করে তা নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতো। এধরনের রাজাদেরই একজন মিশরের সমগ্র উত্তরাঞ্চল — নীল নদের ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং অন্য একজন রাজা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল — নীল নদের বিস্তীর্ণ উপত্যকা ধীরে ধীরে জয় করে নিলো।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ অব্দে দক্ষিণ মিশরের রাজা যুদ্ধ করে উত্তরাঞ্চলীয় রাজার রাজ্য জয় করে নিলো। এসব যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদাই করে লিখে রাখা হয়েছে। (দ্র. ৫৯ পৃষ্ঠায় ছবি এবং ১০৮ পৃষ্ঠায় সারণী।) এভাবে

এই প্রাচীন মিশরীয় চিত্রটিতে কী বলা হচ্ছে? (খ্রী. পূ. প্রায় ৩ হাজার বছর আগে পাথরখণ্ড খোদাই করে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।) প্রস্তরখণ্ডের মধ্যিখানে — একজন যোদ্ধা বিজিতকে দমন করছে; যোদ্ধার মাথায় পরিহিত দক্ষিণ মিশরীয় সাম্রাজ্যের বোতলাকৃতি রাজমুকুট দেখে মনে হচ্ছে ব্যক্তিটি সম্রাট। ঈগলপাখির রূপ নিয়ে দেবতা গোর* একটা দড়ি ধরে আছে, দড়ির সাথে বাঁধা একটা মুণ্ডু (মাথাটা কোনো বন্দী দাসের): মিশরে দাসদের পশুর পাল মনে করা হতো বলে মাথা হিসাব করে তাদের গণনা করা হতো। যার উপরে ঈগল বসে আছে সেই শস্যগুচ্ছের প্রত্যেকটি এক সহস্র বন্দী দাসের প্রতীক। নিচে — শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে। বামদিকে — পাদুকা বহনকারী ভৃত্য। উপরে — গরুর শিং মাথায় দুই দেবীমূর্তির ছবি। **দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের মহাবিক্রম কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী? (সম্রাটের মূর্তির বিরাটাকার দেহের তুলনায় অন্য লোকদের ছোটোখাটো দেহের গুরুত্ব চিন্তা করে দেখ।)**

মিশরে একটি একক বৃহৎ রাষ্ট্রের পত্তন হলো, নীল নদের প্রপাত-এলাকা থেকে তা বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। এই রাষ্ট্রের রাজধানী হলো **মেম্ফিস্**।

মিশরী সম্রাটদের বলা হতো **ফারাওন**। অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল তারা, সমগ্র মিশরের জল-স্থল এবং অধিবাসীদের অধীশ্বর। ফারাওনের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য পেত তার সন্তান কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়পরিজন।

৩. পররাজ্যগ্রাসী মিশরী সৈন্যের যুদ্ধাভিযান। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২৮০০ অব্দে ফারাওন **জোসের-য়ের** সময়ে মিশর সাম্রাজ্য **সবচেয়ে** শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নীল নদের প্রপাতের দক্ষিণে বিস্তৃত **নুবিয়া** এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের পূর্বে **সিনাই উপদ্বীপে** মিশরী সৈন্য অভিযান চালায়। মিশরী সেনাপতির মুখ দিয়ে এরকম পররাজ্যগ্রাসী অভিযানের কথা বলা হয়েছে এভাবে:

* ইংরেজিতে এই মিশরীয় দেবতাকে লেখা হয় Horus; এটি আকাশের দেবতা। — অনু.

বিজয়ীর বেশে ফিরলো বাহিনী:
প্রতিবেশী দেশ ছিন্নভিন্ন —
আঙুরের ক্ষেত ফুলের বাগান কেটে খানখান,
বাড়িঘর পাড়া জ্বলে দাউদাউ,
লক্ষ লোকের ঝরিয়েছে খুন,
বন্দী এনেছে শ'য়ে শ'য়ে লাখ।
করে প্রশংসা সম্রাট মোরে শুনে সে কাহিনী।

(যুদ্ধাভিযানে কী কী লাভ করা হয়েছে তার বর্ণনা ভালো করে লক্ষ্য করো।)

৪. **পিরামিড নির্মাণ।** ফারাওন জোসের এবং তৎপরবর্তী ফারাওনরা **পিরামিড** নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি বিশালাকার **সমাধিমন্দির।** এখানে ফারাওনদের মৃতদেহ কবরস্থ করে রাখা হতো।

সর্বাধিক বিশালাকার পিরামিডটি তৈরি করা হয়েছিল ফারাওন **খেওপ্‌স্‌-য়ের*** জন্য খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২৬০০ অব্দে। তার উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটার। (কল্পনা করতে চেষ্টা করো, ক'তলা বাড়ির সমান উঁচু এই পিরামিড হতে পারে।) পিরামিডের পরিধি এত বড়ো যে এক চক্কর দিয়ে ঘুরে এলে প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটা হয়ে যায়। তৈরি করতে লেগেছিল ২৩ লক্ষ বড়ো বড়ো পাথরের ব্লক বা চাঙড়। এই ব্লকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ভারি যেগুলো ছিল তাদের প্রত্যেকটার ওজন আড়াই টন করে। পিরামিডের ভিতরে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ, সেই সংকীর্ণ পথ চলে গেছে পিরামিডের একেবারে গভীরে যেখানে ছোট্টো একটা কক্ষে ফারাওনের মৃতদেহ রক্ষিত আছে।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক **হেরোদোতোস্‌**** পিরামিড নির্মাণের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সারা মিশর খুঁজে প্রহরীরা পিরামিড তৈরির জন্য চাষী ও দাস ধরে নিয়ে আসতো। একসঙ্গে ১ লক্ষ লোক পিরামিড তৈরিতে কাজ করেছে। এক দল হয়তো পাহাড় থেকে পাথরের চাঁই ভেঙেছে, আরেক দল হয়তো তা টেনে টেনে নিয়ে গেছে নির্মাণক্ষেত্রে। তৃতীয় দল আবার সেই সব বিশাল প্রস্তরখণ্ড কেটে-ঘষে-মেজে নির্দিষ্ট আকার দিয়েছে, নির্দিষ্ট স্থানে সেগুলো পরপর সাজিয়ে রেখেছে। তত্ত্বাবধায়করা বেত এবং লাঠি হাতে মারধোর করে দাবড়ে নিয়ে বেড়াতো মানুষদের। (দ্র. রঙিন ছবি ৭)

* বৃহত্তম খেওপ্‌স্‌ (Cheops) পিরামিডের আরেকটি নামও খুব প্রচলিত। একে কুফু পিরামিডও (অর্থাৎ ফারাওন কুফু নির্মিত পিরামিড) বলা হয়। — অনু.

** পিরামিড নির্মাণের সময়ে হেরোদোতোস্‌ (ইংরেজিতে Herodotus লেখা হয়) অবশ্য ছিলেন না; ইনি জন্মেছেন অনেক পরে (আনুমানিক খ্রী. পূ. ৪৮৫-৪২৫)। রোমক বাগ্মী ও দার্শনিক এ'কে 'ইতিহাসের জনক' বলে অভিহিত করেছেন। — অনু.
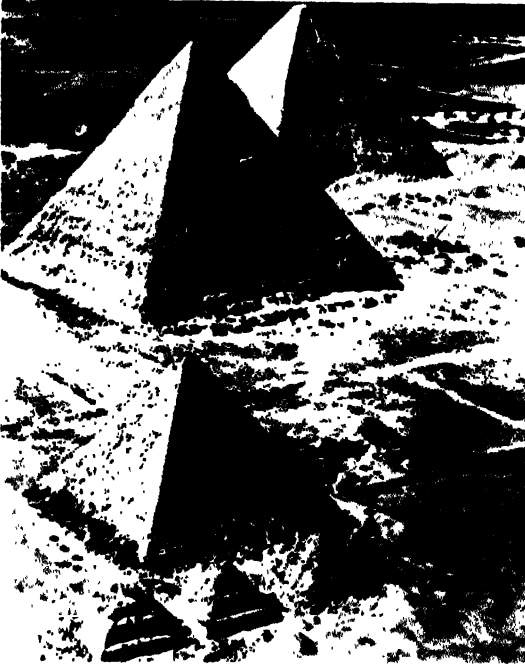
১. মিশরীয় রাজাদের পিরামিড। (বিমান থেকে তোলা আলোকচিত্র।) দূরের পিরামিডটি বৃহত্তম—ফারাওন খেওপ্‌স্‌ নির্মিত পিরামিড। প্রাচীন কালে এই পিরামিডগুলো 'পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের' একটি বলে গণ্য হতো। রাজপরিবারের আত্মীয়স্বজনদের সমাধিও পাশে দেখা যাচ্ছে। ২. স্ফিংক্সের মূর্তি। (আলোকচিত্র।) **স্ফিংক্সের নিচে দণ্ডায়মান লোকটির শারীরিক ক্ষুদ্রত্ব দেখে অন্তত মূর্তিটার উচ্চতা ও বিশালত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবে।**

পিরামিড নির্মাণ এবং পাথর-খাদ থেকে পিরামিড পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ চলেছিল ৩০ বৎসর ধরে। চাষীরা যতদিন ধরে পিরামিড তৈরি করতো ততদিনে তাদের চাষবাসের অল্প জমিটুকু ঢেকে যেত লম্বা লম্বা আগাছার জঙ্গলে, যে খাল থেকে জমিতে জল দিতো সেই খাল ততদিনে মরুভূমির বালি পড়ে পড়ে প্রায় ভরাট হয়ে যেত। পিরামিড নির্মাণে নিয়োজিত মানুষদের যদিও তিন মাস অন্তর অন্তর বদল করা হতো, তবু তারই মধ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি ও মারধোর-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যেত হাজার হাজার মানুষ।

পিরামিডের অনতিদূরেই সম্পূর্ণ একটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল স্ফিংক্স। বিশালাকার এই স্ফিংক্সের দেহ সিংহের এবং মাথা মানুষের। ফারাওনদেরই কোনো একজনকে স্ফিংক্সরূপে কল্পনা করে এই মূর্তিটি গড়া হয়েছিল। স্ফিংক্সের
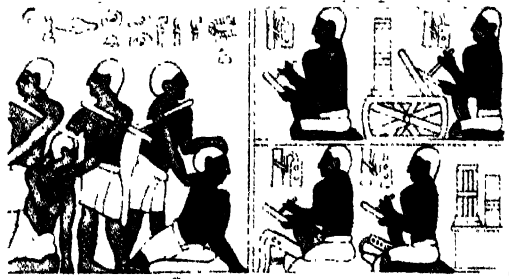
১. প্রাচীন মিশরীয় ফারাওন মূর্তি। মাথায় শিরস্ত্রাণ। ২. বেত্রাঘাতে শাস্তিদান। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) ৩. কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হচ্ছে। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) এই ছবিটির ব্যাখ্যা বইয়ের মধ্যে খুঁজে দেখ।

উচ্চতা ২০ মিটারেরও বেশি। দানবাকার এই প্রস্তরমূর্তি দেখতে এত ভীষণ দর্শন যে মিশরের লোকেরা একে বলতো **'আতঙ্কের জনক'**।

চতুর্দিকে মরুভূমির মাঝখানে আজও পিরামিডগুলো ফারাওনদের সীমাহীন নিষ্ঠুর শক্তির নীরব সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

? ১. আদিম গোষ্ঠীসমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল নাকি? প্রাচীন মিশরেই-বা কেন তার উদ্ভব হলো? ২. দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কিনা ভেবে দেখ। থাকলে, তা কী? রাষ্ট্রের লক্ষণ কী কী? ৩. ফারাওনদের যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল? ৪. এখন থেকে কত হাজার বছর আগে মিশরে সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল? খেওপ্‌স্‌-এর পিরামিড কত শতাব্দী পূর্বে নির্মিত হয়েছিল? ১০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সারণীতে খেওপ্‌স্‌-পিরামিড নির্মাণের সময় খুঁজে দেখ। ৫. এই পরিচ্ছেদে (§ ৮) বর্ণিত ঘটনাপঞ্জীর সন-তারিখগুলোর মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য করো—কোন্‌ ঘটনা আগে ঘটেছে, কোন্‌টা তার পরে এবং কতখানি পরে?

§ ৯. মিশরে রাষ্ট্রের পরিচালনাব্যবস্থা ও শ্রেণীসংগ্রাম

১. 'বিদ্রোহীদের খতম করো', 'জোরদার করো তোমার উচ্চপদস্থদের'। দেশ শাসন করা যাতে সহজতর হয় সেজন্য মিশরকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে ফারাওন সম্ভ্রান্ত মানুষদের মধ্য থেকে প্রদেশগুলোর প্রশাসক নিযুক্ত করে দিলেন। এই প্রশাসকদের অধীনে থাকতো বহুসংখ্যক আমলা, প্রহরী এবং সৈন্য।

আমলাদের কাজ ছিল বিচার করা: যারা দাসমালিকদের প্রাণ নাশ করতে কিংবা তাদের ধনসম্পত্তির উপর হামলা চালাতে চেষ্টা করতো এবং ফারাওনের নির্দেশ অমান্য করতো, তাদের বিচার। নিষ্ঠুর, কড়া হুকুম ছিল ফারাওনের: 'বিদ্রোহীদের একেবারে খতম করো, হত্যা করো ওদের, শেষ করো ওদের ঘনিষ্ঠ লোকজনদেরও, অন্যদের স্মৃতি থেকে পর্যন্ত ওদের মুছে দাও'; 'সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু হলো — গরিবের দল'। নিজেদের নিষ্ঠুরতা নিয়ে বড়ো অহংকার ছিল আমলাদের: 'লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আমি সঞ্চার করি ত্রাস। কয়েদীদের ভেঙে চুরমার করে দিই, বিদ্রোহীদের বাধ্য করি তাদের ভুল স্বীকার করতে', তার মানে ভয়াবহ যন্ত্রণা দিয়ে সে দোষ কবুল করাতো অন্যদের।

রাজ্যশাসনে সহায়তাদানের জন্য ফারাওন সম্ভ্রান্ত মানুষ ও আমলাদের দান করতো জমিজমা, সোনা, পশুসম্পদ এবং প্রচুর দাস। পুত্রকে উপদেশ দিয়ে লেখা চিঠি আছে ফারাওনের: 'জোরদার করো তোমার উচ্চপদস্থদের, এগিয়ে নিয়ে যাও তোমার সেনাদের, তাদের দান করো ভূ-সম্পত্তি, দান করো পশুর পাল।'

২. খাজনা আদায়; বাধ্যতামূলক কাজকর্মে কৃষকদের নিয়োগ। প্রত্যেক চাষীর কি পরিমাণ জমিজমা ও পশু আছে, কত ফলের গাছ আছে আমলারা লিখিতভাবে তার হিসাব রাখতো। এই সমস্ত কিছুর জন্য চাষীকে খাজনা দিতে বাধ্য করা হতো; খাজনা বা কর দিতে হতো শস্যে কিংবা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। কৃষকদের নিকট হতে সংগৃহীত শস্যে রাজার গোলা বা শস্যভাণ্ডার পূর্ণ থাকতো; এরকম গোলা সমগ্র মিশরময় ছড়িয়ে ছিল। ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য যা সংগৃহীত হতো তা উচ্চপদস্থদের দেয়া হতো পারিতোষিক হিসেবে, এবং আমলা, প্রহরী ও সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য।

কোনো সময় যদি ফসল কম হতো এবং খাজনা দেবার মতো শস্য যদি না থাকতো, তা হলে চাষীরা সর্বাধিক দুর্ভোগ পোহাতো। আমলাদের কথাতে পর্যন্ত তার পরিচয় মেলে: 'বেচারা চাষীদের কী কষ্ট! মাঠে খাজনা আদায়ের জন্য গোমস্তা এসে হাজির। সে ফসল মাপছে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। তাদের হাতে লাঠিসোঁটা আর খেজুর গাছের ডাল। তারা বলছে: 'ফসল দে।' কিন্তু ফসল তো নেই; তারা চাষীদের মারধোর করছে। তাকে বেঁধেছে ওরা, বেঁধেছে ওর বৌ আর ছেলেমেয়েগুলোকেও।' 'সিংহের মুখোমুখি হলে লোকে
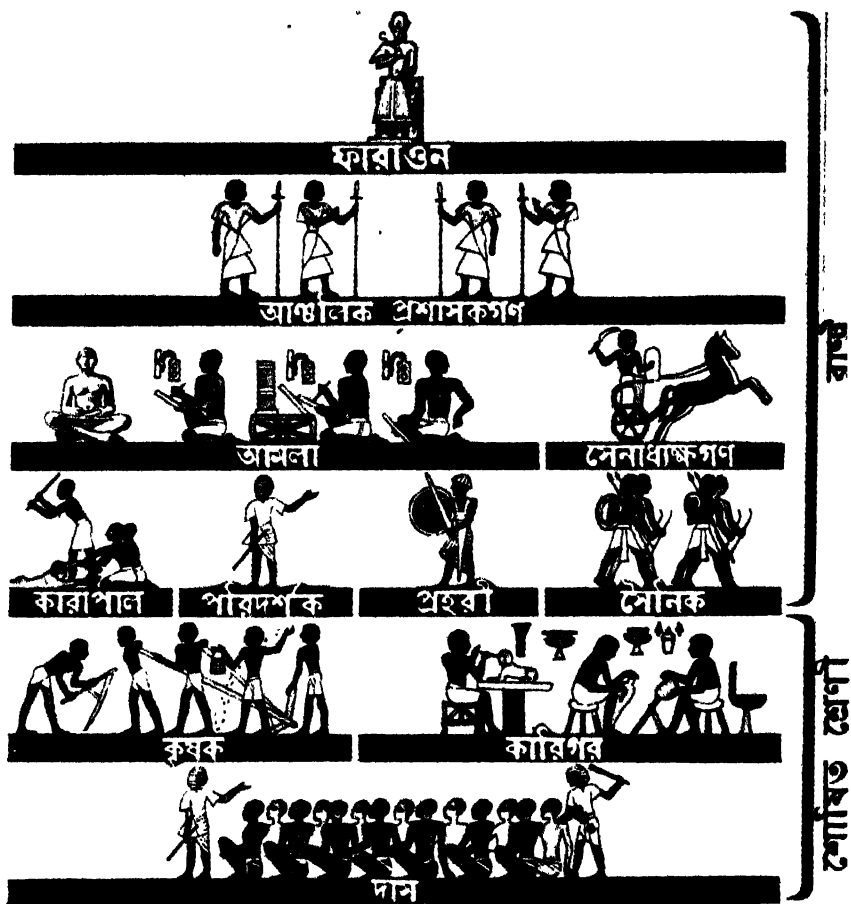
মিশরীয় রাষ্ট্র — দাসমালিকদের শাসনের প্রধান সমর্থকশক্তি।

মিশরীয় রাষ্ট্র যাদের বিন্দুতম প্রতিবাদও দমন করেছে সেই শোষিতের দল।

যেমন ভয়ে আড়ষ্ট, স্থির হয়ে যায়, চাষীরাও তেমনি স্থির, নির্বাক হয়ে যায়।' (দ্র. রঙিন ছবি ৬)

খাজনা দেওয়া ছাড়াও কৃষকদের দিয়ে **বাধ্যতামূলক কাজ*** করিয়ে নেওয়া হতো। বাধ্যতামূলক কর্মের অন্তর্গত ছিল: ভেঙে যাওয়া বাঁধ পুনর্নির্মাণ, খাল খনন, ফারাওন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের জন্য পাথর সংগ্রহ করা।

* **বাধ্যতামূলক কাজ** হলো তাই যে কাজে কেউ অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

৩. কারিগরদের অবস্থা। ফারাওন এবং অন্যান্য ধনাঢ্য দাসমালিকদের মালিকানাধীনে যে সব কর্মশালা ছিল সেখানেই অধিকসংখ্যক কারিগর কাজ করতো। খবরদারির জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকতো খুঁতখুঁতে ও কড়া স্বভাবের পরিদর্শকেরা।

কারিগর বা হস্তশিল্পীদের জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন জনৈক মিশরী বর্ণনা এরকম: 'তাঁতীকে সারাটা দিন তার তাঁতের সামনে কী কষ্ট করেই না বসে থেকে কাজ করতে হতো, নিঃশ্বাস নিতে হতো শণের আঁশ মেশানো ধুলোবালিতেই, নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দিতো পরিদর্শককে যাতে সে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তাকে বাইরে গিয়ে উন্মুক্ত আলো-হাওয়ায় গিয়ে একটু দাঁড়াবার অনুমতি দেয়। সারা দিনে যতটুকু কাজ হওয়ার কথা তার কম হলেই তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতো; চাষীদের চেয়েও বেশি পরিশ্রম হতো ছুতোরদের। মানুষের হাতের পক্ষে যতখানি পরিশ্রম সম্ভব তার চেয়েও বেশি না খেটে তার উপায় ছিল না। এমন কি রাত্রেও ছুতোরকে কাজ করতে হতো। রাজমিস্ত্রী যারা বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণে নিয়োজিত থাকতো তাদের কপালে একটুকরো রুটি পর্যন্ত জুটতো না, আর তাদের পোষাক — জীর্ণ শতচ্ছিন্ন একটুকু বস্ত্রখণ্ড। তাদের মারধোর করা হতো, রেহাই পেত না তাদের ছেলেপিলেরাও।' 'মার কাকে বলে সে আমি দেখেছি বটে, মার আমি দেখেছি বটে' — এই মর্মন্তুদ সত্যভাষণ থাকতো ঐ প্রাচীন মিশরী বর্ণনার মধ্যে।

৪. দরিদ্র ও দাসদের অভ্যুত্থান। প্রাচীন মিশরের কৃষক, কারিগর ও দাসরা কি ফারাওন ও দাসমালিকদের এই অসহ অত্যাচারের জোয়াল চিরটাকাল মুখ বুজে সহ্য করে গেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিশরে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। ঘটনাটি **খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের** কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। (নিম্নোদ্ধৃত দলিলটি — 'দেশের মহাদুর্বিপাক বর্ণন' থেকে — মন দিয়ে পড়ো এবং সে সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর জবাব দাও।)

প্রাপ্ত নথিতে কোথাও বলা হয় নি কী পরিণতি ঘটেছিল দাস ও দরিদ্র-অভ্যুত্থানের; তবে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে দাসমালিকেরা অভ্যুত্থান দমন ক'রে ফারাওনদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল।

'দেশের মহাদুর্বিপাক বর্ণন' থেকে:

'বর্ণনের' মধ্যে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজো: কারা কাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল মিশরে? কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেয়েছিল বিদ্রোহীরা? 'মহাদুর্বিপাক বর্ণন'-লেখকের সহানুভূতি কাদের দিকে? দলিলে ব্যবহৃত বাক্যাদি ব্যবহার করে তোমার উত্তর সপ্রমাণ করো।

ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত রাজার শাসনের বিরুদ্ধে লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল।
রাজধানী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক ঘণ্টায়। গরিবের দল ছিনিয়ে নিল রাজাকে।

প্রশাসকেরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আমলারা প্রাণে মারা পড়লো। হিসাবের খাতা যা দেখে খাজনা আদায় করা হতো সে সব ধ্বংস করে ফেলা হলো।

গরিবের দল বিশাল সব প্রাসাদগুলোয় ঢুকে পড়লো।

যারা পাৎলা হালকা কাপড়ে সুবেশিত ছিল তাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। জমকাল পোষাকে অভ্যস্ত দাসমালিকরা শতচ্ছিন্ন কাপড়চোপড় পরে আছে। ধনসম্পদের অধিকারী যারা ছিল তারা নিঃস্ব হয়ে গেল।

যাদের এক জোড়া বলদ পর্যন্ত ছিল না, তারা হয়ে গেল এক পাল পশুর মালিক। যারা শস্য আদায় করেছিল এককালে, তারা এখন তা নিজে থেকেই দিয়ে দিতে লাগলো। দাসেরা নিজেরাই আবার অন্যান্য দাসদের মালিক হয়ে দাঁড়ালো।

আমার প্রাণে এজন্য শান্তি নেই। হায়, হায়, এ মহাদুর্দিনে আমার এ যে কী দুঃখ!

? ১. মিশরীয় রাষ্ট্রে আমলাদের কাজ কী ছিল? ২. রাজা কেন গরিবদেরই সবচেয়ে বড়ো শত্রু মনে করতো? ৩. প্রাচীন মিশরে চাষী ও কারিগরদের অবস্থা বর্ণনা করো। ৪. প্রদত্ত দলিলের ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের অভ্যুত্থানে কী কী ঘটেছিল বলো। ৫. কোন্ শতকে মিশরে অভ্যুত্থান হয়েছিল? উত্তর দিতে কষ্ট হলে এসো বরং একসঙ্গে মিলে হিসাব করে দেখা যাক। অভ্যুত্থানের সময় থেকে খ্রীষ্টাব্দ চালু হওয়া পর্যন্ত মোট ১৭টি শতাব্দী এবং ১৮শ শতকের অর্ধাংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটা ঘটেছিল। মোটামুটি ক' শতাব্দী পূর্বে অভ্যুত্থান হয়েছিল? কোন্‌টা আগে হয়েছিল — অভ্যুত্থান না খেওপ্‌স্-পিরামিড তৈরি? এবং কত বছর আগে? ৬. ফারাওনের কাছে সংবাদ পেঁছেছিল যে, মিশরের দূরবর্তী অঞ্চলে কৃষক ও দাসরা বিদ্রোহ করেছে। তার পরে কী ঘটেছিল?

§ ১০. মিশরীয় রাষ্ট্রের অমিতবিক্রম ও পতন

(দ্র. মানচিত্র ২ এবং ৬৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র)

মনে করতে চেষ্টা করো — মিশরে দাসমালিকদের শাসনামলে সমাজে কোন কোন শ্রেণী ছিল (§ ৭:৪)।

১. খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরের অর্থনৈতিক বিকাশ। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিশরীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করেছিল। মিশরে শ্রেণীর উদ্ভব ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জমিতে জলসেচ ও জলনিষ্কাশন সম্পৃক্ত নানান ধরনের ব্যাপক কাজকর্মে তারা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রতি বৎসর আমলারা হাজার হাজার দাস ও কৃষকদের ধরে এনে এ কাজে লাগিয়ে দিত। 'উঁচু জায়গার জমিজমায়' দূরের নদী থেকে জল নিয়ে যাবার জন্য দাস ও কৃষকরা খাল খনন করতো। নীল উপত্যকায় আবাদী জমির পরিমাণ রীতিমতো বেড়ে গিয়েছিল।

এশিয়া থেকে নিয়ে যাওয়া ঘোড়া এবং উটের প্রচলন ও লালনপালন শুরু হলো মিশরে। টিন গলিয়ে তামার সাথে মেশানোর কায়দা জেনে গেল কারিগরেরা। এই মিশ্র ধাতুর নাম দেয়া হলো **ব্রোঞ্জ**। তামা অপেক্ষা তা বেশি কঠিন ও টেকসই।

মিশরীয় রাষ্ট্রের নতুন রাজধানী **থিব্স্*** বিশাল ও সুন্দর শহররূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

২. মিশরীয় সৈন্যদলের শক্তিবৃদ্ধি। মিশরে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ফারাওন সৈন্যবাহিনীর আয়তন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছিল।

ফারাওনের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ ছিল পদাতিক বাহিনী, কৃষকদের নিয়ে এটি গঠিত। বল্লম, কুঠার, তরবারি এবং বিশালাকার ধনুর্বাণে সুসজ্জিত থাকতো তারা (দ্র. ৬৯ পৃষ্ঠার ছবি)। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে **রথী বাহিনী** গঠন করা হয়েছিল। রথীর কাজ ছিল **রথে** চড়ে যুদ্ধ করা। ঘোড়ায় টানা দু-চাকার খোলা গাড়িকে বলা হতো রথ। প্রত্যেক রথে দুজন যোদ্ধা (অর্থাৎ রথী) থাকতো: একজন ঘোড়া ছুটিয়ে রথ চালাতো, আর অন্যজন ধনুক দিয়ে তীর মারতো। যুদ্ধে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে যুদ্ধ করতে পারতো এবং যুদ্ধে পরাজিত পলাতক শত্রুসৈন্যের পিছু ধাওয়া করতো।

৩. ফারাওনদের যুদ্ধাভিযান। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় **১৫০০ অব্দে** ফারাওন **৩য় তুৎমস্** এশিয়ায় যুদ্ধাভিযান করে। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলার পর **প্যালেস্টাইন** এবং **সিরিয়া** ৩য় তুৎমস্ এবং তার পরবর্তী ফারাওনদের দখলে চলে আসে। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। উত্তরে **ইউফ্রেতিস** নদী পর্যন্ত মিশর রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। আর দক্ষিণে স্বর্ণখনি সমৃদ্ধ নুবিয়াও জয় করে নেয় ফারাওনরা।

ফারাওনরা বিজিত দেশ নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করতো। সোনাদানা আর গজদন্তে ভরা ভারি ভারি বোঝা নিয়ে উটের ক্যারাভ্যান সারি সারি চলে যেত মিশরের দিকে। ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরতো বিজয়ী মিশরীয় সৈন্য। এশিয়া থেকে বহু জাতের মূল্যবান কাঠ জাহাজে করে নিয়ে যেত। মরুভূমির বুকে সারে সারে যুদ্ধবন্দীর দল ভগ্নহৃদয়ে কোনো রকমে দেহটা টেনে নিয়ে পথ চলছে, দেখা যেত।

* এই থিব্স্ শহরকে প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নগর থিব্স্ সাথে যেন গুলিয়ে ফেলো না। **নীল** নদের তীরবর্তী শহর **ছিল** মিশরীয় 'থিব্স্', আজ তার নামটি পর্যন্ত অবলুপ্ত, ঐ জায়গায় এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন নামের দুটি গ্রাম। আর গ্রীসের থিব্স্ বর্তমানে একটি আধুনিক শহর 'থিভাই'। — অনু.
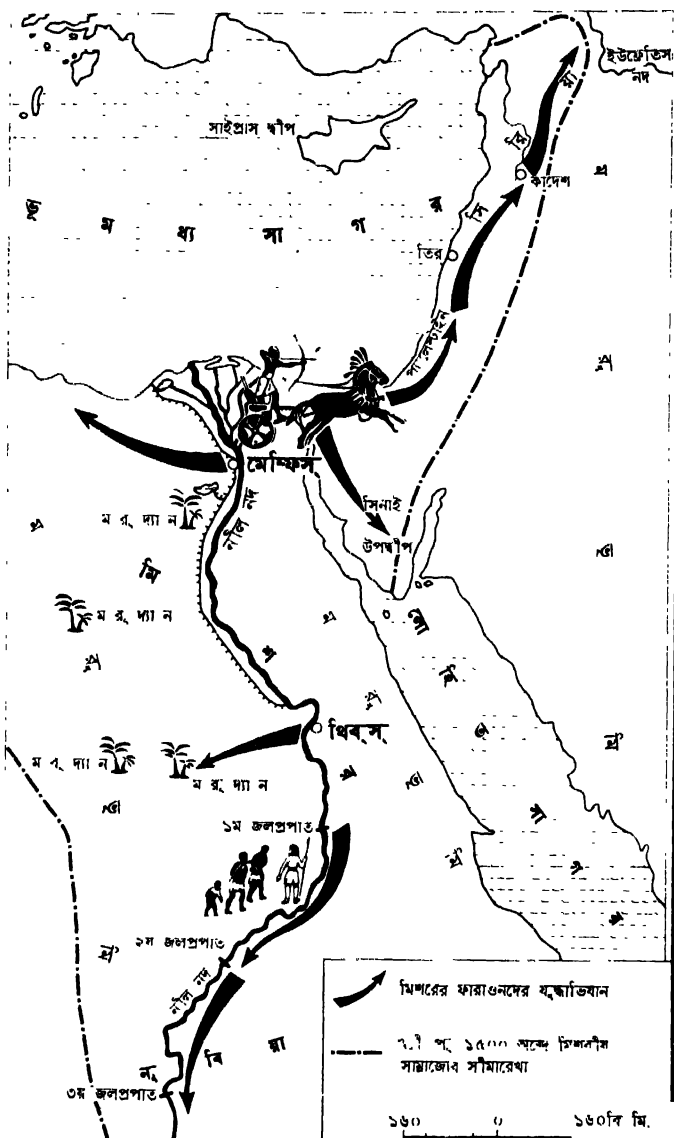
১. প্রাচীন মিশরীয় রাজ্যের যুদ্ধাভিযান। **মানচিত্রে খুঁজে দেখ — প্রাচীন মিশরের ভৌগোলিক সীমা, যুদ্ধাভিযানের গতিপথ এবং বিস্তৃতলাভের পর রাজ্যের সীমা।** ২. মিশরীদের সিরিয়া আক্রমণ। তারা দুর্গ ভাঙতে চেষ্টা করছে। (প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরে রক্ষিত চিত্র)। শকটের উপরে তীরন্দাজরূপে যিনি দণ্ডায়মান তিনি ফারাওন। তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গরক্ষকদের পড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। চিত্রের নিম্নাংশে: শত্রুপক্ষদের বন্দী করা হচ্ছে, তার মধ্যে নারী এবং শিশুও
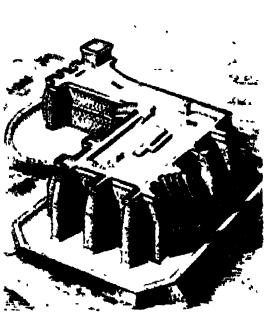
রয়েছে। **ভেবে বলো তো, চিত্রকর ছবির মধ্যে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন আকারে কেন এ'কেছেন?** ৩. মিশরীয় পদাতিক বাহিনী। (প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরের দেয়ালগাত্রে অঙ্কিত চিত্র)। **মিশরীয় পদাতিক সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র কী ছিল?** ৪. নুবিয়ায় প্রাচীন মিশরীয় দুর্গ। (পুনর্নির্মিত আদল।) ৫. ফারাওনের জয়গানে মুখরিত জনতার ছবি। **চিত্রে অঙ্কিত মুখগুলোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করো। ফারাওন বন্দনাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের মানুষ এ'কে চিত্রকর কী বোঝাতে চেয়েছেন?**

৪. খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থা। যুদ্ধে দখলকৃত ও লুণ্ঠিত সমস্ত কিছুর একটি বড়ো অংশ নিজেদের জন্য রেখে দিত ফারাওন এবং মিশরের অন্যান্য দাসমালিকেরা। লোকে বলতো যে, মিশরে যে পরিমাণ বালুকণা আছে, সে পরিমাণ সোনা আছে ফারাওনের।

দাসের সংখ্যাও মিশরে প্রচুর বেড়ে গেল। তা তো হবেই, কেন না এশিয়ায় পরিচালিত অভিযানগুলোর একটাতে একবার এক লক্ষেরও বেশি যুদ্ধবন্দী ধরে আনা হলো।

নিঃস্ব দরিদ্র মিশরীদেরও দাস করে নেওয়া হতো। প্রায়ই এমন ঘটতো যে, প্রয়োজনের তাগিদে বড়ো লোকদের কাছ থেকে শস্য বা তামার বাট ধার নিতে বাধ্য হতো চাষী ও কারিগররা, পয়সা হিসেবে এর প্রচলন ছিল মিশরে। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ঋণী ব্যক্তি ধার পরিশোধ করতে না পারলে তখন বড়ো লোক মহাজন নালিশ জানাতে আমলার কাছে যেত। আমলা তখন ঋণশোধ হিসেবে হয় ঋণী লোককে, নয় তার ছেলেপিলেকে দাস হিসেবে বিক্রি করতো।

পাহাড় থেকে পাথর ভাঙার কাজে, খনিতে, প্রাসাদ তৈরি, খাল খনন এবং দাসমালিকদের ক্ষেতেখামারে দাসদের খাটানো হতো।

খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পুরোপুরি এবং পাকাপোক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

৫. মিশরীয় রাষ্ট্রের পতন। ফারাওনদের পররাজ্যলোভী যুদ্ধগুলো মিশরীয় দাসমালিকদের ধনসম্পদে বলীয়ান করে তুলে মিশরকে হীনবল করে তুলেছিল।

সৈন্যদলে জোরপূর্বক সংগৃহীত মিশরীয় কৃষকগণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, জলাময় নুবিয়ার স্যাঁতসেঁতে জলো আবহাওয়ায় হাড়কাঁপানি জ্বরে প্রাণত্যাগ করেছে, মারা পড়েছে মরুভূমির ভয়াবহ প্রচণ্ড গরমে। সৈন্যদের জমিজমা চাষবাস করে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন কেউ ছিল না। কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আহত অসুস্থ হওয়ার জন্য সৈন্যদল থেকে খারিজ হয়ে কেউ যদি তার গ্রামে ফিরে আসতো তো প্রায়ই দেখতো যে, তার ধনসম্পত্তি যেটুকু ছিল সবই লুণ্ঠিত হয়ে গেছে, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদেরও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দাস হিসেবে।

তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ যে ফারাওন ও দাসমালিকরা, তাদের প্রতি দরিদ্র ও দাসদের ঘৃণার অন্ত ছিল না। মিশরের বহু স্থানে দরিদ্র ও দাসদের বিদ্রোহ হতে লাগলো। দখলদারদের বিরুদ্ধে দখলকৃত জনগণের যুদ্ধ আর কখনো থামে নি। মিশরীয় সেনা যখনই দখলকৃত দেশের বাইরে গেছে, তখনই শুরু হয়েছে বিদ্রোহী-অভ্যুত্থান।

বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে ভাড়াটে সৈন্য ভাড়া করে নিয়ে আসতো ফারাওনরা। কৃষক ও দাসদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করতো তারা। তবু অন্য

কোনো রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে এই সব ভাড়াটে সৈন্যদের একটুও বিশ্বাস করা যেত না, কেন না শত্রুপক্ষের নিকট হতে বেশি অর্থ লাভের অঙ্গীকার পেলেই তারা ফারাওনকে ছেড়ে তার বিপরীত পক্ষে গিয়ে যোগ দিত।

প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া কৃষক সমাজ, যেখানে-সেখানে দরিদ্র, দাস ও অবদমিত জনগণের বিদ্রোহ মিশরীয় রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলেছিল। অবশেষে একসময়ে এশিয়ায় বিজিত দেশ ও নুবিয়া তার হাতছাড়া হয়ে গেল, এবং খ্রীষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দের শুরুতে পার্শ্ববর্তী দেশের আক্রমণ থেকে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

? ১. মিশরীয় রাষ্ট্রের আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে লাভ হতো কাদের? সেই লাভের ধরন কী ছিল? যুদ্ধে কারা কী কষ্ট ভোগ করতো? ২. খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশের প্রমাণ কী? রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে এহেন শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারতো কিনা ভেবে দেখ। ৩. মিশরীয় সৈন্যবাহিনী ও তাদের পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধে বলো। ৪. মিশরীয় রাষ্ট্র হীনবল হয়ে যাওয়ার কারণ কী? ৫. মিশরীয় রাষ্ট্রের পত্তন থেকে ৩য় তুৎমসের যুদ্ধাভিযান পর্যন্ত মোট কত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল? এবং ৩য় তুৎমসের যুদ্ধাভিযানের পর বর্তমান কাল অবধি মোটামুটি কত হাজার বছর কেটে গেছে?

§ ১১. প্রাচীন মিশরে ধর্ম

মনে করতে চেষ্টা করো — মানুষের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব কেন হয়েছিল (§ ৩: ২); কৃষিকর্ম শুরু হওয়ার পরে ধর্মবিশ্বাস কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল (§ ৫: ৫)।

১. প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নতিস্বীকার। প্রাচীন মিশরীরা বিশ্বাস করতো যে, প্রকৃতিকে দেব-দেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করে থাকেন।

সূর্যের যিনি দেবতা সেই রা 'দেব-দেবীদের রাজা'; ফারাওন যেমন সব লোকজনকে পরিচালনা করে থাকে, রা তেমনি পরিচালনা করেন দেব-দেবীদের। দিন ও রাত্রির রহস্য না জানার ফলে মিশরীরা কল্পনা করতো যে, প্রত্যেক দিন সূর্যদের রা সোনার নৌকোয় চড়ে আকাশ পাড়ি দেন এবং সন্ধ্যাকালে মরুভূমির ওপারে চলে যান।

মিশরীরা কখনো নীল নদের উৎস পর্যন্ত যায় নি, তাই জানতো না কোন্ জায়গা থেকে নীল নদ প্রবাহিত হচ্ছে। তারা মনে করতো, নীল নদের দেবতা এক মহাকুম্ভ থেকে জল ঢেলেই চলেছেন, আর বন্যা হয় তখনই যখন জল ঢালার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। তারা দেবতা নীলের নিকট প্রার্থনা জানাতো যাতে নীল নদ তাদের শস্যক্ষেত্রে চলে আসেন, দেবতা নীলের যশোগান গাইতো এই আশায় যে দেবতা তা শুনবেন এবং তাদের জীবন রক্ষা করবেন। (এই পরিচ্ছেদের শেষে দেবতা নীলের যশোগান অনুবাদ করে দেওয়া হলো।)
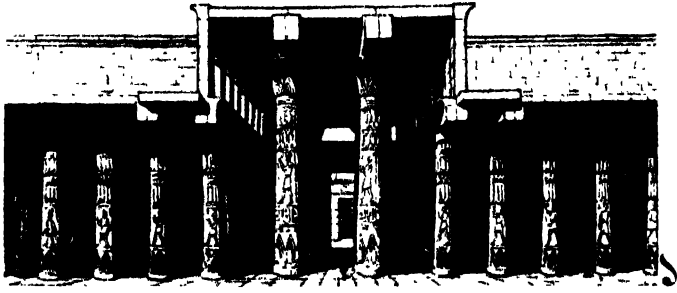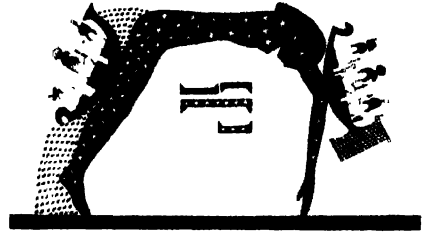
১. থিব্‌সের প্রধান ধর্মমন্দিরের স্তম্ভকক্ষ। (পুনঃকল্পিত আদল।) বিশালাকার স্তম্ভগুলো ছাদ ধরে রেখেছে। স্তম্ভগুলোর ব্যাস এত বিরাট যে একেকটির উপরে অন্তত ১০০ জন লোকের দাঁড়াবার জায়গা হওয়া সম্ভব। স্তম্ভ এবং তদুপরি খোদিত মনুষ্যমূর্তির সাথে জীবন্ত মানুষের আকারগত প্রতিতুলনা করো। ২. প্রাচীন মিশরের অধিবাসীদের কল্পনায় দেব-দেবী দেখতে এরকম ছিল। (সমাধির মধ্যে এ ছবিটি খুঁজে পাওয়া গেছে।) মিশরীদের চারপাশে ঘিরে থাকা প্রকৃতি কীভাবে এসব দেবমূর্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩. প্রাচীন মিশরীয় কল্পনায় আকাশ ও সূর্য। (প্রাচীন চিত্র।) সূর্যের দেবতা রা আকাশে দিগন্ত পাড়ি দিচ্ছে। ভাবতে চেষ্টা করো, কেন মিশরীরা সূর্যকে এভাবে কল্পনা করেছিল।

যে কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকেই মিশরীরা নির্দিষ্ট কোনো না কোনো দেব-দেবীর বহিঃপ্রকাশ মনে করতো। কোনো না কোনো পশুর মস্তক দিয়ে তারা বিভিন্ন দেব-দেবী কল্পনা করে সেভাবে তাদের আঁকতো।

তাদের কল্পনায় জলের দেবতার মাথা ছিল কুমিরের, সূর্যদেবের মাথা ছিল বাজপাখির। মিশরীরা সবচেয়ে ভয় পেত সিংহীর মাথাওয়ালা যুদ্ধের দেবীকে দেখে: মারাত্মক ব্যাধি যা থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব সেই প্লেগ নামক মহামারী রোগ নিয়ে আসতেন এই নিষ্ঠুরা দেবী।* (দ্র. ৭৬ পৃষ্ঠার ১ নং ছবি)

---

* চিন্তা করে দেখ, আমাদের দেশে কিন্তু আজও লোকজন এধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। কলেরা ও বসন্ত মহামারীর সাথে আমাদের দেশেও দেবীর নাম জড়িত। কলেরা বা ওলাউঠা রোগের জন্য ওলাবিবি এবং বসন্তের জন্য কল্পিত দেবী মা শীতলাকে মান্য করে এখনো প্রচুর লোক। — অনু.

২. পুনরুজ্জীবিত দেবতার কাহিনী। মিশরে প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে একনাগাড়ে ৫০ দিন ধরে মরুভূমি থেকে প্রচণ্ড গরম বাতাস প্রবাহিত হয় — **লু হাওয়া।** লু হাওয়ায় উড়ে আসে গরম অগ্নিতপ্ত বালি। অসহ্য গুমোট কষ্ট পায় মানুষ ও পশু উভয়েই, বালিতে প্রায় অন্ধের মতো অবস্থা হয় তাদের, নেতিয়ে পড়ে গাছপালা সব। দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন মরে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই সুন্দর টাটকা বাতাস বয় সমুদ্র থেকে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় নীল নদের বন্যা। আবার জেগে ওঠে সমস্ত প্রকৃতি, ঠিক যেন মৃত্যুর কোল থেকে পুনরায় বেঁচে উঠলো।

প্রকৃতির এহেন অবস্থা দেখেই মিশরীদের কল্পনায় মৃত ও পুনরুজ্জীবিত দেবতার ধারণা উদয় হয়েছিল। তারা ব্যাখ্যা করেছিল এভাবে: মরুভূমির বদরাগী দেবতা **সেৎ** — তার মুখ লাল, চোখও যেন ভীষণ জ্বরে লাল টকটকে — তার পঞ্চাশ জন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এসে হত্যা করে যায় ফসল ও উদ্ভিন্ন প্রাণের দেবতা **ওসিরিসকে।** কিন্তু তার পরে প্রকৃতি যেমন বেঁচে ওঠে, তেমনি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন ওসিরিস দেবতাও।

৩. 'মরণোত্তর জীবন' সম্পর্কে বিশ্বাস। মৃত ও সমাধিস্থ মানুষের আত্মা যেখানে থাকে, সেখানকার রাজা এবং বিচারপতি পুনরুজ্জীবিত দেবতা ওসিরিস। 'মৃত্যুর পরে'ও জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনাকে তারা বলতো **মরণোত্তর জীবন।** ওসিরিসের রাজ্যে রয়েছে প্রচুর পানীয় জল, আর গম — তার পরিমাণ মানুষ সমান উঁচু। কিন্তু তাই বলে সব মৃত আত্মাই যে এই মৃতদের রাজ্যে যেতে পারতো তা নয়। ওসিরিস মৃত মানুষদের আত্মার বিচারক। দেবতাদের নির্দেশ যদি কেউ অমান্য করতো, তা হলে দেবতা ওসিরিসের হাতে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হতো: এক ভয়ালদর্শন দানব সেই আত্মা ভক্ষণ করে ফেলতো।

মিশরীরা বিশ্বাস করতো যে, যদি মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা হয় তা হলে মৃতের আত্মা পুনরায় দেহে ফিরে আসতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তারা মৃতদেহের ভিতরের নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে মৃতদেহটি লবণাক্ত সলিউশনে ভেজাতো, তার পর রজন মিশ্রিত সাদা কাপড়ে জড়িয়ে রাখতো। এভাবে সংরক্ষিত দেহ কখনো পচে বিকৃত হতো না, শুকিয়ে যেত। এধরনের বিশুষ্ক মৃতদেহের নাম **মমি।** মৃতদেহকে মমিতে রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করায় অত্যধিক খরচ হতো, সেজন্য একমাত্র ধনী লোকেরাই তা করতে পারতো।

দেব-দেবী এবং 'মরণোত্তর জীবন' সম্বন্ধে মিশরীদের কল্পকাহিনী আমাদের নিকট বালখিল্য ও হাস্যকর মনে হলেও প্রাচীন মিশরের জনগণ কিন্তু তা বিশ্বাস করতো এবং দেবতা ওসিরিসের বিচারকে খুব ভয় করতো।

৪. পুরোহিত — সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দাসমালিক। মন্দিরকে মনে করা হতো দেব-দেবীর ঘর, সেখানে তাদের মূর্তি থাকতো। দেব-দেবীদের আশীর্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় মিশরীরা তাদের উদ্দেশ্যে অনেককিছু উৎসর্গ করতো। চাষীরা

মিশরীদের কল্পনায় দেবতা ওসিরিসের বিচারসভা। (প্রাচীন চিত্র।) রাজার সিংহাসনে বসে আছেন ওসিরিস দেব — মাথায় মুকুট, হাতে ক্ষমতার প্রতীক — ছোটো লাঠি ও চাবুক। অন্যান্য দেবতারা মৃতের হৃৎপিণ্ড তুলাদণ্ডে ওজন করার কাজে ব্যস্ত; মৃতের আত্মা ওসিরিসের সামনে দণ্ডায়মান। কুমিরের মাথা ও সিংহের দেহধারী দানবটি আত্মাটির বিচারের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

নিজেরাই বুভুক্ষু, তবু ছোট থলি ভর্তি শস্য, ঝুড়ি ভর্তি শাকসব্জী নিয়ে আসতো তারা। দাসমালিকরা উৎসর্গ করতো সোনাদানা, দাসদাসী এবং পশু; আর ফারাওনরা দিতো উর্বর শস্যক্ষেত্র। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হতো মন্দিরগুলো। থিব্‌স্‌ শহরে যে মন্দিরটি প্রধান ছিল, তার অধীনে ৮০ হাজারেরও বেশি দাস ছিল।

সব মন্দিরেই ছিল 'দেব-দেবীদের সেবায়েত' — **পুরোহিত**। মনে করা হতো যে, পুরোহিতরা দেব-দেবীদের সেবা করে, খেতে দ্যায় — দেব-দেবীর মূর্তির সামনে আহার্য নিয়ে গিয়ে রাখে। মিশরীরা বিশ্বাস করতো যে, পুরোহিতরা স্বয়ং দেব-দেবীদের সাক্ষাৎ পায়, তারা শুধু উৎসর্গীত দ্রব্যই দেব-দেবীকে পৌঁছে দেয় না, লোকজনদের প্রার্থনাও তাদের কাছে নিবেদন করতে পারে, আর দেবতারা পুরোহিতদের মাধ্যমে জনগণকে তাদের নির্দেশ দান করতে পারে। পুরোহিতদের কথা দেবতাদের কথা বলে মনে করা হতো।

মন্দিরের ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পাওয়ায় পুরোহিতরা দাসদাসী, জমিজমা ও সোনাদানার অধিকারী হয়ে সবচেয়ে বিত্তশালী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দাস ও অধমর্ণদের উপর সীমাহীন শোষণ চালাতো।

৫. ফারাওনদের দেবতার আসন লাভ। ফারাওন এবং অন্যান্য দাসমালিকদের প্রতি জনগণের আজ্ঞানুবর্তিতা দাবী করতো পুরোহিতরা। তারা বলতো: 'বাধ্য হলে দেবতাদের পাবে আশীর্বাদ, অন্যথায় দেবতারা দেবেন অভিশাপ।' ফারাওনের ইচ্ছাকে যারা অমান্য করবে তাদের ভাগ্যে থাকবে অনাবৃষ্টি, প্লেগ, শত্রুর আক্রমণ আর ওসিরিসের শাসনদণ্ড।

মিশরীদের নিকটে মনে হতো, ফারাওনের মতো অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, দেবতাদের পক্ষেই শুধু তা সম্ভবপর। তাই তারা ফারাওনকে বলতো 'দেবশ্রেষ্ঠ'। ফারাওনের গুণকীর্তন করতো এই ব'লে: 'তিনিই
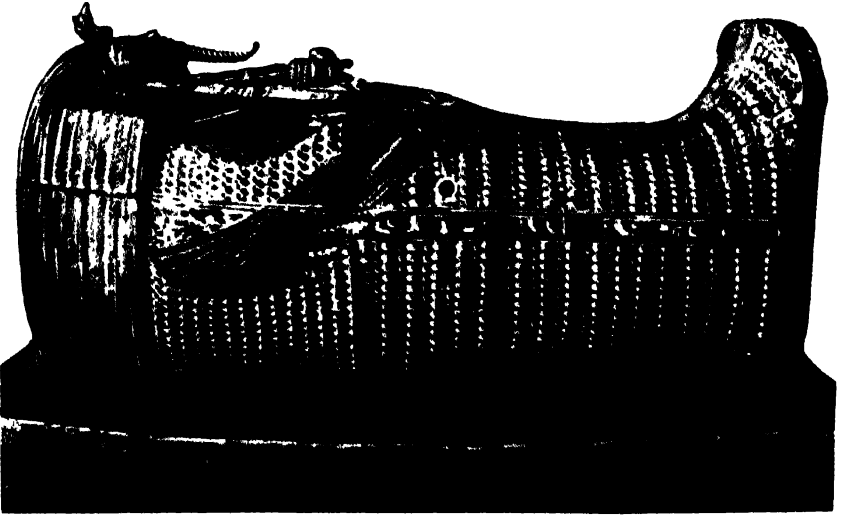
১. প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে বর্ণিত 'ওসিরিসের পুনরুত্থান'। পাশে দন্ডায়মান ওসিরিসের পুত্র গোর্। ২. ফারাওনের মৃতদেহ রক্ষার জন্য সোনার শবাধার। শবাধারের ঢাকনিতে ফারাওনের মুখাবয়ব খোদাই করা হয়েছে।

সূর্য, নিজ আলোকে সব আলোকিত করেছেন।' মন্দিরে দেবমূর্তির পাশাপাশি ফারাওনদের মূর্তি আঁকা থাকতো। (দ্র. ৭৬ পৃষ্ঠার ১ নং ছবি এবং চতুর্থ রঙিন আলোকচিত্র।) শুধু সাধারণ লোকজনরাই নয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা পর্যন্ত ফারাওনের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে তার পদধূলি চুম্বন করতো। ফারাওন যদি তার পায়ের চটিজোড়া চুম্বন করার অনুমতি কাউকে দিত তো সে নিজেকে সম্মানিত মনে করতো।

ধর্ম মিশরে ফারাওনদের ক্ষমতা এবং দাসমালিকদের আধিপত্য আরো জোরদার করেছিল। দেবতাদের অভিশাপ ও 'মরণোত্তর জীবনের' শাস্তি সম্পর্কে ভীতি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতদের সংগ্রাম করতে দেয় নি।

নীল নদের গুণকীর্তন:

মিশরীদের কাছে নীল নদের তাৎপর্য যে কতদূর, সে সম্পর্কে গানটিতে কী বলা এই গানটির সাহায্যে প্রমাণ করো যে মিশরীরা নীল নদকে জীবন্ত ভাবতো।

জয়তু হে নীল,
তোমাকে জিন্দাবাদ!
বাঁচাও মিশর; ধীরে বয়ে যাও চলে,

থেমে পড়ো যদি সব প্রাণ মরে যায়,
ক্রুদ্ধ হলেই দেশেতে আগুন জ্বলে
ছোটো-বড়ো সবে দারিদ্র্যে কাতরায়।

১. মন্দিরে যুদ্ধের দেবীসহ ফারাওনের ছবি। ফারাওন যে কোন জন কী করে বোঝা যাচ্ছে? দেব-দেবীর সাথে কেন ফারাওনকে আঁকা হতো? ২. প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান পুরোহিতের মূর্তি।

তুমি ওঠো জেগে — মাটি উল্লাস করে,
সবাই প্রাণ পায়, আনন্দে সবে জাগে।
মাঠে ফলে গম, খামার শস্যে ভরে,

চারিদিক নব সৃষ্টির স্বাদ মাগে।
শিশু ও তরুণ সবে খুশি ঝিলমিল
সম্রাট তুমি, তোমাকে সেলাম, নীল!

১. কেবল যদি মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা জানতাম, তবু তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু কিছু আমরা জানতে পারতাম। তাদের চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস আমাদের কী বলে? মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে জানলে কি বোঝা সম্ভব — তাদের প্রধান জীবিকা কী ছিল? শ্রেণীর উদ্ভব ও রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে মিশরীয় ধর্ম কোন্ সাক্ষ্য দেয়? ২. পুনরুজ্জীবিত দেবতা সম্বন্ধে পুরাকাহিনীর উদ্ভব মিশরে কেন হয়েছিল? ৩. 'মরণোত্তর জীবনে' বিশ্বাস থাকায় কাদের কীভাবে সুবিধা হয়েছিল?

৪. ধর্মবিশ্বাসের ক্ষতিকর দিক বিষয়ে ১১শ পরিচ্ছেদে নতুন কী জানতে পারলে? আরো কী অনিষ্ট হয়েছিল এতে মনে করতে চেষ্টা করো। ৫. মিশরে দাসমালিকদের ব্যাপারে ১১শ পরিচ্ছেদে নতুন কী জানলে?

§ ১২. প্রাচীন মিশরে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও লিপির উদ্ভব

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন মানুষ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের পক্ষে উপকারজনক কী খুঁজে পেয়েছিল এবং তাকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল কীভাবে।

১. গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তি। যারা কৃষিকাজ করতো নানান ব্যাপারে তাদের হিসাবনিকাশ করতেই হতো, যেমন — কী পরিমাণ শস্য ফলেছে, বীজ বপনের কাজে তার কী পরিমাণ খরচ হবে, সংবৎসরের আহারের জন্যই-বা থাকবে কতটা। কারিগররা ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র তৈরির সময় তাদের সঠিক পরিমাণ তামা এবং টিন নিতে হতো। বাঁধ এবং গৃহ নির্মাণের সময়ও জটিল হিসাবপত্র করার প্রয়োজন পড়তো। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে হলে কী পরিমাণ লোকজন লাগবে, মালমশলার পরিমাণই-বা কত দরকার সে সবই ভালো মতো হিসাব করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

এভাবেই সকলের সমবেত পরিশ্রম ও চেষ্টায় সৃষ্ট হয়েছিল **গণিতশাস্ত্র**। মিশরীরা ভগ্নাংশ এবং লক্ষাধিক সংখ্যা হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারতো। দশ লক্ষ সংখ্যা বোঝাতে হলে তারা ঊর্ধবাহু মানুষ আঁকতো — যেন এই বিরাট গাণিতিক সংখ্যা দেখে মানুষটি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দু'হাত উপরে তুলে আছে।

খাল খনন করতে হলে, জমিজমার হিসাব করতে হলে ভূমির আয়তন, তার কোণ ইত্যাদি পরিমাপের প্রয়োজন পড়তো। এসব থেকেই উদ্ভব হয়েছিল সেই বিজ্ঞানের যাকে আমরা এখন **জ্যামিতি** বলে থাকি। মূলে জ্যামিতি (গ্রীক শব্দ 'গেওমিয়েত্রিয়া') কথাটার অর্থই ছিল 'ভূমির পরিমাপ'।

২. জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব। নীল নদের বন্যার সময় হলে জমি, খাল এবং বাঁধ ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকদের বিশেষভাবে নজর দিতে হতো। মিশরীরা লক্ষ্য করেছিল যে, প্রতি বৎসর বন্যার পূর্বে আকাশের তারকারাজি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সব সময় অবস্থান করে। এই পর্যবেক্ষণাদির ফলেই **জ্যোতির্বিদ্যা** প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। গ্রহ-তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ যে বিজ্ঞানের ফলে সম্ভব, তাকেই বলে জ্যোতির্বিদ্যা। মিশরীরা এমন কি আকাশের তারকাপুঞ্জের একটি রাশিচক্র পর্যন্ত তৈরি করেছিল। সমুদ্র এবং মরুভূমিতে তারা তারকা পর্যবেক্ষণ করেই জ্ঞানলাভ করতো। অবশ্য একথা ঠিক যে, আজ আমরা যে সব নক্ষত্ররাজির কথা জানি, খালি চোখে বিনা যন্ত্রপাতির সহায়তায় মিশরীরা তার অনেক কিছুই জানতে পারে নি।

২
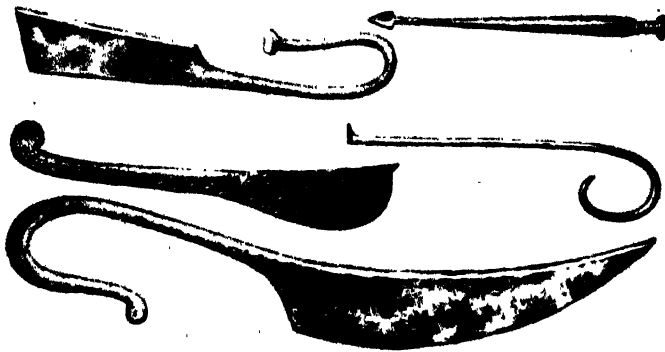
১. জ্যামিতিক নক্সা অঙ্কিত প্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরস কাগজের খণ্ডাংশ। ২. প্রাচীন মিশরে ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি। **প্রাপ্ত এইসব যন্ত্রপাতি কিসের সাক্ষ্য দেয়?**

প্রাচীন মিশরীরা **বর্ষপঞ্জিকা** অর্থাৎ ক্যালেণ্ডারও তৈরি করেছিল। তারা হিসাব করে বের করেছিল যে ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়। (ভেবে বলো দেখি, তাদের ঐ গণনায় কী ভুল ছিল?)

৩. প্রাচীন মিশরে চিকিৎসাবিজ্ঞান। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান আরো পূর্বে প্রাচীন মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। মিশরে মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করার প্রথা চালু থাকায় একটা বড়ো লাভ এই হয়েছিল যে, মানুষের শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে তারা জানতে পেরেছিল এবং তাতে করে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় সুবিধে হয়েছিল। নির্দিষ্ট ধরনের অসুখে তারা রোগীর নাড়ীর গতি পর্যবেক্ষণ

করতো। তারা বহু গাছগাছড়ার ভেষজ গুণাগুণ জানতো। তৎকালে শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত ব্রোঞ্জের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

৪. প্রাচীন মিশরে লিপির উদ্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দেই মিশর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে, লোক বা বংশ পরম্পরায় শুধুমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে তা স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। এজন্যই লিপির মাধ্যমে সেই জ্ঞান সংরক্ষণ করার উপায় বের করেছিল তারা। মিশরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হবার সাথে সাথে **লিপি** উদ্ভাবন সম্পূর্ণ একটি রূপ লাভ করেছিল।

প্রথমদিকে মিশরীরা বক্তব্য বিষয় ছবিতে লিখতো। ধরো — 'সূর্য' লিখতে হলে তারা প্রথমে একটি গোল বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে একটা বিন্দু বসিয়ে দিত। 'যোদ্ধা' লিখতে হলে একটা মানুষ এঁকে তার হাতে তীর-ধনুক দিয়ে দিত। (ছবির সাহায্যে মিশরীরা কীভাবে কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে পারতো, মনে করে দেখ। দ্র. ৫৯ পৃষ্ঠার ছবি।) এভাবে বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে তারা যে শুধু গোটা শব্দ প্রকাশ করতো তাই নয়, তারা আলাদা আলাদা অক্ষর এবং শব্দাংশও বোঝাতে পারতো।

ছবি দ্বারা লেখার এই পদ্ধতিকে বলে **হায়েরোগ্লিফ্** (hieroglyph), বাংলায় আমরা বলি **'চিত্রলিপি'**।* প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপি-চিহ্ন দিয়ে এই প্রাচীন মিশরীয় লিপিপদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। এ সমস্ত চিহ্নগুলোর আবার অপেক্ষাকৃত একটা সরল রূপ ছিল, তাড়াতাড়ি কিছু লিখতে হলে তারা সেই চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতো।

লেখার সরঞ্জামও মিশরে সুলভ ছিল। নীল নদের দুপাশে নানান জায়গায় ৪-৫ মিটার উঁচু নলখাগড়া জাতীয় একধরনের গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো, এই গাছের নাম ছিল **প্যাপিরস**। মিশরীরা এই গাছের কান্ড খুব পাৎলাভাবে চেরাই করতো, তারপরে এই গাছেরই পাতার (এগুলো দেখতে ছিল কাগজের মতো) উপরে আঠা দিয়ে সাঁটতো। পাপিরসের পাতা রংয়ে চুবিয়ে নিয়ে তার পরে তার উপরে তারা লিখতো। লিখতে লিখতে পাতায় যদি স্থান সংকুলান না হতো, তা হলে পাতার নিম্নাংশে আরেকটা পাতা আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়ে তাদের লেখার 'কাগজের' পরিসর বাড়িয়ে নিত। এভাবে লেখার ফলে মনে হতো যেন কোনো ফিতের উপরে লেখা হয়েছে; কোনো কোনো পাপিরস-ফিতে ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা পাওয়া গেছে। পাপিরস-পাতা থেকে তৈরি এই যে লেখার 'কাগজ' একেও বলা হতো পাপিরস। মিশরীরা পাপিরসে লেখা ছাড়াও পাথর খোদাই করেও লিখতো।

* এই নামকরণটি গ্রীকদের উদ্ভাবন; গ্রীক মূল শব্দটি 'হিয়েরোগ্লিফিকোন্' — হিয়েরোস্ (অর্থাৎ পবিত্র) এবং গ্লিফেইন্ (খোদাই করা) শব্দদ্বয় মিলে তৈরি। অর্থের দিক থেকে সংক্ষেপে বাংলা করলে দাঁড়ায় 'দেব-ভাষা'। — অনু.
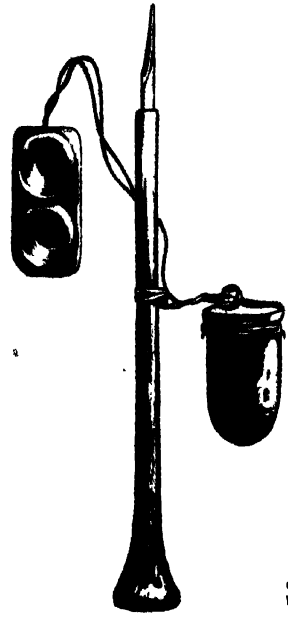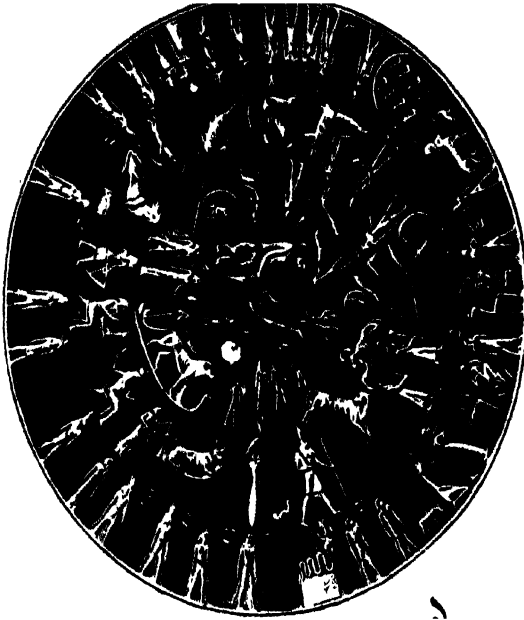
৫. প্রাচীন মিশরী বিদ্যায়তন ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা। মিশরীয় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শিক্ষিত আমলার দরকার ছিল, নির্মাণকার্য তদারকিতে এবং অন্যান্য নানা কাজে শিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মিশরে শিশুদের বিদ্যাশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। সে সব বিদ্যালয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, আমলা এবং পুরোহিতদের সন্তানরা শিক্ষালাভ করতো। বহু বৎসর ধরে লেখাপড়া শেখানো হতো। শিক্ষার্থীরা অনুশীলনমালা শিখতো, অঙ্ক কষতো। কমবয়সী ছাত্রেরা ভাঙা বাসনকোসনের ফালির উপরে লিখতে শিখতো, আর তার চেয়ে বড়োরা লিখতো পাপিরসের পাতায়। ভুলত্রুটিসহ ছাত্রদের লেখা এবং তার উপরে শিক্ষকের সংশোধন সমেত সে যুগের লিখিত মালমশলাদি বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়ে তা সংরক্ষণ করেছেন।

ছাত্রদের প্রতি উদ্দিষ্ট হিতোপদেশে বলা হয়েছে: 'নিজের হাতে লেখো, নিজের মুখে পড়ো, যারা তোমার চেয়ে বেশি জানে তাদের নির্দেশ পালন করো... নইলে তোমাকে মার দেওয়া হবে। পিঠে ছড়ি ভাঙো বাছাদের, প্রহার দিলে ঠিকই কথা শুনবে।' শিক্ষকের সহকারীকে ডাকা হতো 'বেত-পিটুনে লোক'; যে সব ছাত্র অলস ছিল এবং কথা শুনতো না, তাদের প্রহার করাই তার কাজ ছিল।

লিপির ব্যবহার ও জ্ঞানচর্চায় প্রাচীন মিশরে যদিও শুধুমাত্র দাসমালিকরাই অধিকারী ছিল, তবু লিপির উদ্ভব ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার তাৎপর্য ছিল বিরাট ও সুদূরপ্রসারী। **জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কৃষিকাজ, হস্তশিল্প ও নির্মাণকার্য প্রভৃতির**

১. প্রাচীন মিশরে প্রচলিত জ্যোতিমণ্ডলীর রাশিচক্র। তারা আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের বিভিন্ন তারকাকে বিভিন্ন দেব-দেবী, মানুষ, এমন কি পশু-পাখি-সরীসৃপের (যেমন, জলহস্তী, সিংহ, বৃশ্চিক ইত্যাদি) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছিল। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তারা কীরকম মিশিয়ে ফেলেছিল প্রাচীন মিশরীয় রাশিচক্রেই তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ২. প্রাচীন মিশরে লেখার সরঞ্জাম: দোয়াত, নলখাগড়ার ডাঁটাকে সূচলো করে বানানো কলম এবং কাগজের কালি শুকিয়ে নেবার জন্য ব্যবহার্য শুকনো বালি রাখার পাত্র। ৩. প্রাচীন মিশরী হায়েরোগ্লিফ্ বা চিত্রলিপি।

অত্যন্ত উন্নতি সাধন করায় সাহায্য করেছিল। লিপি উদ্ভবের ফলে জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং প্রবীণদের হাত থেকে নবীনদের হাতে, এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে সেই জ্ঞানভাণ্ডার হস্তান্তরিত হতে পেরেছিল।

মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার সমস্যা

প্রাচীন মিশরের অধিবাসী যে ভাষায় কথা বলতো এবং লিখতো তা পরবর্তীকালে বিস্মৃত ও অবলুপ্ত হয়ে যায়। আবিষ্কৃত মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধারে কেউই প্রথমে সক্ষম হন নি। মনে হয়েছিল, হায়েরোগ্লিফ্ লিপির রহস্য চিরকালের জন্য আমাদের অগোচরে থেকে যাবে।

মিশরের রোসেটা (বর্তমান নাম রশিদ) শহরে আবিষ্কৃত একটি পাথর উনিশ শতকের শুরুতে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। (দ্র. ৯ পৃষ্ঠায় ছবি ১।) পাথরটির উপরে খোদাই করে মিশরীয় ও গ্রীক ভাষায় অনেক কিছু লেখা ছিল। প্রস্তরফলকের মধ্যে রাজার নামের চারদিকে রেখা টেনে তাকে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য করা হয়েছিল। গ্রীক ও অন্যান্য আরো প্রাচীন ভাষায় পণ্ডিত তরুণ ফরাসী বিজ্ঞানী জ'-ফ্রাঁসোয়া শাপোলিয়' পাথর পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, রাজার নাম লিখতে গিয়ে পৃথক পৃথক চিত্রলিপি-অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, তা ছাড়া কয়েকটি স্বরবর্ণ সেখানে বাদ পড়েছে। বিভিন্ন ভাষার সাথে তুলনামূলক বিচার করে অবশেষে শাপোলিয়' কয়েকটি চিত্রলিপির অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হন। এই লিপি উদ্ধারের কাজে তিনি আবিষ্কৃত আরো কিছু প্রাচীন পাথর থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন,—সে সব পাথরে একটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক নাম খোদিত ছিল যা তিনি জানতেন। চিত্রলিপির অর্থ তিনি নিজে যেমন বুঝতে পেরেছিলেন সেই সূত্র ধরেই তিনি ফারাওন তুৎমস্ ও অন্যান্য ফারাওনদের নামের পাঠোদ্ধার করেন। এ সময় থেকেই মিশরীয় লিপি উদ্ধারের সূত্রপাত হয়েছিল।
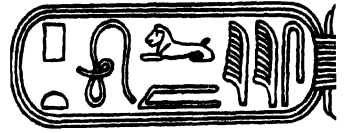
দুটি শিরোনামা: 'ক্লেওপাত্রা' (অর্থাৎ ক্লিওপেট্রা) এবং 'প্তোলমেওস্' (অর্থাৎ টলেমী)। 'ত' অক্ষরটি বিভিন্ন ধরনের চিহ্নে লেখা হয়েছে। স্ত্রীলিঙ্গবাচক নামের চিহ্ন স্বরূপ প্রান্তদেশের দুটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

শাপোলিয়'র অসমাপ্ত কাজ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাচীন মিশরীয় লিপির রহস্য এখন আর অবোধ্য নয়; পাপিরস ও পাথরের উপর লিপিবদ্ধ যা কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে তার বিশাল ভাণ্ডারের পাঠোদ্ধার আজ সম্ভব হয়েছে।

? ১. মিশরে জ্ঞানচর্চার উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে? ২. পূর্বে রিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা 'উঁচু মাঠে' বীজ বপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কোন্ ধরনের জ্ঞান ও হিসাবপত্তরের প্রয়োজন হয়েছিল বলে তুমি মনে কর? ৩. সমুদ্রযাত্রা এবং মরুভূমির বুকে স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্যটনের ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ জ্ঞান ও হিসাবনিকাশ আয়ত্ত করা তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বলে তোমার ধারণা? ৪. মিশরে লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে যা জান বলো। বর্তমানে প্রচলিত লিপি ও মিশরীয় লিপির মধ্যে পার্থক্য কী? ৫. প্রাচীন মিশরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল কেন?

§ ১৩. প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা

(দ্র. মানচিত্র ২)

মনে করতে চেষ্টা করো—কখন এবং কীভাবে শিল্পসৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল (§ ৩:১)।

১. সাহিত্য। পাপিরসে লিপিবদ্ধ মিশরীয় লিপি উদ্ধারের পরে বিশেষজ্ঞেরা জানতে পেরেছেন যে, প্রাচীন মিশরে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল।

দেব-দেবী ও ফারাওনের উদ্দেশ্যে রচিত শ্লোক পাঠ করে তাদের গুণকীর্তন করা হতো। মিশরের জনজীবন এবং বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে কাহিনী গল্পাকারে রচিত হয়েছিল। নানান ধরনের পুরাণ প্রচলিত ছিল। তাতে কল্পিত দেব-দেবী এবং বীর নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে নানা আখ্যান থাকতো। বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল দেবতা ওসিরিস সম্বন্ধে প্রচলিত পুরাণ। 'হিতোপদেশের' প্রচলন ছিল খুব বেশি, সর্বত্র; সেখানে ফারাওন ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য সাধারণ মিশরীয় লোকজনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে: 'তোমার কর্মকর্তার সামনে সর্বদা নতজানু হও'; 'ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মানুষকে কর্মকর্তার সামনে নতজানু হতে হবে'।

বিত্তহীন গরিব যারা ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত সংগীত, প্রবাদ ইত্যাদি কিছুই সংরক্ষিত হয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি, কেন না দরিদ্র হওয়ার ফলে তারা কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে নি।

২. প্রাচীন মিশরীয় সমাধিমন্দির। প্রাচীন মিশরবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা যে শুধু প্রাপ্ত লিপি থেকেই জানতে পারি, তা নয়; সমাধি ও ধর্মমন্দিরও এ সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান জুগিয়েছে আমাদের।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মিশরে পিরামিড তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। ফারাওন ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমাধিস্থ করার জন্য তখন পাহাড় কেটে তার মধ্যে কিছু কক্ষ তৈরি করে সেখানে তাদের রাখার নিয়ম চালু হয়। এই সব ঘরে মৃতদেহকে মমি করে সংরক্ষণ করা হতো। কোনো কারণে মমি রাখা না হলে ঐ কক্ষে পাথর বা কাঠের মূর্তি তৈরি করে রেখে দেয়া হতো; মিশরীরা মনে করতো যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা মূর্তির মধ্যেও বাস করতে পারে। মিশরীয় ভাস্কর মানুষের মুখ খোদাইয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। সমাধিমন্দিরের প্রায়ান্ধকার কক্ষে কিংবা যাদুঘরে রক্ষিত এধরনের মূর্তির সামনে দাঁড়ালে তোমার মনে হবে না যে কোনো মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছ, মনে হবে সত্যিই যেন কোনো জীবন্ত লোক তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (দ্র. রঙিন আলোকচিত্র প্রথম)

সমাধিমন্দিরের দেয়ালগাত্রে ধনী ব্যক্তিদের ধনসম্পদের পরিচয় সূচক রঙিন ছবি আঁকা হতো। শস্যভরা গম ক্ষেত্রে ফসল কাটছে কিষাণরা, কারিগর কাজ করছে তাদের কর্মশালায়, গোয়ালের সামনে ভোজনোৎসবের জন্য কাটা হচ্ছে পশু-পাখি। এসব দৃশ্যের পাশেই অঙ্কিত হয়েছে ভোজের দৃশ্য — গৃহস্বামী ও অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থিত নর্তক-নর্তকী ও গাইয়ে-বাজিয়ের দল।

সমাধিমন্দিরের ভিতরে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি পাওয়া গেছে; সে সব মূর্তি রাঁধুনীর, মুটের এবং দাসদের তদারকিতে ব্যস্ত পরিদর্শকদের। মিশরীদের ধারণা ছিল যে, ছবিতে বর্ণিত বিষয় সত্যসত্যই বাস্তবে শস্যক্ষেত্রে বা কর্মশালায় পরিণত হয়ে যাবে, কিংবা দাসমূর্তিগুলোও সত্যিকারের দাসে পরিণত হয়ে মৃত ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হবে। ধনী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরেও দাসমালিক হয়েই থাকতে চাইতো।

চাষীদের কবরে চাষীর মৃতদেহের সাথে কাঠের তক্তায় খোদিত মনুষ্যদেহের ছবি রেখে দেওয়া হতো। মমি করার বদলে এরকম করাই প্রথা ছিল চাষীদের জন্য। আর দাসদাসীরা মারা গেলে শুধুমাত্র গর্ত খুঁড়ে তাদের মাটি চাপা দেয়া হতো।

৩. প্রাচীন মিশরীয় ধর্মমন্দির। ভূপতিদের পরিচালনায় নির্মিত বিশাল উপাসনালয়গুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সাজানো হতো।
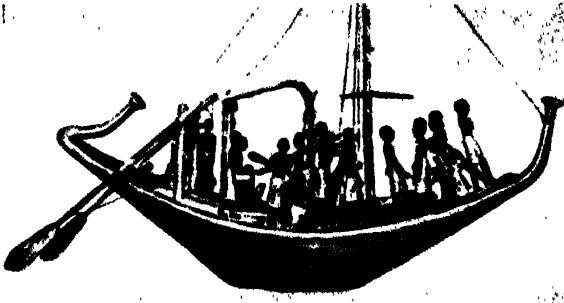
১. মাঝিমাল্লাসহ প্রাচীন মিশরীয় জাহাজের একটি মডেল। সমাধিমন্দিরে কী জন্যে এরকম মডেল রাখা হতো? ২. সমাধিমন্দিরে রক্ষিত পরিদর্শকের মূর্তি। ৩. কাষ্ঠনির্মিত চামচ। খোদিত মূর্তিতে জনৈক এশিয়াবাসীকে একটি বিশাল কুঁজো বহন করতে দেখা যাচ্ছে।

দু'পাশে সারি সারি স্ফিংক্সের মূর্তির মাঝখানে তৈরি পথ ধর্মমন্দিরের প্রবেশদ্বারে গিয়ে ঠেকতো। মন্দিরের সামনে ফারাওনের মূর্তি রাখা হতো, তার উচ্চতা ও পরিসর মানুষের আকারের চেয়ে ৫-৬ গুণ বড়ো। মন্দিরের দুটি মিনারের মাঝখানে সংকীর্ণ দরজা দিয়ে মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করতে হতো।

চত্বরের শেষভাগে একটি প্রায়ান্ধকার বিশাল হলঘর থাকতো। বহুসংখ্যক স্তম্ভ ধরে থাকতো সেই কক্ষের ছাদ। কোনো কক্ষের স্তম্ভ ছিল পাপিরসের গুঁড়ির মতো দেখতে, আবার কোনো-কোনোটা ছিল যেন তাল গাছের গুঁড়ি, তৃতীয় ধরনের স্তম্ভ দেখলে মনে হতো — বৃক্ষকাণ্ডের উপরিভাগে যেন ফুলের কুঁড়ি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

থিব্‌স্ শহরের প্রধান ধর্মমন্দিরটির স্তম্ভসমূহের উচ্চতা ছিল ২৩ মিটার। ছাদে গাঢ় নীল রংয়ের প্রেক্ষাপটে সোনালী রংয়ের তারকারাজি অঙ্কিত। মিনারে, দেয়ালে এবং স্তম্ভে ফারাওন এবং বিভিন্ন পশুমস্তক সম্বলিত বিভিন্ন দেবতার

থিব্‌স্‌ নগরে একটি ধর্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। (আলোকচিত্র।)

বিরাটাকার মূর্তি খোদাই করা থাকতো। (দ্র. ৭২ পৃ. ১ নং এবং ৬৯ পৃ. ২ নং ছবি।) কোনো ছবিতে ফারাওন হয়তো দেব-দেবীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে, কোনোটায় হয়তো তাকে শত্রুসেনার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে দেখা যাচ্ছে, আবার কোনোটায় — ফারাওন এক হাতে কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে ধরে আছে। নীল নদের তীরে ফারাওনের বিশাল মূর্তি রক্ষিত আছে।

প্রাচীন মিশরে দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি ও ফারাওনের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য শিল্পকলাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একথা প্রমাণের জন্য বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত প্রশ্নমালা ও অনুশীলনী সাহায্য দেবে।

সিনুহেৎ সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরীয় গল্প

প্রাচীন মিশরে প্রচলিত গল্প ও গানের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন মিশরীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কী আমরা জানতে পারি? এধরনের রচনায় কোন্‌ শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে?

মিশরে সিনুহেৎ ছিল একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। ফারাওন মারা গেলে রাজধানীতে গণ্ডগোল এবং নতুন ফারাওনের রোষদৃষ্টিতে পড়ার ভয়ে সে এশিয়ায় পালিয়ে যায়। মরুভূমিতে তৃষ্ণায় তার প্রাণসংশয় হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে সে গল্প করেছে: '...আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, গলা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, নিজেকেই নিজে বললাম — এই তা হলে মৃত্যুর স্বাদ।' মরুভূমির উপরে পশুদল নিয়ে ভ্রাম্যমাণ কাফেলার দেখা পেয়ে সে যাত্রা সিনুহেৎ বেঁচে যায়।

এশিয়ায় সিনুহেৎ এক সর্দারের অধীনে চাকরি করে এবং সেনাদলের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। নিজের যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে সে বলেছে: 'যে কোনো দেশ যা-ই আমি আক্রমণ করেছি, পশুচারণক্ষেত্র এবং পানীয় জলের কূপ ছেড়ে তাদের পালাতে হয়েছে, আমি তাদের পশুপাল এবং জনগণকে বহিষ্কার করে দিয়েছি, তাদের খাদ্যভাণ্ডার কেড়ে নিয়েছি, হত্যা করেছি তাদের।' প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিল সিনুহেৎ এবং সকলের সম্মানীয় ছিল সে। শুধু একটা ব্যাপারেই তার ভয় ছিল, আর তা হলো — এশিয়ায় যদি সে মারা যায় তা হলে তো কেউ তার দেহ সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে না।

ফারাওনের কাছ থেকে দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে সিনুহেৎ মিশরে প্রত্যাবর্তন করলো। রাজপ্রাসাদে গিয়ে সে ফারাওনের পায়ের উপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে সেই যে পড়ে রইলো ফারাওনের নির্দেশে যতক্ষণ না তাকে ধরে ওঠানো হলো ততক্ষণ উঠলো না। অতঃপর ফারাওন সিনুহেতের জন্য বাসভবন ও সমাধিমন্দির নির্মাণের হুকুম দান করেছিল। মৃত্যুর পর সিনুহেতের মরদেহ সমাধিমন্দিরে রক্ষিত হলো।

গান

আমাদের কাজ দিবস ধরিয়া —
সাদা গমশীষ চলো বহি' নিয়া;
ভাঁড়ার তো গেছে কবেই ভরিয়া,
ফসলের ভারে পড়ে উপছিয়া।

দরিয়ার নাও ভরি' গেছে, ভাই,
ওঠে মাথা ছাড়ি ফসলের ডাঁই —
হইবে বহিতে, নাই উদ্ধার।
মোদের পরাণ কলিজা লোহার!

?

১. মিশরীয় সমাধিমন্দির খননে আবিষ্কৃত জিনিসপত্রের দ্বারা আমরা প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা ও ধর্ম সম্বন্ধে কী জানতে পারি? ২. মিশরীয় ভাস্কর ও চিত্রীরা কাদের মূর্তি গড়েছে, কাদের ছবি এঁকেছে? পিরামিড ও মহাকায় প্রস্তরমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মিশরীদের কী মনে হতো, ভেবে বলো তো। পিরামিড, ধর্মমন্দির এবং মূর্তি মিশরীদের মনে কোন্ ভাবনাচিন্তা ও অনুভবের উদ্রেক করতো? এ সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত কী? ৩. মিশরীয় শিল্পকলায় তোমার পছন্দসই কী আছে এবং কী তোমার ভালো লাগে না? ৪. মিশরীয় শিল্পকলা ও আদিম মানুষের শিল্পকলার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী? এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা কীভাবে করা সম্ভব?

প্রাচীন মিশরের ইতিহাস ভালোভাবে বুঝেছো এবং মনে রেখেছো তো?

১. প্রাচীন মিশর কোন্‌খানে অবস্থিত ১ নং মানচিত্রে তা দেখাও। তার অবস্থান ও ভৌগোলিক সীমা নিজ ভাষায় গুছিয়ে বলো। ২. প্রাপ্ত কোন্ লিখিত দলিল ও ইতিহাসের অন্যান্য আকর-উপাদানের ভিত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব যে, মিশরে শ্রেণীশোষণ ছিল এবং সমাজকে কয়েকটি

শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল? কিছু লোক কর্তৃক অন্য লোকদের শোষণ কেন মিশরে দেখা দিয়েছিল? ৩. দরিদ্র ও দাসদের উপরে সর্বপ্রকার আধিপত্য স্থাপন কীভাবে দাসমালিকরা সমর্থন করতো? এই উদ্দেশ্যসাধনে দাসমালিক কর্তৃক ব্যবহৃত অন্ততপক্ষে তিনটি উপায় বলো। শোষিতেরা অত্যাচারের কবল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হবার কোনো প্রচেষ্টা কখনো নিয়েছিল কি? প্রমাণ সহকারে বিশদ ব্যাখ্যা কর। ৪. ফারাওনরা কেন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো? প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে যুদ্ধের ভূমিকা কী ছিল? ৫. পুরাকালে বলা হতো: 'মিশর — নীল নদের দান'। এই উক্তির কতটুকু সত্য এবং কতটুকু নয়? প্রমাণ দর্শাও। ৬. পিরামিড নির্মাণ যে মিশরেই হয়েছিল এই তথ্য থেকে ক) তখনকার মিশরীয় সমাজবিন্যাস, খ) মিশরের রাষ্ট্রকাঠামো, গ) মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস এবং ঘ) বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে আমরা কী কী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? ৭. দেবতা ওসিরিস সম্পর্কিত পুরাণে প্রাচীন মিশরের প্রকৃতি, জনগণের জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সন-তারিখগুলো ঠিকঠাক মনে আছে কিনা দেখে নাও। ১০৮ পৃষ্ঠার সারণী দেখো।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য

এশিয়া মহাদেশের ভূভাগের পশ্চিমাংশ যা ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরকে ঘিরে অবস্থিত, তাকেই আমরা **মধ্য প্রাচ্য** বলে থাকি। এ অঞ্চলে মরুভূমি ও শুষ্ক স্তেপ অঞ্চলের সংখ্যা অনেক। তার উপরে কিন্তু নদী এবং তার প্রভাবে অতি উর্বর উপত্যকাও সেখানে আছে। এই এলাকার দুটি বড়ো নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপত্যকা: নদী দুটির নাম — **ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস,** আর ঐ দোয়াব অঞ্চলের দেশটি — **মেসোপটেমিয়া।**

§ ১৪. মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব

(দ্র. মানচিত্র ২)

মনে করতে চেষ্টা করো — কৃষিকর্ম ও পশুপালন বিকশিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে কোন্ ধরনের জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল (§ ৫: ৩)।

১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রকৃতি ও জলবায়ু। ককেশাস পর্বতের দক্ষিণাংশ থেকে নির্গত হয়ে ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস **পারস্য উপসাগরে** এসে পড়েছে। এই দুটি নদের মাঝখানে মধ্য ও নিম্নাংশ এলাকা জুড়ে যে দেশটি অবস্থিত তাকেই প্রাচীন কালে বলা হতো **দ্বি-নদমধ্যা দেশ*।**

* গ্রীকরা বলতো — **মেসোপটেমিয়া।** গ্রীক 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থও তা-ই: দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত দেশ। — অনু.

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ নদদ্বয়ের পলিতে গড়ে ওঠা ব-দ্বীপ অঞ্চল: স্থানটি নিচু জলাভূমি এবং সমভূমি। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় ক্ষণস্থায়ী শীতের মরশুমে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। এ'টেল মাটি ভিজে থিকথিকে কাদা হয়ে যায়। বসন্তে পাহাড়ের মাথায় জমা বরফ গলতে শুরু করে, বান ডাকে ইউফ্রেতিস আর তাইগ্রিসে। দু'কূল উপচে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি প্লাবিত করে দেয়।

বন্যার পর মাটি হালকা সবুজ ঘাস ও আগাছায় ঢেকে যায়। কিন্তু আবহাওয়া এখানে খুব গরম — ছায়ায় ৫০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। রোদ্রের তাপে সব সবুজ শুকিয়ে পুড়ে যায়। সমতলভূমির মাটি রোদে পুড়ে লালচে আকার ধারণ করে। নিচু জায়গায় আবদ্ধ জল পচে ওঠে।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় না ছিল কোনো ধাতু, না কোনো পাথর। কিন্তু দেশের মাটি নদীর প্রসাদগুণে অস্বাভাবিক রকমের উর্বর।

২. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রথম অধিবাসী। মাটি উর্বর হওয়ায় দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া কৃষিকর্মের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টপূর্ব ৭-৬ সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়াবাসীরা কৃষিকাজে কোদাল ব্যবহার করতো, গরু-ছাগল-ভেড়া পালতো। জলাভূমিতে যে সব গাছগাছালি ও আগাছা জন্মাতো, মাটি ও সেই গাছপালা দিয়ে তারা তৈরি করতো কুঁড়েঘর।

বন্যায় ভেঙে পড়তো কুঁড়েঘর, জলে ডুবে লোকজন ও গৃহপালিত পশু মারা যেত। কখনো কখনো তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসে তীব্র বেগে এক ধাক্কায় বন্যা আসতো। লোকজনদের মনে হতো, নদের প্লাবন সারা পৃথিবীই বুঝি ডুবিয়ে দেবে। হাড়কাঁপুনি জ্বর, বিছে আর অসংখ্য প্রকার পোকামাকড়ের জন্য কী কষ্টটাই না তারা ভোগ করতো। ওদিকে আবার গৃহপালিত পশুদলের উপর ছিল সিংহের আক্রমণ। বড়ো বড়ো আগাছার জঙ্গলে থাকতো বুনো শূকর, তারা ফসল নষ্ট করতো।

তবু এত কষ্টেও মানুষ নতি স্বীকার করে নি। আশপাশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে তারা জলাভূমি থেকে খাল কেটে জল নিষ্কাশন করে জলা শুকিয়েছে, ক্ষেতে জলসেচ করেছে, জনপদ ও ফলের বাগান ঘিরেছে প্রাচীর দিয়ে। কৃষকেরা শক্ত এ'টেল মাটি চষার উপযুক্ত করে টেকসই লাঙ্গল বানিয়েছে। (দ্র. ৯১ পৃষ্ঠার ছবি।) প্রখর রোদ্র মাথায় নিয়ে তারা খাল থেকে জল তুলে ক্ষেতে দিয়েছে।

৩. খ্রী. পূ. ৩য় সহস্রাব্দে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা। মানুষের শ্রমে জলাভূমি ও জলাভাব জয় করা সম্ভব হয়েছিল। জলভরা অসংখ্য খালের আঁকাবাঁকা জাল যেন বিছিয়ে রাখা হয়েছিল সমভূমির উপরে। গম আর যব পেকে থাকতো মাঠে মাঠে। জনপদের চতুর্দিকে ঘিরে থাকতো খেজুর গাছের সবুজ

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া। (ে ।।) খালের পাশে মাটির তৈরি কুঁড়েঘর আর প্রাচীর। প্রাচীরের পিছনে খেজুর বাগান।

বন। খেজুর গাছকে তারা বলতো 'প্রাণবৃক্ষ'; খেজুর থেকে তারা তৈরি করতো ময়দা আর মধু, খেজুর আঁটি ব্যবহৃত হতো জ্বালানী হিসেবে, খেজুর গাছের ছাল থেকে তারা বানাতো দড়ি আর ঝুড়ি। পশুচারণক্ষেত্রে চরে বেড়াতো গরু আর গায়ে প্রচুর লোমভর্তি ভেড়ার পাল।

শহরে বসবাস করতো কারিগররা, ধুমধামের সাথে ব্যবসাপত্র চলতো। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী তাদের প্রতিবেশী জনগণ থেকে ধাতু, কাঠ ও পাথর সংগ্রহ করতো; তার বিনিময়ে তারা তাদেরকে খাদ্যশস্য, খেজুর আর পশম দিত। খ্রী. পূ. ৪র্থ সহস্রাব্দে কারিগররা প্রথমে তামা ও সোনা এবং পরে ব্রোঞ্জের ব্যবহারও আয়ত্ত করে নিচ্ছিল। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার পশমী কাপড়ের সুখ্যাতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁটেল মাটি দিয়ে তারা তৈরি করতো বালতি, বাক্স, নল; আর মাটির ইঁট দিয়ে বানাতো ঘরবাড়ি।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার মাটি এত উর্বর ছিল যে, শস্যবীজ বপনের তুলনায় ফসল ফলতো এক শ' গুণ বেশি, একটা খেজুর গাছে সংবৎসরে খেজুর ধরতো ৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। **এরকম অতিফলনের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় আরো বেশি ফসল পাওয়া যেত। মানুষকে শোষণ করার সম্ভাবনা দেখা দিলো।**

৪. শ্রেণীবিন্যাস। মেসোপটেমিয়ায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন এবং পুরোহিতরাই সবচেয়ে বেশি জমিজমা ভোগ করতো, দাসদাসী রাখতো, অর্থের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ রৌপ্য সঞ্চয় করতো। যুদ্ধবন্দীদের সর্বদাই দাসে পরিণত করা হতো। সম্ভ্রান্ত পরিবারে এবং মন্দিরে দাসদের কাজ করতে হতো। মেসোপটেমিয়ায় দাসদের বলা হতো 'নতচক্ষুর' দল; নিজের মনিবের মুখের দিকে চাইবার সাহস পর্যন্ত এদের ছিল না।

২

৪

১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত লাঙ্গল। (প্রাচীন চিত্র।) লাঙ্গলের সাথে লম্বা নলসহ একটি ফোঁদল যোগ করা হয়েছে। এই ফোঁদলের ভিতরে শস্যবীজ দেয়া হতো—এভাবে জমিচাষের সাথে সাথে একই সময়ে বীজ বপন করাও হয়ে যেত। **ছবিতে অঙ্কিত প্রতিটি লোক কী কী কাজে ব্যস্ত, লক্ষ্য করো।** ২. মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত কোনো কিছুর ওজন পরিমাপক বাটখারা। **বাটখারার ব্যবহার কীসের সাক্ষ্য দিচ্ছে?** ৩. প্রাচীন শিল্পে পুরাণের রূপায়ণ — দ্বন্দ্বরত সুর ও অসুর। (দ্র. ৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পুরাণ কাহিনী।) ৪. বন্যা সম্পর্কিত পুরাকাহিনী এই মৃত্তিকাফলকে লিপিবদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ চাষী এবং কারিগরই ধনী ব্যক্তিদের নিকটে ঋণজালে আবদ্ধ থাকতো। ঋণ তো শোধ করতে হতো বটেই, সেই সাথে সুদ হিসেবে দিতে হতো আরো প্রচুর টাকা। গরিবদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। ঋণের বোঝা সারা জীবনভর তারা টেনে যেত। কোনো রকমে ধুঁকে ধুঁকেও তারা পরিশ্রম করতো ঋণের টাকার সুদটা অন্ততপক্ষে যাতে বছর বছর উশুল দিতে পারে সেজন্যে। অধমর্ণ ব্যক্তি সর্বদা ত্রাসের মধ্যে জীবনধারণ করতো, ভয় — কোন্ সময়ে না দেনার দায়ে তার সমগ্র পরিবারকে কিংবা তাকে দাস করে নেয়।

দরিদ্র যে সব লোকের কোনো জমি ছিল না, তারা ধনীদের জমি ইজারা নিতো।* জমির প্রকৃত মালিককে ইজারাদাররা ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক এবং ফলবাগানের দুই-তৃতীয়াংশ ফলমূল দিতে বাধ্য থাকতো।

কৃষিকাজ, পশুপালন ও হস্তশিল্পের উন্নতির সাথে সাথে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় দাস, স্বাধীন গোষ্ঠী-চাষী এবং ধনী দাসমালিকদের শ্রেণী বিন্যাস গঠিত হতে লাগলো।

বিশ্বসৃষ্টি এবং মহাপ্লাবন সম্বন্ধে দক্ষিণ মেসোপটেমীয় পুরাণ

ভূবনগ্রাসী মহাপ্লাবনের পুরাণ দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতেই বা দেখা দিয়েছিল কেন? প্রাচীন মিশরেও কি এই পুরাণ চালু হতে পারতো?

১. পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ তখন ডুবে ছিলছ সমুদ্রে। ভীষণদর্শন অসুর তখন জল থেকে মাটিকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে দেবতাদের বাধা দিত। দেবতাদের যিনি প্রধান তিনি এই অসুরের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন এবং তার দেহ দু'খণ্ড করে কেটে ফেলেন। অসুরের দেহের ঊর্ধাঙ্গ দিয়ে তিনি তৈরি করলেন আকাশ, তার পর তা সাজালেন তারকামালা দিয়ে। আর দেহের নিম্নাঙ্গ দিয়ে তৈরি করলেন পৃথিবীর ভূভাগ, তার উপরে রোপণ করলেন বৃক্ষাদি, পশুদের নিয়ে আসা হলো সেখানে বসবাসের জন্য। এ'টেল মাটি থেকে দেবতা বানালেন প্রথম যুগের মানুষ, তারা ধরনধারণ ও বুদ্ধি-আক্কেলের দিক থেকে এক এক দেবতার প্রতিরূপ হলো।

২. দেবতারা পৃথিবীকে প্লাবিত করে মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করার মনস্থ করলেন। কিন্তু জলের দেবতা এই সিদ্ধান্ত নলখাগড়া বনের কাছে ফাঁস করে দেন। এই নলখাগড়াগুলো থেকেই কিছু নিয়ে এক ব্যক্তি তার কুঁড়ে তৈরি করেছিল। নলখাগড়াগুলো এখন আবার তা বলে দিলো ঐ লোকটিকে। তখন লোকটা এক বিরাট নৌকা তৈরি করে নিজের পরিবারপরিজনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুললো, সঙ্গে নিল দক্ষ কারিগরদের এবং বিভিন্ন জাতীয় পশু ও পাখি। নির্দিষ্ট দিনে কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল, শুরু হলো প্রবলতম বর্ষণ, সারা পৃথিবী জলে ডুবে গেল। পৃথিবীর সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো, কেবল যারা ঐ নৌকার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বেঁচে রইলো।

* ইজারা নেওয়া — নির্দিষ্ট ভাড়ার বদলে জমি বা অন্য কিছু সাময়িকভাবে ব্যবহার করা। যে মানুষ ইজারা নেয় তাকে ইজারাদার বলে।

ছ'দিন পরে ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। জল সরে যেতে লাগলো। নৌকা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে গিয়ে ডাঙার খোঁজখবর নিয়ে এলো, সেখানেই পরে সমস্ত লোক ও পশুপাখি নেমে গিয়ে বসবাস শুরু করলো।

মেসোপটেমিয়ায় উদ্ভূত এই পুরাণ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির সামনে মানুষের অসহায়তা দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি আরো সুদৃঢ় করে তুলেছিল। মানুষের এই অসহায় মনোভাবের সুযোগ নেয় পুরোহিতের দল, তারা ভয় দেখাতে শুরু করে যে, দেবতাদের নির্দেশ অমান্য করলে তারা প্লাবন এবং অন্যান্য নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ পুনর্বার পৃথিবীতে পাঠাবে।

? ১. মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে তুলনা করো। নিসর্গ ও জলবায়ু ইত্যাদির দিক থেকে উভয় দেশের মধ্যে মিল কোন্‌খানে আর তফাৎই-বা কোথায়? ২. প্রাচীন কালে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মধ্যে কোথায় মিল ছিলো? ৩. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় কৃষকেরা গোষ্ঠী-জীবন করতো কেন? ৪. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব কেন হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরদান কঠিন মনে হলে, প্রাচীন মিশরে শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ স্মরণ করো (§ ৭)। ৫. স্বাধীন গরিব লোকজনদের কীভাবে বিত্তশীল দাসমালিকেরা শোষণ করতো? ৬. এখন থেকে প্রায় কত হাজার বৎসর পূর্বে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় কৃষির উদ্ভব হয়েছিল?

§ ১৫. মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীনতম রাষ্ট্র ও ব্যাবিলন সাম্রাজ্য

(দ্র. মানচিত্র ২)

মনে করতে চেষ্টা করো—মিশরে কখন এবং কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল; কী কী লক্ষণ থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বোঝা যায় (§ ৮:১)।

১. মেসোপটেমিয়ায় প্রথম রাষ্ট্র। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় সমাজে শ্রেণী উদ্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে খ্রী. পূ. ৪র্থ সহস্রাব্দের শেষে সেখানে রাষ্ট্রের পত্তন হলো। প্রায় প্রত্যেক শহরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র ছিল। সেনানী, প্রহরী, আমলা আর জল্লাদদের সহায়তায় এই সব **নগর-রাষ্ট্র** দরিদ্র জনগণ ও দাসদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শাসন করতো।

নগর-রাষ্ট্রের রাজারা একে অন্যের নগর দখল করে নিত, ধ্বংস করে দিত, শহরের বাসিন্দাদের হয় যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যেত নয়তো কর দিতে তাদের বাধ্য করতো।

২. ব্যাবিলনের প্রাধান্য লাভ। ইউফ্রেতিস নদীর তীরে, যেখানে নদীটি তাইগ্রিসের খুব কাছাকাছি এসে গেছে সেইখানে **ব্যাবিলন** নগর গড়ে ওঠে। যে জায়গায়
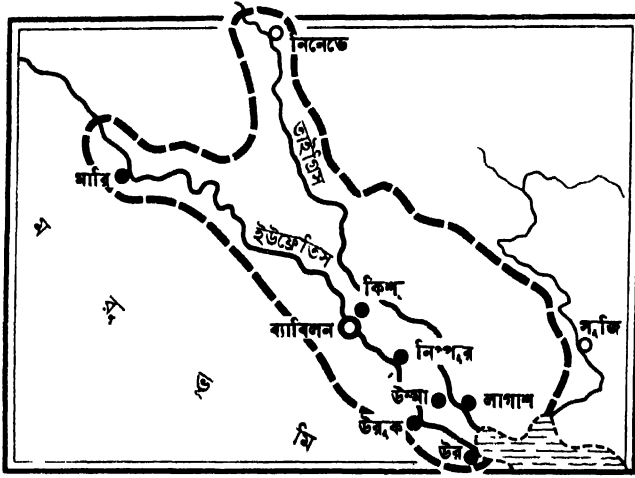
নগরটি অবস্থিত, স্থান হিসেবে তার অনেক সুযোগসুবিধা ছিল। নদীপথে বণিকেরা নৌকায় এবং ভেলায় করে নগরবাসীদের প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে শহরে আসতো। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় উৎপন্ন জিনিসপত্রের সাথে বণিকেরা তাদের সওদা বিনিময় করতো। (স্থানীয় অধিবাসীরা কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করতো এবং সওদাগরেরা কী নিয়ে আসতো, মনে করে দেখ।) ব্যাবিলনের উপর দিয়েই চলে গিয়েছিল মেসোপটেমিয়ার সর্বপ্রধান স্থলপথ, তার উপর দিয়ে, দলে দলে কাফেলা চলে যেত গাধার উপরে ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে।

ব্যাবিলন ধীরে ধীরে মেসোপটেমিয়ার সর্ববৃহৎ বাণিজ্যনগরীতে পরিণত হলো এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে দাঁড়ালো। নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকতো চারদিকে ঘেরা বাজার, তার মধ্যে মালপত্র মজুত করার আড়তও থাকতো। আর এই বাজারের চতুষ্পার্শ্বে থাকতো কারিগর, মুটে ও মাঝিমাল্লাদের কুঁড়েঘর — এগুলো তারা তৈরি করতো মাটি ও খড়বিচালী দিয়ে, কখনো-বা ছোটো ছোটো হালকা পাথর দিয়ে।

৩. হাম্মুরাবির সময়ে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য। খ্রী. পূ. ১৭৯২-১৭৫০ ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে সম্রাট হলেন **হাম্মুরাবি** নামে এক ব্যক্তি।

ব্যাবিলনে প্রচুর ধনসম্পদ থাকায় সম্রাটের পক্ষে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন সম্ভব হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদকে হাম্মুরাবি সুকৌশলে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে একটির সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে জোট বেঁধে অন্যান্য শত্রুর নগর-রাষ্ট্র দখল করলেন। তার পর হাম্মুরাবি আকস্মিকভাবে নিজের সাম্প্রতিক মিত্র নগর-রাষ্ট্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা অধিকার করে নিলেন। এইভাবে ক্ষমতা ও কূটবুদ্ধির প্রয়োগে সমগ্র

২

১. লাগাশ শহরের নগরাধিপতির মূর্তি। খ্রী. পূ. ৩য় সহস্রাব্দ। **এধরনের মূর্তিনির্মাণ কিসের সাক্ষ্য দেয়?** ২. হাম্মুরাবির অনুশাসন-খোদিত স্তম্ভের একাংশ। দেবতা সম্রাটের হস্তে ক্ষমতাব প্রতীকস্বরূপ রাজদণ্ড অর্পণ করছেন। **সম্রাট তাঁর অনুশাসনের সাথে এজাতীয় ছবি প্রস্তরফলকে কেন খোদাই করার হুকুম দিয়েছিলেন, ভেবে বলো।**

মেসোপটেমিয়া সম্রাট হাম্মুরাবির পদানত হলো। ব্যাবিলনীয় সম্রাটের শাসনাধীনে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠলো। (২ নং রঙিন মানচিত্রে হাম্মুরাবির রাষ্ট্রসীমানা নির্দেশ করো।)

৪. হাম্মুরাবির অনুশাসন। সম্রাট হাম্মুরাবির আমলে আইনকানুনের **অনুশাসন** তৈরি করা হয়েছিল। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণকে এই অনুশাসনের নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হতো। এই অনুশাসনের আইনবলে লোকজনের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিত রাজকর্মচারী আমলার দল এবং সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘনকারীদেরও বিচার করতো। প্রতিটি অন্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কালো পাথরের একটি স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। দৈর্ঘ্যে স্তম্ভটি মানুষের দেহের চেয়ে বেশি। তার উপরে হাম্মুরাবির অনুশাসন খোদিত ছিল, এবং অনুশাসনের উপরিভাগে অঙ্কিত ছিল সম্রাটের মূর্তি। (৯৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অনুশাসনের বিষয়বস্তু পড়ো এবং প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ব্যাবিলনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, অবিকল মিশরীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোই এমন একটি শক্তি ছিল যার সাহায্যে দাসমালিকরা দরিদ্র ও দাসদের উপরে নিজেদের আধিপত্য

বজায় রাখতে পেরেছিল। এই রাষ্ট্রটি ছিল দাসমালিকদের স্বার্থে, অর্থাৎ দাসমালিক-রাষ্ট্র ছিল এটি।

হাম্মুরাবির অনুশাসন সংগ্রহ থেকে

অনুশাসনের ভিত্তিতে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে দাসদের অবস্থা সম্বন্ধে **কী** তথ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব? **ঋণ** পরিশোধ **কীভাবে** আইনের বলে অনিবার্য ছিল? **একই** প্রকার অপরাধের জন্য বিভিন্ন জাতীয় শাস্তি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতো? তাঁর আইনাবলী 'ন্যায়সঙ্গত' ও 'সর্বশ্রেষ্ঠ' ছিল—হাম্মুরাবির এই দাবির সাথে কি তুমি একমত?

'আমি, হাম্মুরাবি, দেবগণ কর্তৃক নির্ধারিত নেতা, সম্রাটদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমগ্র ইউফ্রেতিস অঞ্চলের বিজয়ী, আমি আমার দেশের কানে সত্য ও ন্যায়নীতির মন্ত্র দান করিলাম এবং জনগণকে দান করিলাম সমৃদ্ধি।

এখন হইতে:

যদি কোনো ব্যক্তি মন্দির বা সম্রাটের সম্পত্তি চুরি করে তো তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; চুরির মাল যাহার নিকট পাওয়া যাইবে তাহারও শাস্তি প্রাণদণ্ড।

যদি কোনো ব্যক্তি কাহারও দাস বা দাসী হরণ করে তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

যদি পলাতক দাসকে কেহ আশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

যদি কেহ কোনো দাসের দেহ হইতে উল্কি* মুছিয়া ফেলে, তাহার অঙ্গুলি কর্তন করা হইবে।

যদি কেহ অন্য কোনো ব্যক্তির দাসের মৃত্যুর কারণ হয়, তবে তাহাকে ঐ মৃত দাসের বিনিময়ে নিজের একজন দাস দিতে বাধ্য থাকিবে।

যদি কেহ অন্য কোনো ব্যক্তির ষণ্ডের মৃত্যুর কারণ হয় তবে তাহাকে ষণ্ডের বদলে ষণ্ড দিতে বাধ্য থাকিবে।

যদি কেহ ঋণজালে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহার স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা ৩ বৎসর দাসজীবন যাপন করিতে বাধ্য থাকিবে।

যদি কেহ নিজের সমতুল্য কোনো ব্যক্তির গণ্ডদেশে আঘাত করে তবে তাহার জন্য তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে।

যদি কেহ নিজ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির (অর্থাৎ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, পুরোহিত) গণ্ডদেশে আঘাত করে তবে তাহাকে গোচর্ম-নির্মিত চাবুক দ্বারা ৬০ বার বেত্রাঘাত করা হইবে।'

অনুশাসনের শেষে লেখা ছিল: 'আমি, হাম্মুরাবি, ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট, সূর্যদেবের নিকট হইতে এই আইনাবলী পাইয়াছি। আমার বচন অপূর্ব সুন্দর, আমার কর্ম তুলনারহিত...'

? ১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয়েছিল? প্রশ্নটি কঠিন মনে হলে স্মরণ করতে চেষ্টা করো—প্রাচীন মিশরেই-বা রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয়েছিল (§ ৮:১)।

২. তোমার সিদ্ধান্ত বলো: (ক) হাম্মুরাবির অনুশাসন কাদের স্বার্থ রক্ষা করেছিল?

* দাসদের গায়ে ছাপ মারা থাকতো; এই ছাপ দেখে জানা যেত তার পরিচয় ও তার মালিকের ঠাঁইঠিকানা।

(খ) ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের গঠনপ্রকৃতি কীরকম ছিল? তোমার উত্তর যুক্তি সহকারে প্রমাণ করো। ৩. নিজ ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য হাম্মুরাবি ধর্মকে কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন? ৪. বর্তমান পরিচ্ছেদ (§ ১৫) পাঠে রাষ্ট্র সম্বন্ধে নতুন কী তুমি জানতে পারলে?
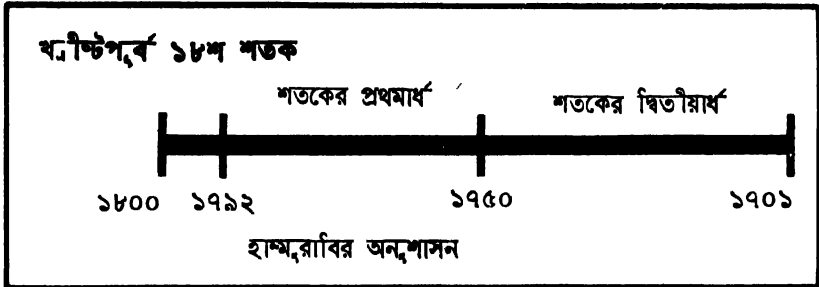
যুগপঞ্জী

উপরে মুদ্রিত নক্সা — 'খ্রীষ্টপূর্ব ১৮শ শতক' ভালোভাবে দেখ। তার মধ্যে শতাব্দীর প্রথম ও শেষ বৎসর লক্ষ্য করো। শতাব্দীর প্রথম বৎসর অপেক্ষা শেষ বৎসর কেন কম হলো, ব্যাখ্যা করো। শতাব্দীর প্রথমার্ধ খুঁজে বের করো: তা শুরু হচ্ছে ১৮০০ সালে আর শেষ হচ্ছে ১৭৫১-র পূর্বে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ তা হলে শুরু হচ্ছে কোন্ বৎসর থেকে আর তা শেষ হচ্ছে কোন্ বৎসরে গিয়ে?

নক্সাটিতে হাম্মুরাবির রাজত্বকাল নির্দেশ করা আছে। হিসাব করে দেখ, কত বৎসর তিনি রাজত্ব চালিয়েছিলেন? এখন থেকে কত বৎসর পূর্বে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল? এবং এখন থেকে কত বৎসর পূর্বে তা শেষ হয়েছিল? খ্রী. পূ. ১৭৯২ অব্দের পূর্ববর্তী বৎসর কোন্‌টি? এবং খ্রী. পূ. ১৭৯২ সালের পরবর্তী বৎসরই-বা কোন্‌টি? ব্যাবিলনে যখন হাম্মুরাবির রাজত্ব চলছে তখন মিশরে কী ঘটছিল? হাম্মুরাবির মৃত্যুর ২৩২ বৎসর পর ব্যাবিলন পার্বত্য জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়; হিসাব করে দেখ, কোন সালে তা ঘটেছিল।

§ ১৬. খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে মধ্য প্রাচ্য

(দ্র. ২ নং মানচিত্র এবং ১০১ পৃ. মানচিত্র)

মনে করতে চেষ্টা করো — খ্রী. পূ. ৪র্থ-২য় সহস্রাব্দে মধ্য প্রাচ্যের অধিবাসীদের নিকট কোন্ কোন্ ধাতু পরিচিত ছিল (§ ১৪: ৩,৪)।

১. লোহের ব্যবহার শুরু। খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষদিক থেকে খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের শুরুর ভিতরে মধ্য প্রাচ্যে **লোহের** ব্যবহার প্রচলিত হয়। পাথর এবং এ'টেল মাটির সংমিশ্রণে তারা উনুন তৈরি করে তার মধ্যে কাঠকয়লা ও
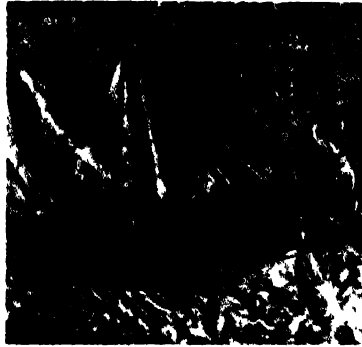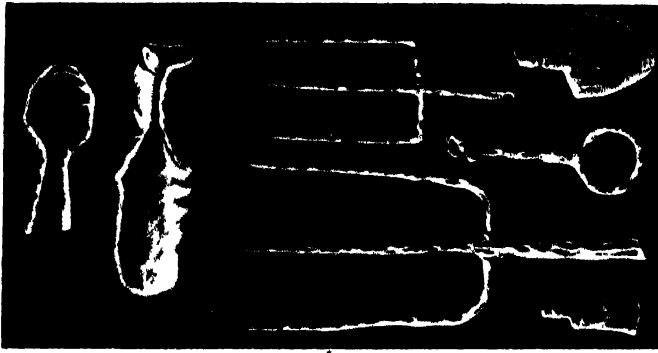
১. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দে লোহনির্মিত শ্রম-হাতিয়ার। **বলতে পারো কোন্ কোন্ কাজে এদের ব্যবহার করা হতো?** ২. শ্রম-হাতিয়ার সহ কৃষক। (প্রাচীন চিত্র।) ৩. ফিনিসীয় জাহাজ। (প্রাচীন চিত্র।) **মিশরীয় জাহাজের সাথে (৮৪ পৃষ্ঠার ১ম ছবি) তুলনা করো। দূর সমুদ্রপথে যাতায়াতের জন্য কোন্ ধরনের জাহাজ অধিকতর সক্ষম ছিল?**

লোহ আকরিক দিত। তার পর কাঠকয়লায় আগুন জেবলে কয়লা যাতে ভালভাবে জবলে সেজন্য হাপর টেনে হাওয়া দিত। কয়লার আগুনের তাপে ঐ আকরিক থেকে লোহা বেরিয়ে আসতো। কামারেরা তখন ঐ লোহা পেটাই করে টেকসই শ্রম-হাতিয়ার এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতো।

প্রকৃতিতে আমরা তামা এবং টিনের চেয়ে লোহ-আকরিকের সাক্ষাৎ বেশি পেয়ে থাকি। সেই কারণে লোহনির্মিত শ্রম-হাতিয়ার তামা বা ব্রোঞ্জের শ্রম-হাতিয়ার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিস্তৃতিলাভ করেছিল।

২. লোহ আবিষ্কারের তাৎপর্য। লোহার তৈরি লাঙ্গলের ফলায় নদী-অববাহিকার নরম মাটিই শুধু নয়, স্তেপ অঞ্চলের রুক্ষ কঠিন ভূমিও কর্ষণ করা সম্ভব ছিল।

লোহার বেল্চা ও কোদাল দ্বারা পাহাড়ী এলাকার পাথুরে মাটিতেও খাল খনন করা যেত; ফলে জমিতে জলসেচের জন্য পাহাড়ী নদী ও ঝর্ণাকে ব্যবহার করতে পেরেছিল কৃষকেরা। মধ্য প্রাচ্যের স্তেপ ও পাহাড়ী অঞ্চলে কৃষিকাজ ক্রমেই ব্যাপকাকারে বিস্তৃত হচ্ছিল। যেখানে পূর্বে শিকারীরা শিকার অন্বেষণ করতো বা পশুপালকরা পশুচারণ করে বেড়াতো সেখানে খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দে শস্যের সবুজ মাঠ ও ফলের বাগান দেখা দিলো। লৌহজাত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কল্যাণেই অত্যন্ত মজবুত জাহাজ ও পশুবাহিত গাড়ি নির্মাণ সম্ভব হয় এবং তাতে বাণিজ্য বিকাশের পথ সুগম হয়েছিল।

লৌহনির্মিত শ্রম-হাতিয়ার ব্যবহার করায় নিজেদের শ্রমে কৃষক ও কারিগর পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উৎপাদন করতে পেরেছিল — এখন থেকে তাদের শ্রম হয়ে দাঁড়ালো বেশি উৎপাদনশীল।

কৃষি ও হস্তশিল্পের উন্নতির সাথে সাথে দাসের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো, দাসের সংখ্যা বেড়ে গেল। মধ্য প্রাচ্যে দাসমালিকদের সমাজ দ্রুত গতিতে গঠিত হয়ে গেল। তার স্তেপ ও পার্বত্য অঞ্চলে নতুন নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হলো। বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূভাগে — ট্রান্স ককেশাস অঞ্চলে দেখা দিলো প্রথম রাষ্ট্র: **উরার্তু** রাজ্য।

৩. **ফিনিসীয় নাবিক।** কৃষি, পশুপালন ও হস্তশিল্প বিকশিত হয়ে ওঠার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের শুরুর দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে দ্রুত বহু সমৃদ্ধ নগরী গড়ে উঠেছিল। এসব শহরে নাতিবিপুল **ফিনিসীয়** (Phœnician) জাতি বসবাস করতো। ফিনিসীয় শহরগুলির মধ্যে সমৃদ্ধতম ছিল সমুদ্রোপকূলের অদূরবর্তী একটি দ্বীপে অবস্থিত **তির** নগরী।

ফিনিসীয়রা মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে দক্ষ নাবিক ও জাহাজনির্মাতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। শুধু সাগরেই নয়, তারা এমন কি আট্লাণ্টিক মহাসাগরও পাড়ি দিত। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী প্রায় সমস্ত স্থানেই ফিনিসীয় সওদাগরেরা তাদের সওদা নিয়ে বাণিজ্যে বেরুতো। মধ্য প্রাচ্য জিনিসপত্রের বিনিময়ে তারা স্থানীয় জিনিসপত্র কিনতো। তাদের বাণিজ্যের অন্যতম একটি উপকরণ ছিল দাস কেনা-বেচা। ফিনিসীয়রা দাস ক্রয় করতো, তদুপরি সমুদ্রোপকূলে এবং সমুদ্রে অন্যান্য জাহাজ থেকেও সম্ভব হলে লোকজন জোর করে ধরে রেখে দিত — উদ্দেশ্য, তাদেরও দাস হিসেবে বিক্রি করা। (দ্র. ৯ নং রঙিন ছবি)

ফিনিসীয়দের নৌ-বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরীয় বহু দেশে দাসমালিকদের সমাজ বিকশিত করতে সহায়তা করেছিল এবং সেখানে মধ্য প্রাচ্য সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করেছিল।
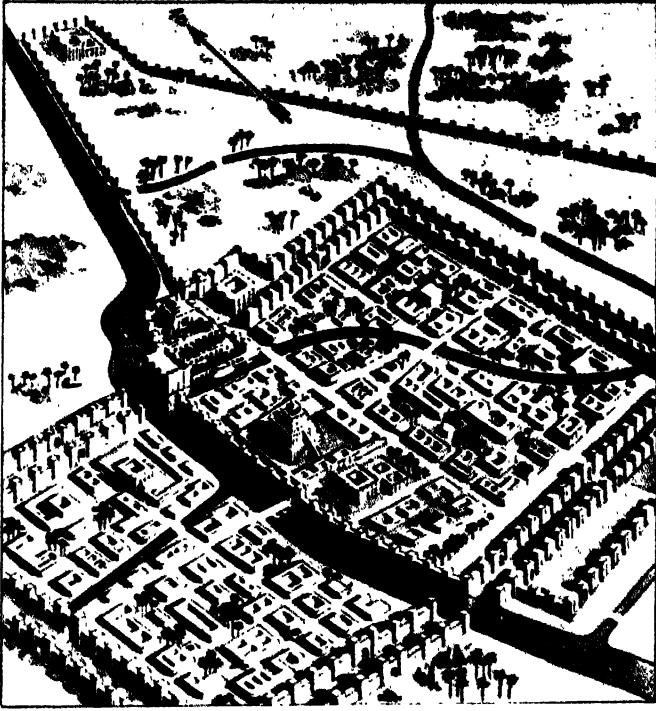
খ্রী. প্. ৬ষ্ঠ শতকে ব্যাবিলন। পুনঃকল্পিত মডেল (উপর থেকে এক নজরে দেখলে এরকম মনে হতো) ও নক্সা। পুনঃকল্পিত মডেলে রাজপ্রাসাদ, শূন্যোদ্যান (সিঁড়িময় ভবন যার উপরে মাটি ফেলে তার মধ্যে গাছ লাগিয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছিল) ও নক্সায় চিহ্নিত অন্যান্য স্থান দেখাও। (দ্র. অষ্টম রঙিন আলোকচিত্র)।
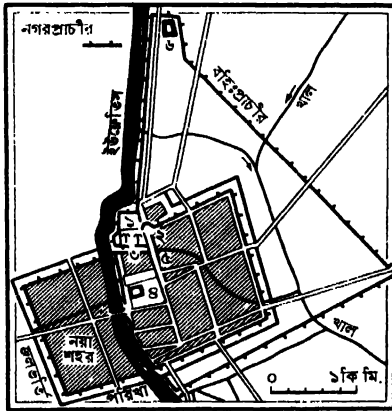
১) রাজপ্রাসাদ
২) প্রধান নগরতোরণ (ইশ্‌তার তোরণ)
৩) শূন্যোদ্যান
৪) মন্দির চূড়া (ব্যাবিলনের)
৫) রাজপথ
৬) সম্রাটের গ্রীষ্মপ্রাসাদ

ফিনিসীয় নগরসমূহ খুব বেশি কাল স্বাধীন থাকতে পারে নি; অচিরেই তারা শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশগুলোর পদানত হয়।
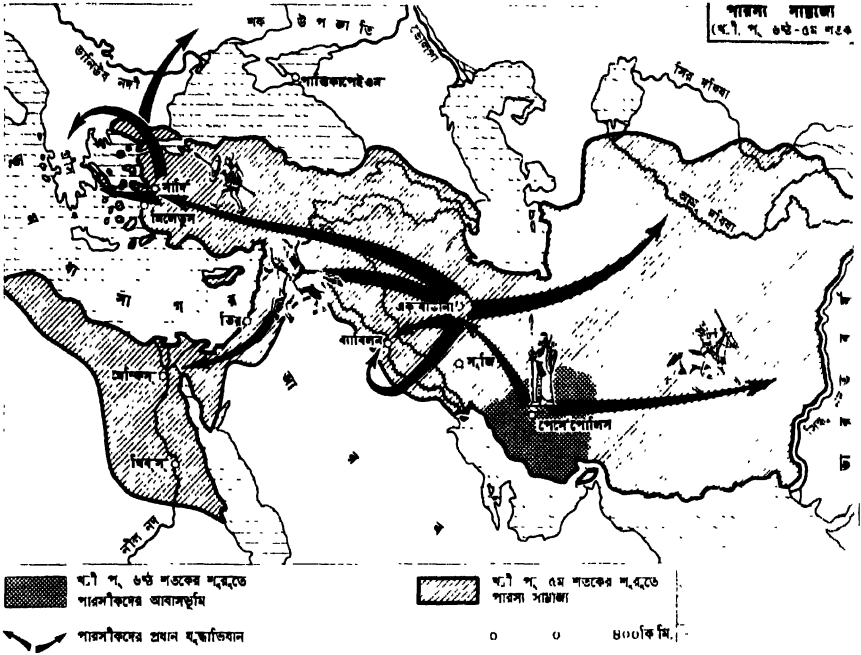
৪. পারসীক সম্রাটদের যুদ্ধাভিযান। মধ্য প্রাচ্যে একটার পর একটা বহু রা বৃদ্ধি পায়। খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতকে তাইগ্রিস নদের তীরে গড়ে উঠেছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র — **আসিরীয় সাম্রাজ্য**। তার পরে ব্যাবিলনীয় সম্রাটগণও খুব প্রাধান্য লাভ করে।

খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য প্রাচ্যে **পারসীক জাতি** তাদের যুদ্ধাভিযান শুরু করে। পারস্য উপসাগরের পূর্বদিকে খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে পারস্য রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। তাদের ছিল অপূর্ব অশ্বারোহী সেনা, লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ হিসেবেও তারা খ্যাতি অর্জন করেছিল। পারস্য সম্রাট **কিরোস** একের পর এক রাজ্য জয় করে চলেন। চতুষ্পার্শ্বে গভীর পরিখা ও দ্বিগুণ বিস্তৃত দুর্গপ্রাচীর বেষ্টিত ব্যাবিলন নগরী মনে হতো অজেয়। ব্যাবিলনীয় পুরোহিতরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নগর তোরণ খুলে দেয়। **খ্রী. পূ. ৫৩৮ অব্দে** ব্যাবিলন পারস্য কর্তৃক বিজিত হয়।

মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধাভিযান চলাকালে কিরোস শত্রুহস্তে নিহত হন। শত্রুরা তাঁর মাথা কেটে রক্তভর্তি চামড়ার থলিতে তা ফেলে দিয়ে বলেছিল: 'খুব রক্ত চেয়েছিলি, নে, যতক্ষণ না আশ মেটে ততক্ষণ খা।'

কিরোসের মৃত্যুর সাথে সাথে পারসীকদের যে যুদ্ধোন্মাদনা কেটে গিয়েছিল এমন নয়। শক্তিশালী পারস্য বাহিনী মিশরের উপরও আক্রমণ চালায়। ফারাওনের

১. বিদ্রোহ দমনের পর বিজয়ী প্রথম দারিউসের গৌরবে পর্বতগাত্রে খোদিত চিত্র। অভ্যুত্থানের নেতার বুকে পা রেখে দারিউস দণ্ডায়মান, আর বিদ্রোহের অন্যান্য নেতা বন্দী অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়ে। সম্রাটের পিছনে তার দেহরক্ষীকে দেখা যাচ্ছে। **২ নং মানচিত্রে খুঁজে বের করো— এই ছবি কোথায় রয়েছে। এই চিত্রের ভিত্তিতে পারসীক সম্রাটদের অমিতবিক্রম সম্পর্কে তুমি কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে?** ২. বিজিত দেশের জনগণের কাছ থেকে পারসীকদের খাজনা আদায়। (প্রাচীন চিত্র।) **ছবিতে নতুন পোষ-মানানো গৃহপালিত পশু কী দেখতে পাচ্ছ?**

সৈন্যদলের একাংশ তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মিশরীয় সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। **খ্রী. পূ. ৫২৫ অব্দে** পারসীকরা মিশর জয় করে।

৫. খ্রী. পূ. ৫ম শতকের প্রারম্ভে পারস্য সাম্রাজ্য। **সম্রাট প্রথম দারিউসের** সময়ে (খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ থেকে খ্রী. পূ. ৫ম শতকের প্রারম্ভ) পারস্য সাম্রাজ্য আয়তন ও শক্তিতে বিরাট আকার ধারণ করে। মিশর থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছিল।

সম্রাটকে বিশাল অঙ্কের খাজনা দিতে এবং নিজেদের জোয়ান ছেলেপিলেকে সম্রাটের সৈন্যদলে ভর্তি করাতে বাধ্য থাকতো বিজিত দেশের জনগণ। খাজনা আদায়ের পর শহর ও জনপদের চেহারা হতো শত্রুলুণ্ঠিত দেশের মতো। এর ফলে সম্রাটের কোষাগার ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, রাজপ্রাসাদে মাটির নিচে অজস্র কক্ষগুলো ভরে গিয়েছিল সোনার বাটে।

বিজিত জনগণের মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভ্যুত্থান ঘটতো। এই সব বিদ্রোহের সংবাদ সম্রাটের নিকট দ্রুত পৌঁছে যেত। পারস্যের রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়সওয়ারদের থানা গড়ে তোলা হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার 'যেন সারসের মতো দ্রুত উড়ে যেত' ঘোড়া ছুটিয়ে থানা থেকে থানায় আমলাদের পাঠানো খবর পৌঁছুতে; এইভাবে সংবাদ এসে পৌঁছুতো রাজধানীতে এবং এইভাবেই সম্রাটের আদেশও রাজধানী থেকে প্রচারিত হতো রাজ্যের সবখানে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাদল নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করতো। জনগণের প্রচণ্ড ঘৃণা সত্ত্বেও পারসীক সম্রাটরাই বিজিত দেশের উপর নিজেদের প্রতাপ অতি কষ্টে হলেও অক্ষুণ্ন রাখতো।

? ১. লোহের ব্যবহার শুরু হওয়ার পরে মধ্য প্রাচ্যে বিভিন্ন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো কেন? প্রশ্নটি কঠিন ঠেকলে একে তিনটি প্রশ্নে ভেঙে নাও: (ক) লোহা আবিষ্কারের পরই মানুষের শ্রম অধিক উৎপাদনশীল শ্রমে পরিণত হয়েছিল কী জন্য? (খ) শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হলো কেন? (গ) সমাজে শ্রেণীগঠন সম্পূর্ণতা পাবার পরই-বা কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল? ২. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দে ফিনিসীয় শহরগুলোর দ্রুত সমৃদ্ধিলাভের কারণ কী? ৩. মানচিত্রে (২ নং) পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা দেখাও। এর আগে এই এলাকায় তোমার পরিচিত যে সব স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল তাদের নাম বলো। ৪. প্রায় কত হাজার বৎসর ধরে পৃথিবীর মানুষ লোহা ব্যবহার করছে? ৫. কোন্ শতকে পারসীকরা ব্যাবিলন জয় করে, এবং সেই শতকের প্রথম না দ্বিতীয়ার্ধে? এবং সেই শতকের কোন্ চতুর্থাংশে? মিশরের বিরুদ্ধে পারস্যের যুদ্ধাভিযানের কত বৎসর পূর্বে পারসীকগণ ব্যাবিলন অধিকার করেছিল?

§ ১৭. প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের সংস্কৃতি

(মানচিত্র ২)

মনে করতে চেষ্টা করো—প্রাচীন মিশরে কীসের উপরে এবং কোন্ লিপিতে লোকে লিখতো (§১২: ৪); জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত সেখানে কীভাবে হয়েছিল (§১২: ১-৩)।

১. মেসোপটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য। মেসোপটেমিয়ার বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে একই ধরনের উঁচু উঁচু টিলার দিকে প্রত্নতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি পড়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসব স্থানে খননকার্য শুরু করা হয়েছিল। মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে তাঁরা প্রাসাদ, মন্দির ও দুর্গপ্রাকার সহ বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান। খননকার্যের ফলে প্রথম যে শহরটি আবিষ্কৃত হয় সেটি ছিল আসিরীয়দের। (দ্র. পঞ্চম রঙিন আলোকচিত্র)

খ্রী. পূ. ৭ম শতাব্দীর শেষদিকে শত্রুর আক্রমণে পরাক্রমশালী আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীন লেখকদের গল্প-কাহিনীতে বর্ণিত আসিরীয় নগরাবলীর ধ্বংস যে গালগল্প ছিল না, সত্যই ঘটেছিল — তার প্রমাণ মিললো এই খননকার্যের ফলে। মহা অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে নগরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তার চিহ্নও পাওয়া গেল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

আসিরীয় নগরসমূহের খননকার্য শেষ হলে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য প্রাচীন শহর নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলে।

২. আসিরিয়ার শিল্পকলা। মধ্য প্রাচ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত শিল্পনিদর্শনের মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলো আসিরীয় স্মৃতিসৌধ।

আসিরীয় সম্রাটদের রাজপ্রাসাদগুলো শহরের উঁচু জায়গায় তৈরি করা হতো; দাসদের দিয়ে কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করে সেগুলোর উপরে প্রাসাদ নির্মিত হতো।
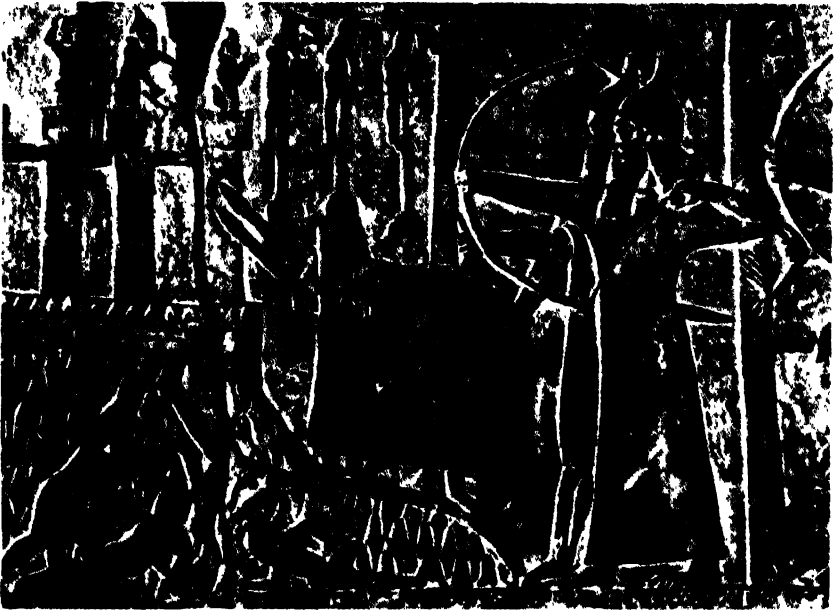
১

প্রাসাদের চারদিক ঘিরে থাকতো দুর্গপ্রাচীর। প্রাচীরের প্রবেশদ্বারে বিশালাকার প্রস্তর মূর্তি থাকতো: মূর্তিগুলোর দেহ ষাঁড়ের, পিঠের উপরে দুটি ডানা, আর মাথা মানুষের। (দ্র. ১০৭ পৃ. ১ নং ছবি।) প্রাসাদের ভিতরে সমস্ত দেওয়াল মোড়া থাকতো প্রস্তরফলকে, আর সেই প্রস্তরফলকে থাকতো পাথর কেটে কেটে তৈরি করা ছবি — **রিলীফ** (relief)। রিলীফে খোদিত ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হতো হয় দেব-দেবী, নয়তো যুদ্ধ সম্পর্কিত: আসিরীয় সৈন্যের যুদ্ধাভিযান, তাদের বিজয়, শত্রুদের নগর ধ্বংস, যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড বা দাস হিসেবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। সম্রাটের সিংহশিকার, সম্রাটের চিত্তবিনোদনের জন্য খাঁচায় বন্দী সিংহ — এসবও রিলীফে খোদাই করা হতো। শিকারীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া পশু কিংবা আহত পশুর মৃত্যু ইত্যাদি দৃশ্য অঙ্কনে আসিরীয় ভাস্করগণ অকল্পনীয় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিত।

৩. কীলকলিপি। আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভে খননের পরে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সেখানকার প্রাসাদে সম্পূর্ণ একটি 'গ্রন্থাগার' আবিষ্কার করেন। সেখানে প্রায় ২০ হাজার 'গ্রন্থ' সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হলেও গ্রন্থাগারের কোনো ক্ষতি হয় নি, কেন না ঐ সমস্ত 'বই' কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, ছিল এঁটেল মাটির ফলকের উপরে লেখা।

১. আসিরীয় 'রিলীফ', ভাস্কর্যনিদর্শনে নগর অবরোধের দৃশ্য। নগরপ্রাচীরের উপরে ক্ষমাপ্রার্থনারত মানুষ। আর প্রাচীরগাত্রে — নগরদ্বার ভাঙার জন্য চাকা সমেত ঢেঁকি। ঢেঁকির প্রান্তদেশ ধাতু দিয়ে মোড়াই করা। ডানদিকে—আসিরীয় যোদ্ধা: তাদের এক জনের মাথায় বিশেষধরনের শিরস্ত্রাণ, আর অন্য জন প্রমাণ আকারের ঢাল ধরে আছে—ঢালটি সরু সরু ডালপালা বুনে তৈরি। গাছের গুঁড়ি থেকে শূল তৈরি করে তাতে বন্দীদের ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিচে — নিহত যুদ্ধবন্দী। **ভাস্কর্যে খোদিত বিশালাকার আসিরীয় মূর্তি ও তাদের শত্রুদের মূর্তি ভিন্নভাবে খোদাই করার পিছনে ভাস্করের কোন্ মনোভাব কাজ করেছে বলে তুমি মনে করো? এই রিলীফে দর্শকদের উপরে কী প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া হয়েছে?**
২. সম্রাটের সিংহশিকার।

মেসোপটেমিয়ায় লিপির আবির্ভাব হয়েছিল খ্রী. পূ. ৪র্থ সহস্রাব্দে। এখানে পাপিরস ছিল না, তাই মৃত্তিকাফলকে তাদের লিখতে হয়েছিল। লিপিকরের পাশে থাকতো এঁটেল মাটির তাল, সেই মাটির তাল থেকে সে ছোটো ছোটো স্লেট বা মৃত্তিকাফলক বানাতো লিখবার জন্য। মাটি কেটে কেটে লেখা এই মৃত্তিকাফলক যাতে সহজে না ভাঙে, শক্ত ও টেকসই হয় তার জন্য হয় রৌদ্রে ফেলে রেখে তা ভালোমতো শুকানো হতো, নয়তো আগুনে পোড়ানো হতো।

মেসোপটেমিয়ায় প্রথম দিকে 'লিখতো' ছবি এঁকে এঁকে। কিন্তু মাটির উপর ছবি আঁকা তো শক্ত কাজ। সূচালো কাঠি দিয়ে মাটি কেটে তার উপরে অক্ষর দেগে দেয়া হতো বলে অক্ষরগুলো দেখতে হতো গোঁজ বা কীলকের ন্যায়। প্রায় হাজারখানেক ধরনের সংকেত চিহ্ন তারা ব্যবহার করতো। প্রতিটি অক্ষর কয়েকটি কীলকাকার সংকেত চিহ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠতো। সেই অক্ষরে কখনো বোঝা যেত সম্পূর্ণ একটি শব্দ, কখনো-বা শুধুমাত্র শব্দাংশ। (দ্র. ১০৭ পৃষ্ঠার ৪ নং চিত্র।) এই ধরনের লিপিকে বলা হয় **কীলকলিপি** বা কীলকাকৃতি লিপি (ইংরেজিতে বলে cuneiform — কিউনিফর্ম)। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া এই কীলকলিপির জন্মভূমি হলেও তা সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

বিশেষজ্ঞগণ কীলকলিপি সংগ্রহ করে তার পাঠোদ্ধার করে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন পুরাণকথা, অনুশাসন, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। নিনেভেতে আবিষ্কৃত কয়েকটি মৃত্তিকাফলকে বিশ্বসৃষ্টি ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত পুরাণ লিপিবদ্ধ ছিল (দ্র. § ১৪-র পরিশিষ্ট)। পাথরের উপর খোদিত হাম্মুরাবির অনুশাসনও রচিত হয়েছিল এই কীলকলিপিতে।

৪. **প্রাচীনতম বর্ণমালা।** লিপির বিকাশে সর্বাধিক দান ছিল ফিনিসীয়দের। বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে হিসাবনিকাশের জন্য দ্রুত লিখনপদ্ধতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল, অথচ চিত্রলিপি বা কীলকলিপিতে লেখা বেশ জটিল। মিশরীদের অভিজ্ঞতাকে তখন কাজে লাগালো ফিনিসীয়রা: মিশরীদের ছিল চিত্রলিপি-চিহ্ন, তাতে শুধু শব্দই বোঝাতো না, এমন কি আলাদা আলাদা ধ্বনি পর্যন্ত বোঝাতো। ফিনিসীয়রা **বর্ণমালা** আবিষ্কার করলো — ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণ; লেখার সময় তারা স্বরধ্বনি বোঝাবার জন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহার করতো না। বর্ণমালা তৈরি করার ফলে দ্রুতভাবে লেখা সম্ভবপর হলো, লেখা অভ্যাস করাও হলো সহজতর।

৫. **জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা।** মেসোপটেমিয়ায় স্কুলপাঠ্য গণিতের অনুশীলনী পুস্তক খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রদত্ত অনুশীলনমালায় বিভিন্ন আয়তনের ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের হিসাব করতে বলা হয়েছে; বলা হয়েছে — একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রৌপ্য পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যাতে প্রত্যেক ভাই তার ছোটো ভাইটির চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ রুপো বেশি পায়; প্রদত্ত ঋণের সুদের হিসাব বের করো, কিংবা পাহাড়ের ঢালুতে বিভিন্ন গভীরতা সম্পন্ন চারটি জলাধার নির্মাণ করতে কত জন লোকের কত দিন লাগবে হিসাব করে বলো। (এধরনের গণিত সংক্রান্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে তৎকালীন মেসোপটেমীয় জনজীবন সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি, ভেবে দেখ। অন্তত পক্ষে তোমার পাঁচটি সিদ্ধান্ত বলো। মেসোপটেমিয়ায় গণিতশাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত কী?)

চিকিৎসাপদ্ধতি সংক্রান্ত একটি ঔষধপঞ্জিকা কীলকলিপিতে ৪০টি মৃত্তিকাফলকে উৎকীর্ণ আছে।

ব্যাবিলনের পুরোহিতরা উঁচু মিনার থেকে জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতো। তারা সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ পূর্বাহ্ণেই বলতে সক্ষম হয়েছিল। বৎসরকে তারা মাস ও সপ্তাহে ভাগ করেছিল এবং দিনকে ঘণ্টা ও মিনিটে।

এতদসত্ত্বেও প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের জ্ঞান বর্তমান কালের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারেকাছেও আসতে পারে নি। ব্যাবিলনবাসীরা মনে করতো — আকাশ হলো চাঁদোয়া, তাতে যে সব জানলা আছে সেগুলো খুলে গেলেই তার ফাঁক দিয়ে মাটিতে বৃষ্টি পড়ে। সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ তারকাপুঞ্জকে তারা দেব-দেবী হিসেবে

ব	ক	স্
গ	ম	র
দ	ন	ত
হ	প	শ

১. দেহ ষাঁড়ের, পিঠের উপরে দুটি ডানা, আর মাথা মানুষের— আসিরীয়দের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী প্রাচীরের প্রবেশদ্বারে সংরক্ষিত বিশালাকার প্রস্তরমূর্তি। পাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হতো— ষাঁড়টা যাচ্ছে, আর সামনে থেকে মুখোমুখি দেখলে মনে হতো— দাঁড়িয়ে আছে। **ভাস্কর কীভাবে তা সম্ভব করেছিল?** ২. শিরস্ত্রাণ, ঢাল ও বক্ষাবরণ বর্মে সুরক্ষিত আসিরীয় যোদ্ধা। (প্রাচীন রিলীফ।) ৩. কীলকলিপিতে ভরা মৃত্তিকাফলক। ৪. কীলকাকৃতি লিপিচিহ্নের মর্মোদ্ধার: পাখি, লাঙ্গল ও পা। **ছবিগুলোর ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে লক্ষ্য করো।** ৫. ফিনিসীয় বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর।

সহস্রাব্দ	শতক	প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী
খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ	৩২শ		খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দের শেষভাগে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব
	৩১শ	খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩য় সহস্রাব্দে মিশরে সাম্রাজ্য স্থাপন	
তৃতীয়	৩০শ		
	২৯শ		
	২৮শ	খ্রীষ্টপূর্ব আনু. ২৬শ শতকে খেওপ্সের পিরামিড নির্মাণ	
	২৭শ		
	২৬শ		
	২৫শ		
	২৪শ		
	২৩শ		
	২২শ		
	২১শ		
দ্বিতীয়	২০শ		
	১৯শ		
	১৮শ	খ্রীষ্টপূর্ব আনু. ১৭৫০ অব্দে দরিদ্র ও দাস বিদ্রোহ	হাম্মুরাবির অনুশাসন: খ্রী. পূ. ১৭৯২-১৭৫০ অব্দ
	১৭শ		
	১৬শ		
	১৫শ	খ্রী. পূ. আনু. ১৫০০ অব্দে ৩য় তুৎমসের যুদ্ধাভিযান	
	১৪শ		
	১৩শ		
	১২শ		
	১১শ		
প্রথম	১০ম		
	৯ম		
	৮ম		
	৭ম		
	৬ষ্ঠ	৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্য কর্তৃক মিশর দখল	৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারস্য কর্তৃক ব্যাবিলন দখল

কল্পনা করতো। অসুখবিসুখের উপকারী চিকিৎসাপদ্ধতির ছাড়াও তারা 'টোটকা' বাতলে দিত, যেমন — ইঁদুরের জিভ, কুকুরের লোম, কিংবা ষাঁড়ের কান।

মধ্য প্রাচ্যেও ঠিক মিশরের মতোই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সংস্কৃতি — উদ্ভব হয়েছিল লিপির, বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার।

আসিরিয়ার যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে সমকালীন কাহিনী

আসিরীয় সৈন্যদল ও তাদের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে কী বলা সম্ভব? আকর ঐতিহাসিক রচনাদির লেখকদের সম্বন্ধেই বা কী বলা যায়?

আসিরীয় সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'দেখ, দেখ, ঐ তো ওরা যাচ্ছে দ্রুত ও অপ্রতিরোধ্য, কেউই ওরা অবসন্ন নয়, নয় নিদ্রাতুর। ওদের অশ্বের খুর অবিকল যেন পাথরে তৈরি, আর রথের চাকা — যেন ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা। ওদের হুঙ্কার যেন সিংহগর্জন। ওদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে এমন ক্ষমতা কারোর নেই।'

ট্রান্স ককেশাস অঞ্চলে আসিরীয় যুদ্ধাভিযান বিষয়ে বলা হচ্ছে: 'নদীর ন্যায় ওদের রক্ত আমি প্রবাহিত করে দিয়েছি পর্বতগহ্বরে, গিরিখাতে; স্তেপ ও সমতলভূমি আর পাহাড় আমি রঞ্জিত করেছি যেন লোহিত কম্বলে; শিবিরাগ্নির মতো জ্বালিয়েছি আমি আশপাশের জনপদ, আর খালের টাটকা পানীয় জলকে রূপান্তরিত করেছি জলাভূমিতে। সুন্দর সব ফলের বাগানে ঝটিকার মতো গিয়ে প্রবেশ করেছে আমার বাহিনী, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে লোহকুঠারের শব্দ... একটি শস্যমঞ্জরীও আমি অক্ষত ছেড়ে দিই নি।' (দ্র. ৮ নং রঙিন ছবি।)

আর নিনেভের পতন সম্বন্ধে: 'হে রক্তাক্ত, প্রতারিত, অরোধ্য লুণ্ঠনের শিকার হে নগরী, তোমার এ কী যন্ত্রণা! অশ্বারোহীর দল ছুটছে চতুর্দিকে, ঝলসে উঠছে কৃপাণ, ঝকমক করছে যুদ্ধকুঠার! নিহত অসংখ্য, মৃতদেহের সংখ্যা পর্বতাকার... নিনেভে বিধ্বস্ত! তার দুঃখে কাঁদার জন্য আর রইলো কে? যারা তোমার কথা শুনবে তারা উল্লসিত হবে তোমার দুর্ভাগ্যে: কেন না তোমার বিরুদ্ধে হিংসার ভাগীদার কে নয়, বলো?'

?

১. প্রাচীন শিল্পকলা দেখে মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি কী জানতে পারো?

২. মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন লিপির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল কেন?

৩. বিজ্ঞান বিষয়ে মিশরীদের সমতুল্য জ্ঞান মেসোপটেমিয়ায়ও কেন উদ্ভূত হয়েছিল?

৪. আসিরীয় ভাস্করদের শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর তুমি কীসে দেখতে পাচ্ছ?

*৫. চিত্রাদি ও লিখিত ভাষ্যের ভিত্তিতে আসিরীয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে যা জানতে ও বুঝতে পেরেছ তা বিশদভাবে বলো।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারত

§ ১৮. খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ

(দ্র. মানচিত্র ৩)

মনে করতে চেষ্টা করো—মানব সভ্যতার বিকাশে লৌহ আবিষ্কারের অবদান কতখানি ছিল (§ ১৬:২)।

১. ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতি। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ **ভারতবর্ষ**। ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ বলা হয় কেন না এর দক্ষিণাংশের তিন দিক সাগর পরিবেষ্টিত ও উপরের অংশ এশিয়া মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ডের সাথে মিশে গেছে।

চিরন্তন তুষারাবৃত **হিমালয় পর্বতমালা** ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ থেকে বাইরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ছিল দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকের গিরিপথের ভিতর দিয়ে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক (অর্থাৎ তিন দিকে জলবেষ্টিত উপদ্বীপ অংশ) প্রায় সবটুকুই মালভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চল তামা ও লোহায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দক্ষিণের এই মালভূমি অঞ্চল ও উত্তরে হিমালয়ের মধ্যবর্তী স্থান সমতলভূমি*। দেশের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত **সিন্ধু** নদ। আর পূর্বদিকে সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে **গঙ্গা** নদী। উভয়ের উৎপত্তিস্থল হিমালয়ে; পর্বতের উপরের তুষার যখন গলতে আরম্ভ করে তখন এ দুই নদীতেই বন্যা দেখা দেয়।

* ভৌগোলিক বর্ণনানুযায়ী ভারতবর্ষকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সমতলভূমিকে বলা হয় উত্তরাপথ এবং মালভূমি অঞ্চলকে দক্ষিণাপথ; এ দুয়ের মাঝখানে অবস্থিত বিন্ধ্যপর্বত এই প্রাকৃতিক বিভাগ এনে দিয়েছে। -- অনু.

উত্তরে গগনস্পর্শী হিমালয় পর্বত থাকায় উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস পর্বত ডিঙ্গিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছুতে পারে না, তাই শীতকালেও ভারতবর্ষের আবহাওয়া উষ্ণ থাকে। সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। এখানে শুষ্ক স্তেপ অঞ্চল চারদিকে বিস্তীর্ণ পড়ে আছে। আর গঙ্গা অববাহিকায় গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল জলাভূমি ও অরণ্যে পরিবৃত ছিল — ঘন বনজঙ্গল মানুষের অগম্য ছিল। সে এত বিশাল ও ঘন জঙ্গল যে দিনের বেলাতেও সূর্যালোক তার গভীরে পৌঁছুতো কম। চিতাবাঘ, বাঘ আর হাতিতে ভরা ছিল সেই অরণ্য; আর ছিল ভয়ানক বিষধর নানান জাতের সাপ যার কামড়ে মানুষ ও বন্য পশুর মৃত্যু ছিল অবধারিত।

২. ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর। ভারতবর্ষে মনুষ্যবসবাসের ইতিহাস কয়েক লক্ষ বৎসর প্রাচীন এবং এখানে আদিম মানবসমাজের বহু পদচিহ্ন পড়ে আছে। দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, একমাত্র খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দেই ভারতবর্ষীয় সমাজে সর্বপ্রথম শ্রেণীব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিন্ধু অববাহিকায় খ্রী. পূ. ৩য়-২য় সহস্রাব্দে বর্তমান কিছু নগরের* ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন।

সেই সব শহরের অনেক রাস্তাঘাট ছিল সরল, তার উপরে দ্বি-তল বা ত্রি-তল ঘরবাড়িগুলো ছিল ইঁটের তৈরি, বিভিন্ন কামরায় বিভক্ত ও অলংকরণে সমৃদ্ধ, আর ছিল বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা সমেত সুন্দর সব স্নানকক্ষ। আবার অন্যান্য রাস্তায় গরিব মানুষদের কুঁড়েঘর। শহরের উপরিভাগে উঁচু টিলার উপরে দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। আর দুর্গের অনতিদূরে ছিল বিশাল শস্যভাণ্ডার।

আহার্য ফসলের চাষ ছাড়াও এ অঞ্চলের লোকজন সিন্ধু অববাহিকায় তুলো চাষ করতো। ক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল খাল কেটে। অধিবাসীরা ছোটো-বড়ো নানা ধরনের পশু পালন করতো।

হস্তশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল শহর। তামা, ব্রোঞ্জ ও সোনা দিয়ে কারিগররা নানান রকম জিনিসপত্র প্রস্তুত করতো। এখানকার সুতীবস্ত্রের কদর মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

খননকার্যের ফলে পাথর ও হাড়ের তৈরি অনেক শীলমোহর খুঁজে পাওয়া

* এখানে মূলত মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার কথা বলা হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে আরো কিছু শহর খুঁড়ে বের করা হয়েছে, যেমন সিন্ধু এলাকায় কোট ডিজি, পাঞ্জাবে রূপার। সিন্ধু নদের ধারে করাচী থেকে ২ শ' মাইল উত্তরে মহেন-জো-দড়ো, আরো উত্তরে আধুনিক কালের লাহোর থেকে ১ শ' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইরাবতী নদীর ধারে হরপ্পা; দুই নগরের মধ্যে দূরত্ব ৪ শ' মাইল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এতদঞ্চলের সিন্ধু-সভ্যতার নাম দিয়েছেন 'হরপ্পা সংস্কৃতি'। সভ্যতার দিক থেকে তা ছিল দ্রাবির সভ্যতা। — অনু.

বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকে থাকা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন খাল। (আলোকচিত্র।) খালের উভয় পাশে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে।

গেছে। এসব শীলমোহরের উপরে গৃহপালিত পশুর মূর্তি এবং লেখার চিহ্নও খোদাই করা হতো। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে লিপির আবিষ্কার তখনো ঘটে ওঠে নি। সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান শুধু এই ক'টি জিনিসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে নগরবাসীরা নিজেদের নগর পরিত্যাগ করে চলে যায়। ইতিহাস আজ পর্যন্ত জানে না, কী কারণে এমনটি ঘটেছিল।

৩. ভারতবর্ষে আর্য আক্রমণ ও তাদের বসতি স্থাপন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে আর্য উপজাতিরা এসে ভারতে প্রবেশ করলো। এতদিন পর্যন্ত আর্যেরা ছিল পশুপালক **যাযাবর**। নিজেদের বলতে যা কিছু আছে সব নিয়ে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতো। যাযাবরেরা সাধারণত পশুপালক জাতিই হয়ে থাকে; পশুর চারণভূমি এক জায়গায় নিঃশেষ হয়ে গেলে পশুদের

খাদ্যান্বেষণেই তাদের অন্য জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। আর্যদের ছিল শিংওয়ালা বিভিন্ন পশু এবং ঘোড়া। এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে, তাদের কল্পিত প্রধান দেব-দেবীদের মধ্যে তারা সূর্যদেবকেও গণনা করেছিল, যে সূর্যদেব প্রতিদিন আকাশ পাড়ি দেন সোনার রথে চড়ে আর সে রথ টানে লাল টকটকে অগ্নিবর্ণ অশ্ব।

তারা তাদের পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করতো, তাকে বলা হতো **রাজা**। রাজা তার নিজের লোকজনদের নিকট থেকে দক্ষিণা গ্রহণ করতো।

সভ্যতাবিকাশের দিক থেকে সিন্ধু অববাহিকার সুপ্রাচীন নাগরিক জনগণের অনেক পিছনে পড়ে ছিল পশুপালক যাযাবর আর্যেরা। কোনো লেখ্য লিপি তাদের ছিল না। নিজেদের মধ্যে প্রচলিত গল্প-কাহিনী তারা মুখস্থ করে শ্রুতিতে ধরে রাখতো, বংশপরম্পরায় তা যুগ থেকে যুগান্তরে তা শ্রুতির মাধ্যমেই জিইয়ে রাখা হতো।

নিজেদের পশু নিয়ে ভারতবর্ষের স্তেপভূমির উপর দিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে যেতে আর্যেরা ভারতের অধিকাংশ স্থানেই ছড়িয়ে পড়লো। কৃষিকর্মে অভ্যস্ত হয়ে তারা যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে **গৃহস্থী** হয়ে গেল। দেশের আসল অধিবাসীদের সাথে তারা মিলেমিশে একসাথে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীরূপে বসবাস করতে লাগলো।

৪. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রা। প্রায় এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের সময় ভারতীয়রা লোহা আবিষ্কার করে তার ব্যবহার শুরু করেছিল।

লোহার কুড়ুল আর বেলচা হাতে সংগ্রামশীল মানুষের সামনে ঘন অরণ্যও হার মেনেছিল। প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীসমূহ ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে গঙ্গা অববাহিকার সমস্ত ভূমি কৃষিকর্মের উপযুক্ত করে তুলেছিল — গাছপালা কেটে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে, খাল খনন করে তারা অনাবাদী জমি আবাদ করা শুরু করলো। এ স্থানের আবহাওয়া ছিল উষ্ণ ও আর্দ্র আর মাটি ছিল উর্বর, ফলে ফসল জন্মাল প্রচুর।

তারা যে লাঙ্গল ব্যবহার করতো তার ফলা ছিল লোহার তৈরি। সেই লাঙ্গল আর লোহার বেলচা দিয়ে রীতিমতো কঠিন জমিতেও তার চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়েছিল। লাঙ্গল টানতো বলদে। এভাবে কৃষিকাজ চারদিকে খুব বিস্তৃত হয়ে পড়লো এবং এমন কি ভারতবর্ষের মালভূমি অঞ্চলেও।

গম, ধান, আখ আর তুলার চাষ করতো প্রাচীন ভারতবাসী। তুলা থেকে তারা যে সুতীবস্ত্র তৈরি করতো তা একদিকে যেমন ছিল টেকসই, অন্যদিকে তা এত সূক্ষ্ম ছিল যে পরিধেয় বস্ত্র ছোটো আংটির ভিতর দিয়ে গলিয়ে বের করে নেয়া যেত।

জমিতে ও ফলবাগানে জলসেচের জন্য তারা হস্তচালিত বিশেষ জল তোলার চক্র উদ্ভাবন করেছিল।

গৃহপালিত পশু ছাড়াও ভারতীয়রা বন্য পাখিকেও পোষ মানিয়েছিল। মুরগী প্রথমে বনচর ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম তাকে গৃহপালিত করা হয়।

বিশালদেহী পশু হাতিকেও পোষ মানিয়ে এদেশের লোক তাকে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো ব্যবহার করেছে: হাতি তাদের জন্য গাছ উপড়ে ফেলেছে, পিঠে মানুষ ও ভারি ওজনের বোঝা বয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও হাতি ব্যবহার করা হতো শত্রুবাহিনী পদভারে দলিত করে শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্য।

অশেষ শ্রম স্বীকার করে ভারতীয়রা স্বদেশের দাক্ষিণ্যভরা প্রকৃতিকে জয় করেছিল। সে প্রকৃতি উদার ছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে জয় করার পথে অজস্র অতর্কিত বিপদও ছিল পায়ে পায়ে।

? ১. প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভারতবর্ষ ও মিশরের মধ্যে কী কী ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বর্তমান? এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যই-বা কোথায়? ২. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশে প্রাচীন কালে প্রকৃতির অবদান কতখানি ছিল? প্রাচীন ভারতবাসীদেরকে কোন্ কোন্ ধরনের বাধাবিপত্তি জয় করতে হয়েছিল? সিন্ধু অববাহিকায় জনবসতি কেন গঙ্গা অববাহিকার পূর্বে গড়ে উঠেছিল? ৩. চিন্তা করে দেখ — খ্রী. পূ. ৩য়-২য় সহস্রাব্দে সিন্ধু অববাহিকায় সমাজে শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল কিনা। তোমার মতামত যুক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪. পশুপালক যাযাবর আর্য জাতি কী কারণে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতো? তাদের ধর্মবিশ্বাসে তাদের জীবনযাত্রার কোনো প্রভাব পড়েছিল কি? ৫. অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রাচীন ভারতবাসী কী সাফল্য অর্জন করেছিল?

§ ১৯. খ্রীষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দে ভারতে দাসমালিকদের রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

(দ্র. মানচিত্র ৩)

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন মিশরে দাসদের কী বলা হতো (§ ৭:২); প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের লক্ষণ ছিল কী, অর্থাৎ কী কী লক্ষণ দেখে বোঝা যেত দেশটিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে?

১. শ্রেণীর উদ্ভব। ভারতবর্ষীয় জনগণের শ্রমের ফসল ভোগ করতো রাজা, পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দল। তারা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক গৃহপালিত পশুশাবক ও উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ গ্রহণ করতো। বহু সময়ই এরকম ঘটতো: চাষীরা জমিতে হাল চাষ করতো কিংবা অন্য কোনো কাজকর্ম, আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অশ্ববাহিত রথে ভ্রমণে বেরুতো, শিকার করতো, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করতো।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে গণ্য করতো; দাসদের 'ভিনদেশী' ও 'শত্রু' হিসেবে দেখা হতো। পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে দাসদের ক্ষেতেখামারে খাটানো হতো জমি পরিষ্করণ ও চাষ-আবাদের কাজে, তারা দাসমালিকদের বাড়িতে ভৃত্য হিসেবেও খাটাখাটুনি করতো।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ছিল দাসমালিক, তারা গোষ্ঠী-চাষী এবং দাসদের সর্বতোভাবে শোষণ করতো।

২. রাষ্ট্রের উদ্ভব। কৃষক ও দাসদের পদানত রাখার জন্য রাজারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধা সংগ্রহ করতো।

সংগৃহীত যোদ্ধাদের নিয়ে তারা পরে **সৈন্যবাহিনী** গঠন করলো।

দাস পরিদর্শকরা উন্নীত হয়ে গেল **প্রহরীতে।**

আর রাজার ভৃত্যদল যারা ফসল ও পশুসম্পদ সংগ্রহ করতো প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীগুলো থেকে তাদের **আমলা** পদে অধিষ্ঠিত করা হলো; এদের কাজ ছিল কর সংগ্রহ ও বিচার করা।

নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত রাজা ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো **সম্রাট**; তার এই ক্ষমতা ও পদ হয়ে গেল পুরুষানুক্রমিক।

এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দে সম্রাট, সৈন্যদল, প্রহরী ও আমলাবর্গ ইত্যাদি নিয়ে উদ্ভব হলো রাষ্ট্রের।

নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষা করার জন্য যে রাষ্ট্রের দরকার তা দাসমালিকেরা বুঝতে পেরেছিল। তারা বলতো: 'যদি সম্রাটকে টিকিয়ে রাখা না হয়, তা হলে ধনী ব্যক্তিরা নিহত ও একেবারে উৎখাত হয়ে যাবে।' শোষিতের উপরে নিজেদের পূর্ণ আধিপত্য জোরদার করার জন্য একইভাবে তারা ধর্মকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল।

৩. সমাজে বর্ণভেদ প্রথা। ভারতবর্ষে মনে করতো **ব্রহ্মা** পৃথিবী এবং মানুষের সৃষ্টিকর্তা। সেজন্য ভারতীয় পুরোহিতদের নাম **ব্রাহ্মণ।**

ব্রাহ্মণরা প্রচার করেছিল যে, ব্রহ্মা নিজ শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ (সেজন্য তারা দেবতার পক্ষ থেকে কথা বলতে পারে), হাত থেকে সৃজিত হয়েছে ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধা শ্রেণী), উরু থেকে বৈশ্য (অর্থাৎ বণিক শ্রেণী), আর পদযুগলের ময়লা থেকে শূদ্র (অর্থাৎ ভৃত্য শ্রেণী)। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণদের কথা সত্যি হলে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই মনুষ্যজাতিকে চতুর্বর্গে বিভক্ত করে মর্তে পাঠিয়েছেন। এই বর্ণভেদ প্রথাও বংশানুক্রমিক — ব্রাহ্মণের সন্তান হবে ব্রাহ্মণ, আর শূদ্রের সন্তান হবে সবসময়েই শূদ্র। যে বর্ণ হিসেবে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে বর্ণে থেকে জীবন অতিবাহিত করাই তার নিয়তি।

শূদ্রদের জীবন ছিল অতি কষ্টের, কিন্তু তার চেয়েও কষ্টের ও লাঞ্ছনার জীবন ছিল তাদের যারা ছিল **অচ্ছুৎ**। অচ্ছুৎ গণ্য করা হতো তাদের যারা এই চতুর্বর্ণের কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। মনে করা হতো, এদের গাত্র স্পর্শ করা মাত্রই কোনো লোক অপবিত্র হয়ে যায়। অচ্ছুতের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত থেকেই অশুচি ভাবতো লোকে। অচ্ছুৎরা সবচেয়ে কঠিন ও নোংরা কাজ করতে বাধ্য থাকতো, যেমন ধরা যাক — নোংরা আবর্জনা, মলমূত্রাদি পরিষ্কার ও মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ।

বিভিন্ন বর্ণভুক্ত লোকজনের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কাজ ও আচার-ব্যবহারের নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছিল; বলা হতো, ঈশ্বরই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনিই আবার, ব্রাহ্মণদের প্রচার অনুযায়ী, সম্রাট ও ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধাশ্রেণী) সৃষ্টি করেছেন যাদের কাজ হলো ঐ নিয়ম ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখা এবং পুরোহিত ও দাসমালিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য রক্ষা করা। নিয়মলঙ্ঘন-কারীদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো।

দাসমালিকদের রাষ্ট্রের সমর্থন জোগাতো ধর্ম, আর রাষ্ট্রও টিকিয়ে রাখতো ধর্মকে।

৪. **মৌর্যযুগে ভারতবর্ষের সংহতিসাধন।** প্রথমে আর্যেরা রাষ্ট্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল গঙ্গা অববাহিকার উর্বর ভূমিতে। তার পরে অবশ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রথমদিকে সব রাষ্ট্রেরই আয়তন ছিল ক্ষুদ্র। এক-মাত্র উত্তর ভারতেই তাদের সংখ্যা ছিল বহু।*

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সব সময়েই প্রায় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো; উদ্দেশ্য — অন্য রাষ্ট্রের জমি, দাস ও ধনসম্পদ অধিকার করে নেওয়া। এর ফলে অনেক রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যেত, আবার তাদের ধ্বংসের ফলেই অন্যান্য রাষ্ট্র আরো বড়ো ও শক্তিশালী হয়ে উঠতো।

খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে **মগধ** রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে। গঙ্গা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং তৎসংলগ্ন আরো দূরবর্তী স্থানে মগধের রাজারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। মগধ রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল **পাটলিপুত্র**, বর্তমানে আমরা যাকে বলি **পাটনা।**

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের শেষভাগে যখন রাজ্যটি **মৌর্য বংশের** অধীনে চলে আসে তখন থেকে মগধের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করছিল। প্রাচীন বর্ণনায় দেখা যায় মৌর্যদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল: প্রমাণ আকারের

* উত্তর ভারতে বৃহদায়তন প্রভাবশালী রাষ্ট্রই ছিল ১৬টি, ছোটো ছোটো রাষ্ট্র ছিল তো আরো অনেক বেশি। — **অনু.**

বিশাল তীর-ধনুক, ঢাল ও তরবারে সুসজ্জিত ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং ৯ হাজার হস্তীসেনা।

মগধের সিংহাসনে আসীন মৌর্য বংশের তৃতীয় রাজা সম্রাট **অশোকের** সময়ে খ্রী. পূ. ৩য় শতাব্দীতে, এই রাষ্ট্রটি সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

মৌর্য সাম্রাজ্য আয়তনে বিশালত্ব লাভ করলেও তা চিরস্থায়ী হয় নি। অশোকের শাসনের শেষদিক থেকেই এই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং খ্রী. পূ. ২য় শতকের প্রারম্ভে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এর ৫০০ বৎসর পরে যদিও ভারতবর্ষে পুনরায় আরেকটি সাম্রাজ্য* গঠিত হয়েছিল, তথাপি আয়তনে অশোক সাম্রাজ্যের বিস্তার তা কখনো লাভ করে নি।

মৌর্যদের সাম্রাজ্য গঠন এবং তার ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি সাধনে এবং অন্যান্য দেশের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

ব্রাহ্মণদের সমাজ-নীতি

নিম্নবর্ণিত পাঠের ভিত্তিতে প্রমাণ করো যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষে মানুষে বৈষম্যকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল ধর্ম। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণরা কী ব্যাখ্যা দিয়েছিল? এরকম ব্যাখ্যা প্রদান করাই তাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল কেন?

শরীরের সর্বোত্তম প্রত্যঙ্গ থেকে উৎপত্তি লাভের ফলেই একজন হয় ব্রাহ্মণ — সারা পৃথিবীর প্রভু। ব্রাহ্মণের যদি কিছু ভাল লাগে, বিনা খেদে তাকে তা প্রদান করা উচিৎ।

ঈশ্বর শুধুমাত্র একটি কর্তব্য সমাধার জন্যই শূদ্রদের নির্দেশ দিয়েছেন: বিনয়াবনত চিত্তে তোমাপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করো।

ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে ক্ষত্রিয় কখনো সাফল্য লাভ করে না এবং ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণেরও কোনো সাফল্য নেই।

বিশ্ব রক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজা এবং ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি করেছেন।

উচ্চ বর্ণদের সম্পর্কে যদি কোনো শূদ্র অপমানজনক বাক্য বলে, তার মুখ উত্তপ্ত লোহপিণ্ড পুরে বন্ধ করে দাও। ব্রাহ্মণের সাথে তর্করত শূদ্রের মুখ ও কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিতে সম্রাটই আদেশ দেবেন।

শূদ্র ব্রাহ্মণকে হাত বা যষ্ঠি দ্বারা প্রহার করার চেষ্টা করলে শূদ্রটি হাতটি কেটে ফেলার জন্য যোগ্য হয়, রাগান্বিত হয়ে পা দিয়ে আঘাত করলে, তার পা কেটে ফেলা উচিৎ।

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের স্থলে মস্তক-মুণ্ডনই চরম শাস্তি।

* এখানে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন আনুমানিক ৩১৯-৩২০ খ্রীষ্টাব্দে। — অনু.

? ১. প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল কেন? ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানো বলো। ২. ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী? এরকম কি আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল? যুক্তি সহকারে তোমার বক্তব্য সপ্রমাণ করো। ৩. ভারতবর্ষে রাষ্ট্র কী কারণে ধর্মের সমর্থন জোগাতো? ৪. ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি সাধনে মৌর্য সাম্রাজ্য কীরকম অবদান রেখেছিল ভেবে বলো।

§ ২০. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

(দ্র. মানচিত্র ৩)

মনে করতে চেষ্টা করো—প্রাচীন যুগে মিশর ও মধ্য প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চায় কীরকম সাফল্য অর্জন করেছিল (§ ১২ ও § ১৭)।

১. প্রাচীন ভারতবর্ষের পাটলিপুত্র নগরী ও অন্যান্য শহর। খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে বহু শহর গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য ছিল পাটলিপুত্র। গঙ্গা তীরবর্তী এই শহর আয়তনে নদীতীর বরাবর কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। গভীর পরিখা ও ৬৪টি তোরণ সমেত বিরাট দুর্গপ্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল পাটলিপুত্র নগরী।

নগরের কেন্দ্রস্থলে ছিল বিশালাকার স্তম্ভ, পাথরের উপরে কারুকার্য এবং মূর্তিতে সজ্জিত রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের সৌন্দর্য ও অলংকরণ দেখে সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত পারস্য রাজদরবার থেকে আগত ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল।

বহু শহর নক্সা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং রাস্তাঘাট ছিল সরল। শহরকে কেন্দ্র করে হস্তশিল্প বিকশিত হয়ে উঠেছিল। নগরের সমস্ত এলাকাতেই কাজ করতো বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর: গজদন্ত, পাথর ও কাঠের উপরে অলংকরণরত খোদাইকর, তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার ইত্যাদি। কারিগরগণ বিশেষ-ভাবে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো এবং তাদের কোনো কর দিতে হতো না।

পাটলিপুত্র থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে এমন কি অন্যান্য দেশে যাবার জন্যও প্রশস্ত সড়ক ছিল। এবং সেই পথের পাশে পথিকদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবধানে কূপ খনন করা হয়েছিল।

পাটলিপুত্র ও ভারতের অন্যান্য শহর শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থান রূপে পরিগণিত হতো।

২. শিক্ষাদীক্ষা, লিপি ও গণিতশাস্ত্র। কৃষিব্যবস্থা ও হস্তশিল্পের বিকাশ এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে খ্রী. পূ. ৩য়-২য় সহস্রাব্দের অবলুপ্ত লিপির বদলে নতুন লিপি দেখা দিলো। ফিনিসীয় বর্ণমালার ভিত্তিতেই ভারতীয় তাদের লিপি আবিষ্কার করেছিল। লিপিতে ব্যবহৃত এক ধরনের বর্ণমালা শুধুমাত্র

ধ্বনি বোঝাতো, আর অন্যগুলো বোঝাতো সম্পূর্ণ সিলেব্‌ল্ বা শব্দাংশ। তালপাতা কেটে শুকিয়ে তার উপরে লেখা হতো।

ঘরবাড়ি এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার নক্সানুযায়ী সুষ্ঠু নির্ভুল নির্মাণ, কোনো ভুলত্রুটি ছাড়া অত্যন্ত জ্যামিতিক নিয়ম মাফিক খাল খনন ইত্যাদি দেখে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ভারতীয়রা জ্যামিতিতে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল।

গণিতশাস্ত্রে **শূন্যের** অবদান প্রাচীন ভারতবাসীর। শূন্য আবিষ্কারের ফলে সংখ্যাবাচক মাত্র দশটি অক্ষর দিয়ে সব রকম হিসাবপত্র করা একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল। শূন্যসহ এধরনের হিসাবপদ্ধতি বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। ইউরোপে সংখ্যাবাচক অক্ষরের এই ধারণাকে জানে আরবের অবদান হিসেবে, কেন না ইউরোপ তা জেনেছিল আরবী গণিতের মাধ্যমে, কিন্তু আরবীয়রা যে তা আবার ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছিল তা তারা নিজেরাই উল্লেখ করে গেছে।

শহরের মধ্যে বিদ্যালয় ছিল; সেখানে প্রাথমিক পাঠাভ্যাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়ন চলতো। তবু সমাজে বর্ণভেদ থাকার জন্য ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসার লাভ করতে পারে নি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রচুর বিদ্বান ব্যক্তি পাওয়া যেত, কিন্তু শূদ্র ও অচ্ছুৎদের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বারই যে ছিল বন্ধ। অচ্ছুৎদের এমন কি শহরের ভিতরে বসবাস পর্যন্ত করতে দেওয়া হতো না।

৩. **চিকিৎসাশাস্ত্র**। শুধু পাটলিপুত্রেই নয়, প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শহরেও চিকিৎসাকেন্দ্র ও চিকিৎসাশালা ছিল; চিকিৎসক হতে হলে সাত বৎসর ধরে অধ্যয়ন করতে হতো। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন, বহু ঔষধপত্র জানতেন। ভারতবর্ষ থেকে কিছু ঔষধপত্র বিদেশেও পাঠানো হতো। এতদসত্ত্বেও রোগ সারানোর ব্যাপারে সুদূর অতীতের প্রথাগুলোও বিদায় হয় নি চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডী থেকে — **ওঝা** ও **তন্ত্রমন্ত্রসাধকদের** ডাক পড়তো রোগীর দেহ থেকে অশুভ আত্মা, ভূত-প্রেত তাড়িয়ে রোগীকে সুস্থ করার জন্য। কবিরাজ রোগীকে ঠিকই ওষুধ দিয়েছে, কিংবা ভালভাবে শল্যচিকিৎসা করেছে, তবু তার সাথে রোগবালাই দূর করার মন্ত্রও বিড়্‌বিড়্ করে বলা চাই। সেজন্যই 'গুণীন' শব্দটি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

৪. **সাহিত্য**। লিপি আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষে বিগত কয়েক শত বৎসর ধরে যুগ থেকে যুগে পুরুষানুক্রমে শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা গাথা, কবিতা, পুরাণ সমস্ত কিছু লেখ্য রূপে ধরে রাখা এতদিনে সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন ভারতবাসী যে সব গাথা, গান গাইতো তা থেকেই ছেঁকে তুলে নেয়া হয়েছিল বিশালাকার দুই মহৎ কাব্য: 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'।

১. খ্রী. পূ. ১ম শতকে নির্মিত একটি মন্দিরের অভ্যন্তর। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কোথায় বলা হয়েছে খুঁজে বের করো। ২. খ্রী. পূ. ৩য় শতকে প্রস্তরনির্মিত অশোকস্তম্ভের শীর্ষদেশে চারটি সিংহমূর্তি। বর্তমানে ভারতবর্ষে এটি রাষ্ট্রীয় প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। ৩. খ্রী. পূ. ১ম শতাব্দীতে নির্মিত একটি মন্দিরের তোরণদ্বার। পাথরে তৈরি এই তোরণের উপরে খোদিত নক্সা দেখতে কারুকার্যময় সূচীশিল্প বা লেসের মতো। অলংকৃত নক্সার মধ্যে মানুষ, পশু ও বৃক্ষলতাদির মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।

'মহাভারত' কাহিনীর ভিত্তিমূলে অবশ্য যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা বিদ্যমান। ঘটনাটি দুই রাজপরিবারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। ভারতবর্ষীয় কবিগণ ঘটনাটি কবিতায় বিবৃত করার সাথে সাথে তার সঙ্গে মিশিয়েছেন অসম্ভব কল্পনার অপরূপ অলংকরণ। ('মহাভারতের' কাহিনীর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ২০ম পরিচ্ছেদের অন্তিমে দেওয়া হয়েছে)।

'রামায়ণে' বর্ণিত হয়েছে রাজকুমার রামের কাহিনী। রামকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তাঁর পত্নী অন্য এক অসৎ রাজার বন্দিনী হন। রাম বানরদের নিয়ে একটি বানর (হনুমান) সেনাবাহিনী ও ভল্লুক (জাম্ববান) বাহিনী গঠন করে তাঁর শত্রুর রাজ্য শ্রীলঙ্কা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাম শত্রুকে নিহত করে পত্নীকে মুক্ত করেন এবং তাঁকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

২

৩
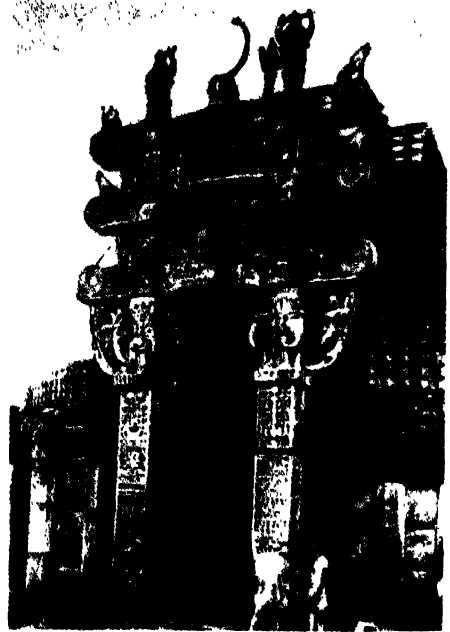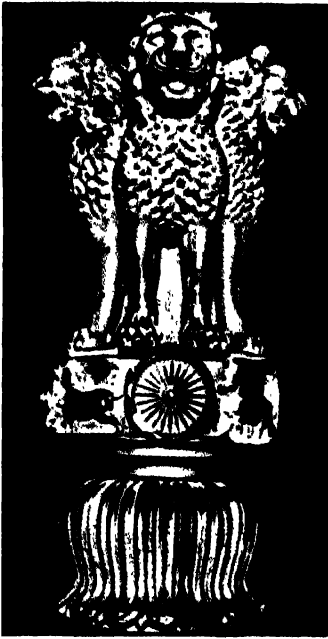
এ দুই মহাকাব্য ছাড়াও ভারতীয়রা বহু উপাখ্যান, নীতিগল্প এবং অন্যান্য নানা ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল। নীতিগল্পে লোভ, মূর্খতা ও চাটুক্তিকে অত্যন্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন ধরা যাক, একটি নীতিগল্পে বলা হয়েছে—ঠোঁটে খাবার নিয়ে একটি কাক গাছের ডালে বসে আছে, এমন সময় এক ধূর্ত শৃগাল এসে কাকের সুন্দর কণ্ঠস্বরের মহাপ্রশংসা শুরু করে দিলো; নির্বোধ কাক তখন খুশি হয়ে যেই গান শোনাবার জন্য কা-কা ডেকে উঠেছে অমনি তার মুখের খাবার নিচে পড়ে গেল। এই নীতিগল্প অন্য আরো অনেক নীতিগল্পের মতোই রাশিয়া সহ পার্শ্ববর্তী বহু দেশে প্রচলিত নীতিকাহিনীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত নানান জাতীয় ধর্মবিশ্বাস তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আবার নাস্তিক ও আত্মার অবিনশ্বরতায় অবিশ্বাসী, যারা ভূত-প্রেত ও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করতো না এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। 'ঈশ্বর নেই, তাকে নিয়ে যতো গালগল্প—সব মিথ্যে'—সাহস করে এরকম কথা তারা বলতে পেরেছিল।

৫. ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প। ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীনতম লিপি যেমন পরে অবলুপ্ত হয়েছিল তেমনি সেখানকার প্রাচীনতম নগরসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর বহুকাল আর সেখানে প্রস্তরনির্মিত কোনো ভবন গড়া হয় নি। কাঠের তৈরি

ঘরবাড়ি, মূর্তি ইত্যাদি যা কিছু ছিল তা আমাদের কাল অবধি টিকে থাকে নি। পাথরের তৈরি ভবনাদির সাক্ষাৎ পাই পুনরায় খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকে এসে, যখন ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, তার পরে। অশোকের শাসনকালে বিশেষভাবে বাড়িঘর, স্তম্ভ ও মূর্তি ইত্যাদি নির্মিত হতে থাকে।

সম্রাট অশোকের নির্দেশক্রমে খ্রী. পূ. ৩য় শতকে অনেক সুউচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল তাঁর শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতীক হিসেবে। প্রতিটি স্তম্ভই একটিমাত্র বিশাল প্রস্তরখণ্ড থেকে কেটে বের করে নেয়া হয়েছে। এধরনের একটি স্তম্ভের উপরে প্রস্তরনির্মিত চারটি সিংহমূর্তি দণ্ডায়মান। তারা চার দিকে মুখ করে আছে; দেখে মনে হয়—সিংহ চতুষ্টয় যেন প্রহরী, সাম্রাজ্যের সীমানা রক্ষা করছে।

খ্রী. পূ. ১ম শতকে পাথর কেটে একটি মন্দিরতোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটি অদ্যাবধি এক অপরূপ শিল্পসৃষ্টি রূপে বিখ্যাত হয়ে আছে। তোরণগাত্রে যে সব ভাস্কর্যমূর্তি খোদিত তাতে ভারতবর্ষের বনজ ও পশু সম্পদ, পুরাণ কাহিনীর কুশীলব এবং মন্দিরতোরণ ও স্থানীয় জনগণের জীবনের রক্ষয়িত্রী বিভিন্ন দেবীমূর্তি বর্তমান।

প্রাচীন ভারতবর্ষে কিছু মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করে তার মধ্যে। খ্রী. পূ. ১ম শতাব্দীতে নির্মিত গুহামন্দিরে দেয়াল বা গুহাগাত্রের পাশাপাশি আয়নার ন্যায় চকচকে ও মসৃণ স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগের দেয়াল কেটে বানানো জানালা দিয়ে শুধু বাইরের আলো এসে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অস্পষ্ট আলোকে দেয়ালগাত্রের প্রস্তরমূর্তি—মানুষজন ও পবিত্র পশু—যেন শরীরী আকার ধারণ করে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ এমন সুকৌশলে গঠিত হয়েছিল যে প্রার্থনাকারীদের মনে ঈশ্বরের সম্পর্কে ভয় ও তাঁর শক্তিতে বিশ্বাস জাগতো।

দাবা খেলার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। পুরাকালে পশুর হাড় কেটে ভারতীয় যোদ্ধামূর্তি তৈরি করা হতো। একেবারে সামনে থাকতো পদাতিক বাহিনী—বোড়ে। মধ্যিখানে থাকতো রাজা এবং সেনাপতি। পাশে—হস্তীযূথ, তার পিছনে অশ্বারোহী দল। প্রান্তদেশে থাকতো নৌকা। ভারতে দাবা খেলাকে বলা হতো 'চতুরঙ্গ'—অর্থাৎ চার ধরনের সৈন্য নিয়ে যে খেলা খেলতে হয়।

৬. প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্ক। খ্রী. পূ. ৩য়-২য় সহস্রাব্দের ন্যায় দূর অতীতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা সিন্ধু অববাহিকার নগরাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা, পশুপালন ও হস্তশিল্পের উন্নতির সাথে সাথে, বড়ো বড়ো শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষাদীক্ষার বিস্তৃতিলাভের ফলে সেই সম্পর্ক আবার বেড়ে ওঠে এবং গভীরতর হয়। সাগরতীরবর্তী শহরগুলো থেকে জাহাজ

ভেসে যেতো পশ্চিম দিকে—মেসোপটেমিয়ায় ও মিশরে, পূর্বদিকে গিয়ে পৌঁছুতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, যেতো শ্রীলঙ্কা দ্বীপে, যেতো চীনদেশে। ভারবাহী পশুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে ক্যারাভান পার্বত্য গিরিপথ দিয়ে চলে যেতো মধ্য এশিয়ায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। সূক্ষ্ম বস্ত্র, বহুমূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত এবং ভারতীয় অন্যান্য বিলাসদ্রব্য এমন কি ইউরোপেও সাদরে গৃহীত হয়েছিল। বিদেশ ও ভারতের মধ্যে যাওয়া আসা করতো শুধু সওদাগরের দলই নয়, বিজ্ঞানী ও পর্যটকও আসতো যেতো, রাষ্ট্রদূত বিনিময়ও চলতো।

অতীতকালে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের মধ্যে। ইন্দোচীন* ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের সাথে ভারতীয়রা শুধু যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তাই নয়, তাদের অনেকে এখানে বসবাস করতেও শুরু করে। ভারতবর্ষ হতে আগত বিদ্বৎমণ্ডলী প্রায়শঃই এসব স্থানের বিভিন্ন রাজদরবারে উচ্চ আসন অলংকৃত করতেন। ভারতবর্ষের সাথে ঘনিষ্ঠতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংস্কৃতিবিকাশের ক্ষেত্রে (লিপি, শিল্পকলা, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নানান দিকে) কম উপকৃত হয় নি।

প্রাচীন কালে নিজেদের বহুমুখী কৃষ্টি বিকশিত করার সাথে সাথে ভারতবর্ষীয় জনগণ অন্যান্য উন্নত প্রাচীন সংস্কৃতিও আত্তীকরণ করে নেয়। আর নিজেদের সংস্কৃতিও তারা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে তো বটেই, এমন কি বহু দূরবর্তী দেশেও নিয়ে গিয়ে সেখানে ভারত সংস্কৃতির প্রভাব ফেলে এবং প্রাচীন বিশ্ব সংস্কৃতির বিকাশে অমূল্য অবদান রাখে।

প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত'

(সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

কোন সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই মহাকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল? সমাজব্যবস্থা যে ওরকমই ছিল তার প্রমাণ কী?

দুই রাজপরিবারের মধ্যে ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব এই মহাকাব্যের বর্ণিত বিষয়। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই অকালে পিতৃহীন হয়ে পড়ে। তাদের পিতৃব্য এবং তার সন্তানেরা তাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব অমিতবিক্রমশালী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। সে সময়ে পার্শ্ববর্তী একটি দেশের রাজা ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি সোনালী মাছের চোখ তীরবিদ্ধ করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে, সে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। মাছটিকে একটি গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে তার সামনে অর-বিশিষ্ট একটি চক্র সর্বদা ঘূর্ণনাবস্থায় রাখা হয়েছিল।

* ইন্দোচীন বলতে বর্তমানে বোঝায় তিনটি দেশ — ভিয়েৎনাম, কম্বোজ (বর্তমান নাম কাম্পুচিয়া) ও লাওস। অতীতে অবশ্য এ এলাকায় আরো অনেক রাষ্ট্র ছিল এবং এ দেশগুলোর নামও ঠিক এরকম ছিল না। — অনু.

সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে তরুণের দল এসে জমায়েত হয়েছিল রাজদরবারে। এই পরীক্ষায় শুধুমাত্র পাণ্ডবভ্রাতাদের একজন সফল হন এবং তিনিই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

পাণ্ডবভ্রাতাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি নিজ সহ চার ভাই ও রাজকন্যাকে বাজি রেখে দ্যূতক্রীড়া খেলতে বসেন এবং পরাজিত হন। পরাজয়ের ফলে সকলকেই দাস জীবনযাপন করতে হয়। অনেক পরে দাসত্ব থেকে তাঁরা মুক্তি পান বটে, কিন্তু নির্বিঘ্নে সহজ পন্থায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। তখন শুরু হয় পঞ্চ পাণ্ডবভ্রাতা ও তাঁদের পিতৃব্যপুত্রদের মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম। পাণ্ডবদের সবচেয়ে প্রধান শত্রুর কথা ছিল: 'হয় আমি ওদের ধ্বংস করে পৃথিবী শাসন করবো, নয়তো আমার মৃত্যুর পরে ওরা পারলে শাসন করুক।' জনগোষ্ঠীর কিছু দল গেল পাণ্ডবদের পক্ষে, আর অন্যেরা গেল শত্রুদের দিকে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল ১৮ দিন। শত্রু নিধনের সাধনায় উভয় পক্ষই সব কিছু ভুলে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে বোঁ বোঁ শব্দে তীরের আনাগোনা, রথে রথে সংঘর্ষ, আকাশে মেঘের ন্যায় বিশাল হস্তীযুথ একে অন্যের উপর প্রচণ্ড হিংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পরস্পর পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো। যুদ্ধরত অশ্বারোহী সেনা ছুটে বেড়াচ্ছে পাখির মতো দ্রুতগতিতে, সর্পের ন্যায় অবিকল হিস্‌হিস শব্দে বায়ু ভেদ করে ছুটছে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র মৃত ও আহত মানুষের দেহে ঢেকে গেল, এই মহাযুদ্ধের যারা হোতা তাদের প্রতি উৎক্ষিপ্ত অভিশাপে পূর্ণ হয়ে গেল সমরভূমি।

না এ-পক্ষে, না ও-পক্ষে, কোনোদিকেই জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য পাণ্ডবরাই জয়ী হলো। তারাই অবশেষে সিংহাসনে আরোহন করে সমুদ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলো।

? ১. ১ম-৩য় উপচ্ছেদের ভিত্তিতে পাটলিপুত্র নগরীর কাহিনী বর্ণনা করো। ২. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কীসের ফলে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল? ৩. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় ১ম সহস্রাব্দের শুরু পর্যন্ত সময়পরিধিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবাসী কী সাফল্য অর্জন করেছিল? ৪. প্রাচীন ভারতে সৃষ্ট সাহিত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে কোন্‌টি তোমার ভাল লাগে? তার কারণ কী? ৫. প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন অবদান আমরা এখনো ব্যবহার করছি?

§ ২১. প্রাচীন যুগে শ্রীলঙ্কা

১. শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থান। ভারতবর্ষ উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তদেশ থেকে অল্প দূরে প্রায় নিরক্ষবৃত্তের কাছাকাছি যে বিরাট দ্বীপভূমি অবস্থিত, তারই নাম **শ্রীলঙ্কা**। এ দেশের পূর্ব-পশ্চিম উভয় পার্শ্বেই ভারত মহাসাগরের অতল জলরাশি। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে শ্রীলঙ্কা মাত্র কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত একটি প্রণালী* দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই প্রণালীর মধ্যে ছোটো ছোটো বহু দ্বীপমালা ও প্রবালশৈল মাথা তুলে আছে; এদের মাধ্যমেই প্রাচীন কালে মূল মহাদেশের সাথে সংযোগ রক্ষা সহজতর হয়েছিল শ্রীলঙ্কার পক্ষে। স্পষ্টতই এই দ্বীপমালা কোনো সুপ্রাচীন পর্বতশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ মাত্র, সমুদ্রগর্ভে বিলীন

* প্রণালীটির নাম পক (Palk) প্রণালী। — অনু.

হবার পরে যেটুকু পড়ে আছে। আর প্রণালীর মধ্যে অজস্র দ্বীপমালার সাথে যুক্ত সেই পুরাণকাহিনী: রাজকুমার রামের সেনাদল হয়তো সত্যিই লঙ্কা পাড়ি দেবার জন্য এই সব পাথর ও গিরিশৃঙ্গ ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল সাগরের মধ্যে।

২. শ্রীলঙ্কা দ্বীপের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু। দ্বীপটির ভূপৃষ্ঠ, তার মাটি ও নদী-নালা ইত্যাদি সর্বত্র একরকম নয়, বিভিন্ন রকম।

দ্বীপের মধ্যভাগ অত্যন্ত উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল। তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিম্নভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আর উত্তর ও পূর্বদিক অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। পর্বত থেকে বহু খরস্রোতা পাহাড়ী নদী নেমে এসেছে, প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় তাদের দুকূল প্লাবিত হয়ে যায়।

শ্রীলঙ্কার শুষ্ক অঞ্চলে প্রাচীন কালে প্রচুর কাঁটাগাছ ঝোপঝাড় ও জঙ্গল ছিল। আর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের আর্দ্রভূমিতে ছিল মানুষের অগম্য বিশাল অরণ্যভূমি। এই বনজ সম্পদের মধ্যে অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল তাল ও নারিকেল শ্রেণীর গাছের।

পশুসম্পদের মধ্যে ছিল বন্য হস্তী, মহিষ ও অন্যান্য জীবজন্তু।

৩. শ্রীলঙ্কার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন উল্লেখ। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে দ্বীপটিতে প্রস্তরযুগেও মানববসতি গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন কালে শ্রীলঙ্কার অধিবাসীরা ছিল বেড্ডা।* খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই তারা পাথরের তৈরি শ্রম-হাতিয়ার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষিকাজও তারা জানতো, তবে জলসেচব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। বেড্ডা জাতির সমাজ ছিল আদিম গোষ্ঠী সমাজ, তবে অভিজাত শ্রেণী তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় এখনো বেশ কয়েক হাজার বেড্ডা বসবাস করে, প্রাচীন কালের সামাজিক আচার-অভ্যাস অদ্যাবধি তাদের মধ্যে টিকে আছে।

শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একমাত্র উৎস হলো একটি বিশাল প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ—'মহাবংশ'। যুগপরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা কাহিনী ও প্রাচীনতর কিছু লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে 'মহাবংশের' প্রথম অংশ রচিত হয়েছিল ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।

'মহাবংশ' গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে উত্তর ভারত থেকে এক দল লোক রাজকুমার **বিজয়ের** অধিনায়কত্বে শ্রীলঙ্কায় এসে বসবাস

* **বেড্ডা** (Vädda) শব্দটি অনেকে মনে করেন তামিল 'বেড়ণ' (অর্থাৎ শিকারী) শব্দ থেকে এসেছে, আবার অনেকের ধারণা সংস্কৃত 'ব্যাধ' (Vyadha) শব্দ থেকে। — অনু.

করতে শুরু করে। বিজয়ের বংশধরদের নাম 'সিংহল', যার অর্থ — 'সিংহবংশজাত'।* এদেশে আগত বাসিন্দাদের **সিংহলী** নাম গ্রহণের উৎপত্তি এখান থেকেই। শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের মধ্যে সিংহলীরাই সংখ্যাগুরু।**

৪. প্রাচীন কালে শ্রীলঙ্কাবাসীদের জীবিকা। সিংহলীরা প্রথম এসে বসতি স্থাপন করেছিল এই দ্বীপটির উত্তরাংশে। পরে অবশ্য তারা ক্রমে নানান দিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কৃষিকার্য ও পশুপালন ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। পর্বতাঞ্চল থেকে নিম্নগামী নদীর স্রোতধারাকে তারা কাজে লাগিয়ে জলসেচনের চমৎকার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল। চারপাশে উঁচু পাড় তুলে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য জলাধার এবং জমিতে জল সেচের জন্য অসংখ্য খাল তারা নির্মাণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে নির্মিত বিরাটাকার মিনেরি জলাধার এবং প্রাচীন কালে ব্যবহৃত জলসেচব্যবস্থার নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান, এমন কি সেগুলো বর্তমানেও লোকজন ব্যবহার করে থাকে। জলসেচের কল্যাণে ধান শস্যের ব্যাপক উৎপাদন দেখা দিলো। গম, যব, ভুট্টা, জাতীয় খাদ্য শস্য ও তুলার চাষও তারা করতো।

মহিষ, হাতি ও অন্যান্য প্রাণীকে তারা পোষ মানিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতো। এই অঞ্চল আকরিক লোহে সমৃদ্ধ হওয়ায় সিংহলী কর্মকাররা কোনো সময়েই কাঁচামালের অভাব বোধ করে নি।

ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার জন্যই শ্রীলঙ্কা দ্বীপ সমুদ্রপথে শুধু পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথেই নয়, দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশের সাথে সুপ্রাচীন কালেই বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল। এখান থেকে মুক্তা, বহু মূল্যবান পাথর ও সুতীবস্ত্র এমন কি পশ্চিম ইউরোপেও রপ্তানি করা হতো।

হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারলাভের সাথে সাথে শ্রীলঙ্কায় শহরের অস্তিত্ব দেখা দিলো।

৫. প্রাচীন শ্রীলঙ্কার সমাজে শ্রেণীবিন্যাস ও রাষ্ট্র গঠন। ফসল ফলানোর জন্য কৃষিকর্মের মূলে পরিশ্রম সবই করতো কৃষকসম্প্রদায়। তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সকলে পাশাপাশি মিলেমিশে থাকতো। কিন্তু শ্রীলঙ্কাতেও দাস কম ছিল না। যুদ্ধবন্দী এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের দাসত্ব বরণ করতে হতো। দাসদের কাজ ছিল খাল খনন, জলাধার নির্মাণ; দাসমালিকদের জমিতে কাজ করার জন্য, প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাদের ব্যবহার করা হতো।

* রাজকুমার বিজয়ের নাম ছিল বিজয় সিংহ। অনেকের ধারণা, 'সিংহ' উপাধি থেকেই দেশটির নাম 'সিংহল' হয়েছিল। — অনু.

** জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সিংহলী এবং অবশিষ্টের বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারত থেকে আগত তামিল। — অনু.

অধিবাসীদের মধ্যে যখন দাসমালিক, দাস, গোষ্ঠী-চাষী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন রাষ্ট্র গঠিত হলো। 'মহাবংশের' তথ্যানুযায়ী শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশে প্রথম রাজ্যস্থাপন করেছিলেন বিজয়। পরে দ্বীপে অন্যান্য রাজ্যও গড়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল গোষ্ঠী-চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, বড়ো সৈন্যদল গঠন (যার সাহায্যে বিদ্রোহ দমন ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা যাবে) এবং কৃষিক্ষেত্রে জলসেচব্যবস্থা সংগঠিত করা। জলসেচনের ব্যবস্থা করার ফলে আরো বেশি চাষের উপযুক্ত জমি রাজাদের হাতে এসে গেল... তখন তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যোদ্ধা এবং আমলাদের মধ্যে পারিতোষিক স্বরূপ ঐসব জমি উপহার দিলো।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের অতি প্রাচীন তামিল জাতির কিছুসংখ্যক লোক শ্রীলঙ্কায় চলে এসে বসতি স্থাপন করে। হয়তো এই আগমনের চারিত্র্য ছিল আংশিকভাবে শান্তিপূর্ণ এবং আংশিকভাবে তা ছিল সশস্ত্র আক্রমণ, যার ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল।

খ্রী. পূ. ২য় শতকে তামিলদের রাজা শ্রীলঙ্কা দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য নগর **অনুরাধাপুর** অধিকার করে তা চল্লিশ বৎসরাধিক কাল শাসন করেন। খ্রী. পূ. ২য়-১ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দ্বীপের দক্ষিণাংশের এক রাজা দুত্থগমণি তামিলদের রাজাকে বিতাড়িত করে সমগ্র শ্রীলঙ্কার ক্ষমতা দখল করেন। অতঃপর সমগ্র দেশটিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠিত হয়, এবং পরবর্তী কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ থাকে।

৬. **সিংহলীদের প্রাচীন সংস্কৃতি**। সিংহলীদের রাষ্ট্র সংহতি লাভ করার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

প্রথমদিকে সিংহলীরা ভারতবর্ষে প্রচলিত লিপিপদ্ধতিরই কোনো একটি গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে তারা নিজস্ব লিপি প্রবর্তনে সক্ষম হয়। তালপাতাকে লেখার জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী করে নিয়ে তারা তার উপরে লিখতো।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সাহিত্যকীর্তির মধ্যে একমাত্র 'মহাবংশ'ই আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এছাড়াও অসংখ্য গাথা, গান, নীতিগল্প তখন লিখিত হয়েছিল। অত প্রাচীন আমলেও সিংহলী জনগণ তাদের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ও নৃত্যকলা উদ্ভাবন করেছিল।

জনৈক চীনদেশীয় পর্যটকের রচনায় শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও রচনাটি লিখিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, শহরটি কিন্তু আরো বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুরাধাপুরের রাস্তাঘাট ছিল সরল, নগরটি বহু এলাকায় বিভক্ত ছিল। দ্বিতল ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল বহু। 'মন্দির ও প্রাসাদের স্বর্ণচূড়াগুলো আকাশের পটভূমিকায় ঝকমক

করতো; রাজপথের উপর দিয়ে ছিল ধনুকাকৃতি সেতু সর্বত্র পুষ্পশোভিত পুষ্পাধার রক্ষিত ছিল এবং স্তম্ভমধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে প্রস্তরমূর্তিগুলো ধরে থাকতো দীপাধার।'

প্রাচীন সিংহলী স্থাপত্যশিল্পের যে বর্ণনা সেখানে পাই তার সাক্ষ্য হিসেবে এখনো অনেক স্থাপত্যনিদর্শন শ্রীলঙ্কায় টিকে আছে। রাজা দুত্থগমণির আমলে নির্মাণ শুরু করা রুবনভেলি মন্দিরের গম্বুজ দশ কিলোমিটার দূর থেকেও চোখে পড়ে। মন্দিরের নির্ভুল ও চমৎকার গঠন নির্মাতাদের শুধু শিল্পরুচিরই প্রমাণ দেয় না, সেই সাথে গণিত বিষয়ে তাদের জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। সিগিরিয়া প্রাসাদের দেয়ালে অঙ্কিত ছবি অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ ও অপূর্ব।

প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের যা কিছু এখনো শ্রীলঙ্কায় টিকে আছে, বর্তমানে সে সব উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং তার অনেককিছুর পুনরুদ্ধার চলছে।

? ১. কোন্ কোন্ উৎস থেকে আমরা শ্রীলঙ্কা দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারি? ২. শ্রীলঙ্কার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হেতু সেখানকার জনগণ কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতো? ঐ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় তাদের বিশেষ কী সুবিধা হয়েছিল? ৩. শ্রীলঙ্কায় প্রাচীন কালে কোন্ কোন্ জাতি বসতি স্থাপন করেছিল? ৪. শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল? দ্বীপটির ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী ছিল?

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাচীন চীনদেশ

§ ২২. চীনদেশে রাষ্ট্রের উদ্ভব

(দ্র. মানচিত্র ৩)

১. চীনদেশের প্রকৃতি ও জলবায়ু। চীনদেশের পূর্ব সীমায় বিস্তীর্ণ সমভূমি সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। চীনের পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ও শৈলমালা।

সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর। সমুদ্রোপকূল হতে যতই দূরে যাওয়া যায় পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাতের হার ততই কমে আসে। এসব জায়গায় প্রায়শই অনাবৃষ্টির প্রকোপ দেখা যায়।

হোয়াং-হো এবং **ইয়াং-সি** নামে দুটি বড়ো নদী সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। হোয়াং-হোর উভয় দিক হলুদ মিহি বালির পলিমাটি দ্বারা গঠিত। লাঙল-কোদাল দিয়ে এ মাটিতে খুব ভালো চাষ করা যায়। যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতার ফলে এ মাটি অতিশয় উর্বর।

বর্ষার সময় হোয়াং-হো নদী প্রায় শত শত কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা জুড়ে প্লাবিত হয়। নদীর জল প্রায়শই পলিমাটি ক্ষয় করে ফেলে। অসংখ্যবার হোয়াং-হো তার তীর ধ্বংস করে নতুন নদীগর্ভ খনন করে তার প্রবাহ পরিবর্তন করেছে। গ্রামের পর গ্রাম ও জনপদ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। চীনারা তাই একে ডাকতো নানান নামে, কখনো ডাকতো 'ভ্রাম্যমাণ নদী' বলে, কখনো-বা 'চীনের দুঃখ' নামে, আবার কখনো 'সর্বনাশী' বলে।

ইয়াং-সি নদী তীরবর্তী অঞ্চলও অত্যন্ত উর্বর। প্রাচীন কালে এই এলাকা ঘন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল।
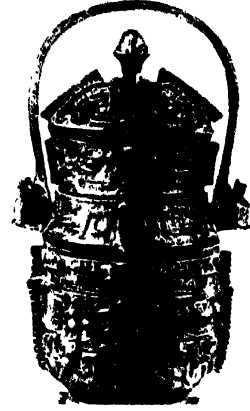
১. হোয়াং-হো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের যে গর্তটি সেখানে শবাধার রাখা আছে। তার চারপাশে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের কঙ্কাল—সম্রাটের সাথে এদেরও এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। গর্তের অনতিদূরে ঘোড়ার কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। **এধরনের সমাধি থেকে কী তথ্য আমরা জানতে পারি?** ২. খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে চীনে নির্মিত একটি পাত্র।

২. খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে হোয়াং-হো অববাহিকা অঞ্চলে দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব। হোয়াং-হো নদীর দুপাশের উর্বর এলাকায় চাষীরা বসতি স্থাপন করেছিল। তারা **জোয়ার, গম, ধান** ও **সব্জীর** চাষ করতো, পশুপালন করতো। **রেশম কীটের** চাষ করতো, রেশমী সুতা দিয়ে মজবুত ও সুন্দর কাপড় বানাতো।

হোয়াং-হো তীরবর্তী অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে নির্মিত বহু কবর আবিষ্কার করেছেন। কয়েকটি কবরের মধ্যে ক্ষৌম্যবস্ত্রে জড়িত মৃতদেহ এবং খাদ্যসহ রক্ষিত হাঁড়ি পাওয়া গেছে। অন্যান্য কবরের জন্য ভূতলগর্ভে বিশাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, শবাধারের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণনির্মিত জিনিসপত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র, পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র থাকতো। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কখনো-বা দশ-বিশ জন, কখনো-বা শতাধিক মানুষকে সমাধিস্থ করা হতো, উদ্দেশ্য—মৃত্য ব্যক্তির আত্মাকে তারা সেবা ও রক্ষা করবে। এদের মধ্যে কিছু লোককে কবরস্থ

করার পূর্বে শিরোচ্ছেদ করা হতো আর অন্যান্যদের বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয়া হতো।

সে সময়কার কিছু হাড় পাওয়া গেছে যার উপরে এরকম কথা লেখা: 'পৃথিবীর বুকে যাতে বৃষ্টি নামে, তার জন্য আমরা দাসকে পোড়াই।' অনাবৃষ্টি ও বন্যার ভয়ে বাতাস, বৃষ্টি ও নদীর অশুভ দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয়েছিল তাদের মনে। এসব দেবতাদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বহু দাসকে পুড়িয়ে বা জীবন্ত অবস্থায় নদীতে ফেলে উৎসর্গ করা হতো।

আবিষ্কৃত বিভিন্ন বস্তু ও তৎকালে লিখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে হোয়াং-হো অববাহিকায় দাস সমাজের আবির্ভাব ঘটে এবং চীনদেশে দাসমালিকভিত্তিক প্রাচীনতম রাষ্ট্র গঠিত হয়।

৩. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমগ্র চীনে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন। যদিও কৃষকসমাজ বৃষ্টিপাতের জন্য ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করতো, তবু অধিকাংশ সময়েই তারা নিজেদের পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করতো। তারা গান গাইতো:

> মেঘের বদলে দেখ নিচ্ছি কোদাল,
> বিষ্টির বদলে রে কেটে চলি খাল;
> তাতেই পেলাম জল, জমিটিরও সার —
> বাড়ে ভাই শস্যের মঞ্জরীহার...

হোয়াং-হো নদীর দুতীরে তারা বাঁধ দিত যাতে বন্যা থেকে সমভূমি রক্ষা পায় তার জন্য। খাল কেটে চলতো সমতলভূমির উপর দিয়ে যা দিয়ে নদীর জল বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে আসা যেত। ইয়াং-সি তীরবর্তী ভূখণ্ডেও চাষীরা জমি চাষ করে ফসল ফলাতো। সমগ্র পূর্ব চীনে শস্যক্ষেত্র ও ফলবাগান ঘেরা অসংখ্য জনবসতিপূর্ণ গ্রাম গড়ে ওঠে। শহরও গড়ে ওঠে বড়ো বড়ো, সেখানে হাজার হাজার লোক বাস করতো।

চীনে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাদের মধ্যে সব সময়ে শত্রুতা ছিল। খ্রী. পূ. ৩য় শতকে সবচেয়ে শক্তিশালী বড়ো রাজ্য ছিল **ৎসিন**। বল-প্রয়োগ ও কৌশল দ্বারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বহমান শত্রুতার সুযোগ নিয়ে ৎসিনের রাজা সমগ্র চীন জয় করে নেন। **খ্রী. পূ. ২২১ সালে** তিনি নিজেকে **ৎসিন শি-হুয়ান্দি** বা 'প্রথম ৎসিন-সম্রাট' রূপে ঘোষণা করেন।

৪. চীনে মহাপ্রাচীর নির্মাণ। দেশকে **হূনদের** হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৎসিন শি-হুয়ান্দি প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দেন। রণলিপ্সু হূন উপজাতিরা চীনের
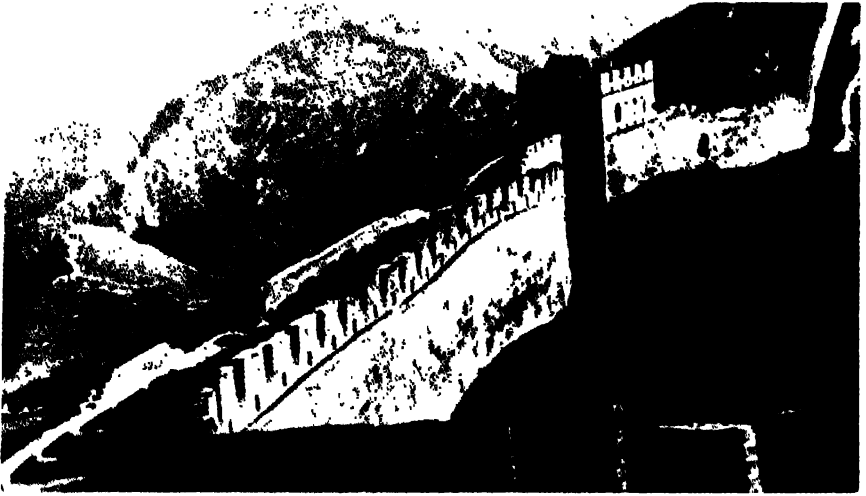
চীনের মহাপ্রাচীর। (আলোকচিত্র।) **এই প্রাচীর ও প্রাচীর নির্মাণ সম্বন্ধে যেখানে বলা হয়েছে বইয়ের ভিতরে সে জায়গা খুঁজে বের করো।**

উত্তর দিকে যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করতো এবং প্রায়ই চীনের নগর ও গ্রামাঞ্চলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রাচীর নির্মাণে অসংখ্য চাষী, দাস, সৈনিক ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের সমাবেশ করা হয়েছিল। চীনের উত্তর সীমানা বরাবর তারা মিনারসহ এই প্রাচীর তৈরি করে। প্রাচীরটি প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রস্থে এত চওড়া ছিল যে একসাথে পাশাপাশি ৫ জন অশ্বারোহী এর উপরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারতো। প্রাচীরটি পৃথিবীতে **চীনের মহাপ্রাচীর** নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রাচীর নির্মাণের কাজ, ভেঙে যাওয়া অংশ পুনরায় মেরামত করা ইত্যাদি করতে করতে, নানা সময়ে বিভিন্ন বিরতির ফাঁকে ফাঁকে, প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে ধীরে ধীরে প্রাচীরনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

৫. রাজ্য সম্প্রসারণার্থে চীনের যুদ্ধাভিযান। চীনা সম্রাটগণ শুধু বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষাতেই তুষ্ট ছিলেন না, নিজেদের দেশের বাহিরেও তাঁরা বিভিন্ন দেশ দখল করেছিলেন। খ্রী. পূ. ২য় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত চীনের সিংহাসনে আসীন হান্ বংশের সম্রাটেরাই বিশেষ করে পররাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধাভিযান করেন। সশস্ত্র অসংখ্য চীনা যোদ্ধারা হূনদের পরাজিত করে। প্রধান চীনা যুদ্ধাভিযানগুলো পরিচালিত হতো পশ্চিম দিকে—**হান্ বংশীয় সম্রাটরা মধ্য এশিয়ার** সমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করার চেষ্টা করতেন। দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র সংগ্রামের ফলে প্রচুরসংখ্যক হূন উপজাতি যুদ্ধে বন্দী হয় এবং তাদের দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়; সেই সমস্ত অঞ্চল যার কিয়দংশের উপর দিয়ে ক্যারাভান যাওয়ার

১. কাপড় বোনার তাঁত। (প্রাচীন চীনা ছবি।) তাঁতী রেশমী কল্প তৈরি করছে। ২. চীনের প্রাচীন মুদ্রা।

পশ্চিমগামী পথ ছিল, চৈনিক বাহিনী সাময়িকভাবে সে সব স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। এই পথের পাশে চীনারা বহু দুর্গ নির্মাণ করেছিল এবং মরুভূমি অঞ্চলে অতিশয় গভীর কূপ খনন করেছিল।

সমগ্র এশিয়ার উপর দিয়ে পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত সুদীর্ঘ বাণিজ্যপথটির নাম ছিল **'রেশমী মহাসরণী'** (the Great Silk Route) ; এই পথ দিয়ে চীন থেকে মূল্যবান চীনাংশুক সারা পৃথিবীতে চালান যেত। রেশমের উৎপাদনপ্রণালী চীনারা গোপন রাখে এবং এই ব্যবসা থেকে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। **এতদ্ব্যতীত রেশমী মহাসরণী দিয়ে ভিনদেশ দখলের লোভে চৈনিক পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী মধ্য এশিয়ায় ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে যুদ্ধাভিযানে বেরুতো।**

? ১. প্রাচীন কালে চীন দেশের জনগণকে কোন্ প্রাকৃতিক বিপদকে জয় করতে হয়েছিল ? এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের ধর্মবিশ্বাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ? ২. কোন্ ঐতিহাসিক উৎস থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে চীনে দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল ? ৩. খ্রী. পূ. ৩য় শতকে চীনদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা মানচিত্রে খুঁজে বের করো। খ্রী. পূ. ২য় শতাব্দীর পূর্বে কোন্ কোন্ অঞ্চল তারা জয় করেছিল তাও বের করো। ৪. মানচিত্র, ছবি ও তোমার পঠিত বিষয়ের সাহায্যে চীনের মহাপ্রাচীরের বিবরণ দাও। ৫. প্রাচীন চীনে এখন থেকে কত বৎসর পূর্বে অখণ্ড চীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল ?

§ ২৩. চীনে গণ-অভ্যুত্থান

(দ্র. মানচিত্র ৩)

মনে করতে চেষ্টা করো—প্রাচীন কালে প্রাচ্য দেশসমূহের জনসাধারণ কীভাবে দাসে রূপান্তরিত হয়েছিল (§ ৭: ২; § ১০: ৪; § ১৫: হাম্মুরাবি অনুশাসন; § ১৬: ৩)।

১. হান রাজাদের শাসনামলে দাসমালিকদের ধনসম্পত্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক ও দাসদের বিরুদ্ধে শোষণ বেড়ে যায়।

তখনকার সমসাময়িক ব্যক্তিরা লিখে গেছেন যে, 'ধনী ব্যক্তিদের জমি সব

১. চীনে ধানের জমি চাষ করা হচ্ছে। ধানের জন্য প্রচুর আর্দ্রতার প্রয়োজন, তাই জমিতে জল দেখা যাচ্ছে। (প্রাচীন চীনা ছবি।) **চীনে চাষাবাদ সম্পর্কে গ্রন্থের কোন স্থানে বলা হয়েছে, খুঁজে বের করো।** ২. খনিমজুর। (প্রাচীন চীনা মূর্তি।) **আবিষ্কৃত এধরনের মূর্তি দেখে আমরা কী জানতে পারি?** ৩. চীনে সমাধির মধ্যে মাটির তৈরি বাড়ির এরকম প্রাচীন মডেল পাওয়া গেছে। **এপ্রকার বাড়িতে কারা বাস করতো বলে তুমি মনে করো?**

জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, অথচ গরিবের জন্য একটা সূচ রাখার জমিও রইলো না।' প্রচুর চাষী ধনীদের জমি ভাড়া নিতো কিংবা সে জমিতে ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হতো। 'মাঠে কাজ করার সময় চাষীদের সমস্ত জলে ভিজে যেত, পা কাদায় মাখামাখি হয়ে যেত। অত্যধিক রৌদ্রে ঝলসে যেত তাদের গায়ের চামড়া আর চুল। সারা শরীরের এতটুকু শক্তি আর অবশিষ্ট থাকতো না।'

নিজেরা গায়ে খেটে চাষীরা যা কিছু উপার্জন করতো তার প্রায় সবই ব্যয় হয়ে যেত জমিভাড়া আর কর দিতে। যা আহার মিলতো তাদের তা 'কুকুর ও শূকরের খাদ্য'। খড়কুটো, নলখাগড়ার পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পোষাক পরতো তারা।

চীনে দাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্রাটের মালিকানাভুক্ত যে সব খনি ছিল তাতে প্রায় ৭০ হাজার দাস কাজ করতো। যাযাবরদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র একবারের এক সফল যুদ্ধাভিযানেই চীনা বাহিনী ২ লক্ষ যুদ্ধবন্দী

২
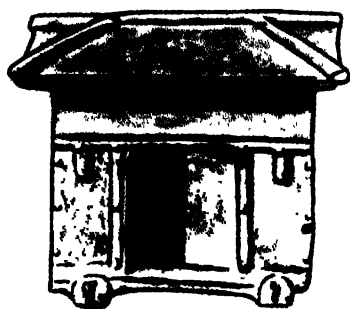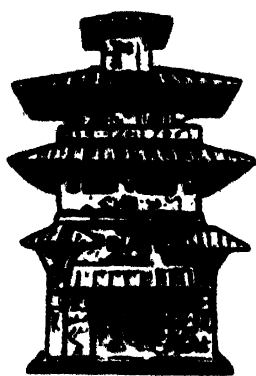
৩

তাড়িয়ে নিয়ে আসে। যে সব লোক খাজনা, জমির ভাড়া বা ধার পরিশোধ করতে পারতো না, তাদের দাসরূপে গণ্য করা হতো। দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্র চাষীরা অনন্যোপায় হয়ে নিজেদের শিশুসন্তানকে দাসরূপে বিক্রি করে দিত। সামান্য কিছু অন্যায় করলেই বিচারকগণ অপরাধীদের এবং তাদের পরিবারবর্গকেও দাস বলে ঘোষণা করতো। হাটেবাজারে যেমন গরু-ছাগলের কেনাবেচা চলে, কয়েদখানা থেকে তেমনি দাসমালিকরা অপরাধীদের দাস হিসেবে কিনে নিত।

চীনদেশের পথে পথে দেখা যেত দাসদের শতচ্ছিন্ন কাপড়ে শৃঙ্খলিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিংবা বন্য পশুর মতো খাঁচায় পুরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাথা ন্যাড়া করে মুখের উপর পরিচয়জ্ঞাপক ছাপ মেরে দেয়া হতো।

২. খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে চীনা দাসমালিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জনৈক প্রাচীন চৈনিক লেখক লিখে গেছেন: 'এদের হাজার হাজার দাস-দাসী আছে, রত্ন ও

মণিমুক্তো পরিমাণে এত বেশি যে বিরাট প্রাসাদগুলোতে তার জায়গা হয় না। গরু, ঘোড়া, ছাগল ও শূকরের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকাতে তাদের স্থান সংকুলান হতো না। গায়ক-গায়িকা ও বাদকদল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতো। মদ লোকে পান করে শেষ করতে পারতো না, মদের স্রোত বয়ে চলতো। মাংস লোকে খেয়ে শেষ করতে পারতো না, পচে নষ্ট হয়ে যেত।'

কৃষক ও দাসরা দাসমালিকদের নাম দিয়েছিল 'বিবেকহীন পরখাদ্যলোভী ইঁদুর'।

৩. দরিদ্র নিঃস্ব লোকজন, দাসেরা সবাই পাহাড়-পর্বতে ও বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতো। কখনো-কখনো একজোট হয়ে দাসমালিক আর আমলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। চীনে প্রাচীন কালে লিপিবদ্ধ ঘটনাপঞ্জীর বিবরণলিপিতে প্রায়শই এরকম কথা লিখিত হয়েছে: 'দাসরা খনিমালিককে হত্যা করে অস্ত্রশস্ত্র দখল করেছে', 'আমলাদের উপর হামলা চালিয়ে দাস নিয়ে পালিয়ে গেছে, গুদাম ও অস্ত্রশস্ত্র লুট করেছে', 'মালিক নিহত হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে'।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনদেশে এক বিরাট অভ্যুত্থান হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহের নামকরণ করা হয়েছে — **লাল ভ্রু-র** বিদ্রোহ। (এ সম্পর্কে বিবরণ ১৩৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।)

৪. খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর শেষভাগে, 'লাল ভ্রু'-র বিদ্রোহের দেড় শতাব্দী পরে চাং-দের তিন ভাই সম্রাটকে উৎখাত করে সুখী জীবনযাপনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সমগ্র চীন জুড়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকে; খনিতে, কর্মশালায়, গ্রামে গ্রামে অত্যন্ত গোপনে সশস্ত্র দল গঠিত হয়।

১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশ্বাসঘাতক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। চাং ভ্রাতাদের পক্ষাবলম্বী সহস্রাধিক ব্যক্তিকে ধরা হয় এবং তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। তখন তিন ভাই অবিলম্বে বিদ্রোহ শুরু করার ডাক দেন; শহরে ও গ্রামে সর্বত্র তাঁদের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় দেশের কেন্দ্রাঞ্চলসমূহে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়লো। বিদ্রোহ করলো লক্ষ লক্ষ কৃষক ও দাস। বহু শহর তারা দখল করে নিল, ধনীদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিল, বন্দী ও দাসদের মুক্ত করে দিলে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে তারা মাথায় হলুদ রঙের কাপড়ের পট্টি বাঁধতো। সে কারণেই ইতিহাসে এই অভ্যুত্থানের নাম: **হলুদ পট্টির বিদ্রোহ।**

সম্রাট ও দাসমালিকরা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। তারা নিজেদের সবচেয়ে বিশ্বাসী সেবক রাজকর্মচারী ও সেনাপতিদের ছেলেপিলেকে সৈন্যদলে ভর্তি হবার হুকুম জারি করে। দাসমালিকরা নিজেরা বিপুল পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ

করে তার পরিচালনভার গ্রহণ করে। চীনদেশের প্রায় সর্বত্র শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ভয়ংকর নির্মম যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। (দ্র. রঙিন ছবি ১০)

৫. শত্রুপক্ষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সাহসিকতা স্বীকার না করে পারে নি। তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, 'হলুদ পট্টিরা' নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় নি; প্রত্যেকটা দল আলাদা-আলাদাভাবে লড়াই করছিল। তা ছাড়া সম্রাটের বাহিনীতে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল, সেরকম কিছুই বিদ্রোহীদের ছিল না।

সম্রাটের সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে 'হলুদ পট্টির' শিবির আক্রমণ করে বসে এবং জলাভূমি ও নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাদের কোণঠাসা করে ফেলে; এ জায়গায় প্রায় ৫০ হাজার বিদ্রোহী নদীতে ডুবে প্রাণ হারায়। অপর এক যুদ্ধে মারা যায় ১ লক্ষ বিদ্রোহী। সম্রাটের সেনাপতি সব কাটা মাথা এক জোট করে তা দিয়ে মিনার তৈরির আদেশ দেয়। 'হলুদ পট্টির' প্রধান দলগুলো একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সংগ্রামে চাং ভ্রাতৃত্রয় নিহত হন। বিদ্রোহী-সমর্থকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, এমন কি তাদের পরিবারবর্গ, নারী বা শিশু কাউকেই ক্ষমা করা হয় নি।

কৃষক ও দাসদের নিয়ে সংগঠিত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তার পরিবর্তে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। দাসমালিকেরা ২০ বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম ও নির্মম হত্যাকাণ্ড চালাবার পর তবে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল বটে, তবে ঘৃণ্য হান বংশের ক্ষমতা খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো। বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পরে হান বংশের শেষ সম্রাট নিহত হয় এবং তার রাজ্য অনেক ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

'লাল ভ্রু'-র বিদ্রোহ

(প্রাচীন চীনা ঐতিহাসিকের রচনা অনুযায়ী)

ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরের ন্যায় বিদ্রোহীরা এসে সমবেত হলো। ফান্ চুন্ সাহসী ছিলেন এবং বহুসংখ্যক জনগণ তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়। যুদ্ধপ্রস্তুতির সময়ে ফান্ চুন্ ও তাঁর সমর্থকগণ সম্রাটবাহিনী থেকে নিজেদের পার্থক্য করার জন্য নিজেদের ভ্রূতে লাল রং মাখিয়ে নেয়।

সম্রাট নয় জন ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করে তাদের 'বাঘ' আখ্যায় ভূষিত করেন। হাজার হাজার সৈন্যের পরিচালনভার সম্রাট এই সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত করেন। প্রতি যোদ্ধাকে ৪ হাজার মুদ্রা করে উপহার প্রদান করা হয়। তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ছ'জন 'বাঘ' রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। বাকি তিন 'বাঘ' বিশৃঙ্খল সৈন্যদলকে একত্রিত করে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা চালায়।

প্রায় সব দিক থেকে বিদ্রোহীরা এসে রাজধানীর চারদিকে সমবেত হয়েছিল। সম্রাট বন্দীশালা মুক্ত করে সমস্ত অপরাধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার আদেশ দেন। বন্দীদের এই বাহিনীটি অবশ্য শহর থেকে বেরুনো মাত্র যে যার মতো নানান দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

বিদ্রোহীরা জোর করে রাজধানীতে প্রবেশ করে। শহর জ্বলতে থাকে, সংগ্রাম শুরু হয়ে যায় প্রতি রাস্তাতেই। দীঘির মাঝে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত প্রাসাদের মধ্যে সম্রাট গোপনে আশ্রয় নেন।

বিদ্রোহীরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলে ধনুর্বাণ বর্ষণ করতে থাকে। সম্রাটের রক্ষীরা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হতে লাগলো, কিন্তু এমন সময়ে বিদ্রোহীদের তীর শেষ হয়ে যায়। এর পর শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। অবশেষে সম্রাটকে বিদ্রোহীরা ধরতে সক্ষম হলো এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করা হলো।

'লাল ভ্রূ'-র দল কিন্তু নিজেদের জয় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। চাষী ও দাস সকলেই ভেবেছিল যে, তাদের অমঙ্গলের হেতু তাদের নিষ্ঠুর রাজা, এবং ন্যায়পরায়ণ কোনো সম্রাট সিংহাসনে বসলেই তারা শান্তির জীবনযাপন করতে পারবে। ফলে দাসমালিকেরা পুনরায় নতুন লোককে সিংহাসনে বসিয়ে সাম্রাজ্য অক্ষয় রাখতে সক্ষম হয়।

? ১. § ২৩-য়ের অন্তর্গত উপচ্ছেদগুলোর কোনো শিরোনামা নেই। শিরোনামাহীন উপচ্ছেদসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির প্রতি নিম্নলিখিত কোন্ শিরোনামা প্রযোজ্য হতে পারে: 'শোষকের বিরুদ্ধে কৃষক ও দাসদের সংগ্রাম', ''হলুদ পাট্টিদের' পরাজয়', 'দাসমালিকদের জীবনধারা', 'কৃষক ও দাসদের অবস্থা', ''হলুদ পাট্টিদের' বিদ্রোহ'? ২. লোকজন কোন কোন উপায়ে দাসে পরিণত হতো সে সম্বন্ধে § ২৩ পাঠে তুমি যা জেনেছো বলো। ৩. 'হলুদ পাট্টিদের' অভ্যুত্থানের প্রধান কারণগুলো কী ছিল? এই বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল কী? ৪. কী কারণে এই বিদ্রোহ সফল হয় নি? ৫. এখন থেকে কত বৎসর পূর্বে 'হলুদ পাট্টিদের' বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল? কোন্ শতাব্দীতে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল? এবং সেই শতাব্দীর প্রথম দিকে না শেষ দিকে? একটি বিশাল সাম্রাজ্যরূপে চীন সুসংহত হবার কত বৎসর পর 'হলুদ পাট্টিরা' বিদ্রোহ করেছিল? ৬. পঠিত বিষয় এবং চিত্রাদির আলোকে দাসত্বে বন্দী কৃষকের জীবন ও তার 'হলুদ পাট্টি'-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করো।

§ ২৪. চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি

মনে করতে চেষ্টা করো—প্রাচীন কালে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল (§ ১২: ১, ২, ৩; § ১৭: ৫)।

১. লিপি আবিষ্কার। চীনের জনগণ খ্রী. পূ. প্রায় ২য় সহস্রাব্দে তাদের লিপিমালা উদ্ভাবন করেছিল। অক্ষর হিসেবে তারা ব্যবহার করতো চিত্রলিপি-বর্ণমালা। চিত্রলিপির প্রতিটি অক্ষরে সমগ্র একটি শব্দ বোঝানো হতো। যেমন ধরা যাক, চিত্রলিপিতে 木 অক্ষরটির মানে 'গাছ', এরকম দুটি অক্ষর পাশাপাশি থাকলে 木木 অর্থ বোঝাবে 'বন', তিনটি থাকলে 木木木 তার অর্থ দাঁড়াবে 'ঝোপ জঙ্গল'। চীনা লিপিতে কয়েক হাজার চিত্রলিপি-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেখাপড়া শেখার কোনো উপায় চাষীদের ছিল না। এই চিত্রলিপি শিখতে বহু বছর লাগতো, এদিকে গরিব কৃষকের টাকাপয়সাও ছিল না যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে।

প্রাচীন কালে চীনে হাড় বা রেশমী কাপড়ের উপরে লেখা হতো, নয় তো বাঁশের চটার উপরে। রেশম খুব দামী ছিল বলে তা শুধুমাত্র বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। বাঁশের চটা একসাথে গোছ বেঁধে ব্যবহার করা হতো বই হিসেবে।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চীন **কাগজ** আবিষ্কার করে। ছেঁড়া কাপড়, বাঁশ আর গাছের বাকল দিয়ে তারা কাগজ বানাতো। কাগজ সস্তা ছিল এবং বাঁশের চটার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক। কাগজ আবিষ্কার চীনে জ্ঞানপ্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

২. জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। চীনা পণ্ডিতেরা বহু বইপত্র লিখে গেছেন। কৃষিসংক্রান্ত রচনাবলীতে হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী চীনা কৃষকদের জমিচাষ, পশুপালন, রেশমকীট চাষের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রাচীন চীনা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যাধি ও ক্ষত-রোগের চিকিৎসা জানতেন। রোগীর হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বলকারক ঔষধ হিসেবে **চা** ব্যবহৃত হতো। এর অনেক পরে অবশ্য পানীয় রূপে চা-র প্রচলন শুরু হয়।

চীন দেশের জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীকে একটি বিরাট অণ্ড বা ডিমের সাথে তুলনা করতেন: পৃথিবী নাকি ডিমের কুসুমের মতো, আর আকাশ হলো ডিমের খোল। আকাশের গায়ে ভিতর থেকে জ্যোতিষ্ক সেঁটে দেয়া আছে, সেগুলোকে সাথে করেই আকাশ পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তন করে।

চীনা পর্যটকগণ **'পর্বত ও সমুদ্র বিষয়ক গ্রন্থ'** অর্থাৎ চীনের ভূগোল রচনা করেছেন। দেশের প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সেখানে লেখা আছে। কিন্তু স্বল্পপরিচিত স্থানাদি সম্পর্কে লেখকগণ বহু কাল্পনিক কথা লিখেছেন, যেমন: 'সেখানে প্রেত বাস করে, তাদের মুখ মানুষের, দেহ ব্যাঘ্রের ন্যায় ডোরাকাটা, আর লেজ সাদা।'

কম্পাস আবিষ্কারের কৃতিত্বও প্রাচীন চীনের।

৩. 'ঐতিহাসিক কড়চা'। খ্রী. পূ. ২য় শতক থেকে খ্রী. পূ. ১ম শতকের প্রথম দিকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক **সিমা ৎসিয়ান্** জীবিত ছিলেন। তিনি বহু লিখিত নথিপত্র অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করেন। সিমা ৎসিয়ান্ প্রায় সমগ্র চীনদেশ পরিভ্রমণ করে যে সব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল সে সব স্থান পরিদর্শন করেন, বহু প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞানলাভ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা এবং সুদূর অতীতের

১. বাঁশের ফালিতে লেখা চীনের প্রাচীন লিপি। চীনা পণ্ডিতগণ পর্যটনের সময়ে নিজেদের সাথে এরকম প্রচুর 'বই' গাড়িতে রাখতো। ২. চীনদেশে কাগজ তৈরির পদ্ধতি। (প্রাচীন চিত্র।) বামে: বিশাল চুল্লীতে কাগজ তৈরির জন্য মণ্ড জ্বাল দেয়া হচ্ছে। ডাইনে: মণ্ড থেকে কাগজ প্রস্তুত হচ্ছে। উপরে দেখা যাচ্ছে—চীনা চিত্রলিপি।

ঘটনাবলী নিয়ে প্রচলিত পুরাকাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। এই সমস্ত মূল সূত্রের ভিত্তিতে সিমা ৎসিয়ান্ চীনদেশের সুপ্রাচীন কাল থেকে তাঁর জীবৎকালের শেষ দিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁর সমগ্র জীবন ব্যাপী সাধনায় সিমা ৎসিয়ান্ যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি নিজেই তার নামকরণ করে গেছেন: **'ঐতিহাসিক কড়চা'**।

সিমা ৎসিয়ান্ 'ভালোকে বিকৃত না করে এবং খারাপকে না লুকিয়ে' যথাযথ সব লিখে গেছেন। সম্রাট এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সত্য কথা লিখতে তিনি কখনো ভয় পান নি; এর ফলে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে তাঁকে পড়তে হয়েছিল।

৪. **প্রাচীন চীনের শিল্পকলা**। প্রাচীন যুগে চীনের জনগণ বহু লোককাহিনী, গান ও গল্প সৃষ্টি করেছিল। এসবেরই মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষ তাদের দৃষ্টিকোণ ও অনুভূতি প্রকাশ করতো। (১৪১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চীনা সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করো।)

প্রাচীন আমলে চীনদেশে ঘরবাড়ি প্রায় সব কাঠের হতো, ফলে তাদের কোনোটাই আমাদের আধুনিক কাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। অবশ্য পাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তৈরি প্রাচীন যুগের বহু শিল্পনিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে।

১. লবণ খনি। (প্রাচীন চীনা রিলীফ।) **শিল্পী কীভাবে লবণ খনিতে কঠিন পরিশ্রমকে ফুটিয়ে তুলেছেন? লোকেরা যে মাটির নিচে কাজ করছে, শিল্পী তা কীভাবে বুঝিয়েছেন?**
২. প্রাসাদে ভোজনোৎসব। (প্রাচীন চীনা রিলীফ।) নিচে: সম্ভ্রান্তব্যক্তিরা প্রাসাদে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছে। সঙ্গে চলেছে পায়ে হেঁটে পার্শ্বচর আর ঘোড়ার গাড়িতে চেপে যোদ্ধার দল। মধ্যভাগে: অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে গৃহকর্তা। উপরে: ভোজনে ব্যস্ত লোকজন, গায়ক ও প্রহরীবৃন্দ।

এসব বস্তু তৎকালীন জীবনধারা ও ধর্মবিশ্বাসের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

ব্রোঞ্জ ও পাথরে তৈরি প্রাচীন চৈনিক পাত্রের গড়ন ছিল নানান রকমের। পাত্রের গায়ে ড্রাগন, কাল্পনিক জন্তুজানোয়ার, চমৎকার কারুকর্ম ও পুরাণকথিত বহু দৃশ্যাদি অঙ্কিত হতো। (দ্র. ১৩০ পৃষ্ঠার ২ নং ছবি।)

অদ্যাবধি বর্তমান বহু শিল্পনিদর্শন হান বংশের সম্রাটদের সমকালীন বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষের জীবনধারার পরিচয় বহন করে আছে। শ্রমিকের মূর্তি, ধনীগৃহ এবং গরিবের কুঁড়েঘরের মডেল — সবই মাটি দিয়ে প্রস্তুত। পাথরের উপর অঙ্কিত রিলীফে প্রাসাদে ভোজনোৎসব ও লবণখনি রূপায়িত হয়েছে। ভাস্কর অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে প্রাসাদ-অধিপতির বিলাস-ব্যসন, অতি বাধ্য ভৃত্যের ব্যস্তসমস্ত ভাব, পরিশ্রান্ত দাসের কঠোর পরিশ্রম এঁকেছেন।

লবণখনি আঁকা রিলীফটি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন কালের ভাস্করদের মধ্যে অন্তত কিছু লোক দাসদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং শোষণ যে অন্যায় ও নির্মম তা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন।

সিমা ৎসিয়ানের 'ঐতিহাসিক কড়চা' থেকে

এই কাহিনী থেকে প্রাচীন চীনা ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কী জানা যায়? পুরোহিতদের ব্যাপারে সিমা ৎসিয়ানের ধারণা কীরকম ছিল?

এক শহরে প্রতি বৎসর নদীর জলদেবতার বিবাহোৎসবের আয়োজন করা হতো। বৃদ্ধ পুরোহিতরা ও ধর্মযাজিকাগণ এ উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী একটি মেয়েকে জলে বিসর্জন

দিত। তাছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে তারা এই বিবাহের জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতো যে নগরবাসীরা গরিব হয়ে যেতে লাগলো; ফলে রাজকোষে রাজস্ব আদায় পরিমাণে কমে এলো। সেই অঞ্চলের শাসক এতে করে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। একবার তিনি বিবাহোৎসব দেখতে এলেন। কনেকে দেখে তিনি বললেন যে, বউ দেবতার যোগ্য সুন্দরী মোটেই নয়, তাই বরং প্রধান ধর্মযাজিকা দেবতার কাছে গিয়ে যতক্ষণ না আরো সুন্দরী মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে আসুক। এই বলে তিনি প্রধান ধর্মযাজিকাকে নদীতে ডুবিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। প্রধান ধর্মযাজিকা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসায় তিনি তখন আরো তিনজন কনিষ্ঠা ধর্মযাজিকাকে পূর্ববর্তিনীর খোঁজখবর করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তার পরে তিনি বললেন, ধর্মযাজিকারা নিশ্চয়ই দেবতাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারছে না; ফলে বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতদেরই তো শেষ পর্যন্ত যাওয়া দরকার। অতঃপর তিনি তাদেরও জলে ফেলে দিতে আদেশ করলেন। এর পরে অবশ্য নদীর জলদেবের বিবাহ বন্দোবস্ত করার স্পর্ধা কারো হয় নি।

প্রাচীন চৈনিক লেখকদের রচনা থেকে

নিম্নোদ্ধৃত রচনাত্রয়ীর লেখকগণ কোন্ শ্রেণীর প্রতি কীরূপ মনোভাব পোষণ করতেন? তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

১. বীজ বোনো নাই, ফসলও তোলো নি প্রভু,
তবু কেটে নিলে কোটি কোটি আঁটি ধান?
গরু গাভী এত কোথা থেকে পেলে প্রভু?
মানুষ যে হবে খুইয়ে নিজের মান
পরের অন্ন মুখেতে তোলে না প্রভু!

২. 'দ্যুলোক' (তার মানে 'দেবতা') নিজে কখনো কথা বলেন না, তিনি মানুষের মুখ দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। একমাত্র রাজাই তাঁর মনোভাব বুঝতে পারেন, সেজন্যই রাজাকে বলা হয় দ্যুলোকপুত্র।

পিতা দ্যুলোকের নিকট হতে আদেশপ্রাপ্ত হন দ্যুলোকপুত্র, আর প্রজারা তা পায় দ্যুলোকপুত্রের নিকট হতে।

৩. দুনিয়ায় কেন সমান সকলে নয়?
ধান্যে ও গমে ধনীর ভাঁড়ার লাল,
গরিবেরা খায় জঘন্য ভুষিমাল;
দাস-গরিবের মূর্খ মনিব শ্রেয়তর কীসে হয়?

? ১. কোন্ জাতির লিপির সাথে চৈনিক লিপির মিল আছে? কীরকম মিল? ২. প্রাচীন চীনদেশ কী কী আবিষ্কার করেছিল? ৩. সিমা ৎসিয়ান্ কী কী ঐতিহাসিক আকর নথিপত্রাদি ব্যবহার করেছিলেন? মানুষ ও ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর কী কী সদ্‌গুণ ছিল? ৪. চীনের প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের আলোকে প্রাচীন চীনদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি কী জ্ঞান লাভ করতে পারো?

সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির ইতিহাস মনে আছে কিনা দেখে নাও

সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমি বলতে বোঝায় এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলো। এই সব দেশে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ তার আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থার যুগ অতিক্রম করে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রচালিত সমাজে উত্তরণ করেছিল।

সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির দক্ষিণাঞ্চলীয় বিশাল নদীসমূহের অববাহিকা এলাকায় কৃষি সভ্যতা অতিদ্রুত বিকশিত হয়েছিল।

যে ৫টি নদীর অববাহিকায় সবচেয়ে আগে কৃষিব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তাদের নাম বলো এবং মানচিত্রে তাদের অবস্থান নির্দেশ করো। কী কী সুবিধা থাকার জন্য সে সব স্থানে কৃষিকর্ম বিকাশ লাভ করেছিল? সে সব অঞ্চলের অধিবাসীদের কী কী বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল?

খ্রীষ্টাব্দের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই এসব স্থানে মানুষকে শোষণ করার উপযুক্ত পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল।

মানুষকে শোষণ করা বলতে তুমি কী বোঝো, ব্যাখ্যা করে বলো। সংগ্রহবৃত্তি ও শিকারী জীবনে কেন সেখানে কেউ শোষণে অভ্যস্ত হয় নি? সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির কৃষিসমাজেই-বা কেন শোষণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল?

লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি উদ্ভবের পরে যেমন তেমনি বনজঙ্গলে ও রুক্ষ কঠিন অঞ্চলে বসবাসকারী মনুষ্যসমাজেও লোকজনকে একইভাবে শোষণ করা সম্ভব হয়েছিল।

কাঠ, পাথর ও তামার তৈরি যন্ত্রপাতির চেয়ে লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি কোন্ দিক দিয়ে যোগ্যতর ছিল? মানুষ কবে লৌহ ব্যবহার শুরু করেছিল?

সমাজে একে অন্যকে যখন শোষণ শুরু করলো তখন বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হলো।

সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করো। কৃষক ও দাসদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? লোকে কীভাবে দাসত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তো? দাসমালিক শ্রেণী কীভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?

শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে চলেছিল নিষ্ঠুর সংগ্রাম।

প্রাচ্যভূমির কোন কোন দেশে সুপ্রাচীনকালে শোষিতদের বড়ো রকমের অভ্যুত্থান ঘটেছিল? কবে তা সংঘটিত হয়েছিল?

দাসমালিকগণ শোষিত জনগণের বিরুদ্ধতা নিষ্ঠুরভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে দমন করতো। রাষ্ট্রই ছিল সেই শক্তির উৎস।

রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান লক্ষণ কী ছিল? আদিম গোষ্ঠী-সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয় নি? সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমিতে তোমার পরিচিত রাষ্ট্রসমূহের নাম বলো এবং মানচিত্রে তাদের অবস্থান দেখাও। কী জন্য বিভিন্ন দেশে একই সময়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব না ঘটে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছিল?

শোষিতের উপর ক্ষমতা বলবৎ রাখায় ধর্ম দাসমালিকদের সাহায্যই করেছিল।

শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্ম কীভাবে শোষিতদের বাধা দিত, ব্যাখ্যা করে বোঝাও। দাসমালিকরা ধর্মকে কীভাবে কাজে লাগাতো তার উদাহরণ দাও। পুরোহিতরা সম্রাটকে সর্বদা কেন সমর্থন করতো?

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-১ম সহস্রাব্দে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দাসমালিকদের সমাজ গড়ে উঠেছিল।

দাসমালিকভিত্তিক সমাজের প্রকৃত লক্ষণ কী? আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সাথে এর পার্থক্য কোথায়?

দাসমালিক সমাজে প্রাচীন কালে প্রাচ্য জনগণ কৃষি সভ্যতা ও বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল।

প্রাচীন কালে প্রাচ্য জনগণ কী কী ফসল ফলাতো এবং পশুপালন করতো? কোন্ কোন্ হস্তশিল্পের সর্বাপেক্ষা উন্নতি হয়েছিল? সেখানে কোন্ কোন্ লিপির উদ্ভব হয়েছিল? প্রাচ্য দেশসমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কতদূর বিকশিত হয়েছিল এবং কী কী তারা আবিষ্কার করেছিল? নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর কী কী নিদর্শন তুমি জানো: প্রাচ্যভূমির প্রাচীন (ক) সাহিত্য, (খ) স্থাপত্যকলা, (গ) ভাস্কর্য?

প্রাচীন গ্রীস

সপ্তম অধ্যায়

সুপ্রাচীন কালে গ্রীকদেশ

§ ২৫. প্রাচীন গ্রীসের নিসর্গ ও তার অধিবাসী

(দ্র. মানচিত্র ৪ এবং ১৫১ পৃষ্ঠায় মানচিত্র)

১. ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত **বলকান উপদ্বীপ**। তার দক্ষিণাংশে আছে একটি ছোটো পাহাড়ী দেশ—**গ্রীস**।

গ্রীসের পাহাড় অত্যন্ত খাড়া এবং শৈল। প্রস্তরময় পর্বতের ঢালু অঞ্চলে ঝোপঝাড় এবং বিরল তৃণাদি জন্মায়। সমতলভূমির জমি উর্বর। গ্রীসে লোহা, তামা, রুপা ও **মর্মর** পাথরের খনি আছে।

ঈজিয়ান সাগর বিধোত গ্রীসের পূর্ব উপকূলে খাড়া উঁচু পাহাড়। সংকীর্ণ উপদ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, আর উপসাগর স্থলদেশের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই উপকূল অঞ্চলে বহু খাড়ি, সেখানে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। মৎস্যের প্রাচুর্যও এই সাগরটির বৈশিষ্ট্য।

ঈজিয়ান সাগরে ছড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো অনেক দ্বীপ। দ্বীপগুলো আবার এত কাছাকাছি যে, প্রত্যেকটি দ্বীপ থেকে পাশের দ্বীপটি দেখা যায়।

গ্রীসে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদী শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর এবং প্রায়ই প্রবল ঝড় হয়। বৎসরের বাকি সময় নির্মল আকাশ সূর্যালোকে ঝলমল করতে থাকে। গ্রীষ্মকালে নদীনালা প্রায় শুকিয়ে যায়। বন্ধুদের বিদায়সম্ভাষণ জানাতে গ্রীকদের প্রথা ছিল একথা বলা: 'কামনা করি, যাত্রা শুভ হোক, টাটকা জল পাও।'

২. ভূ-প্রকৃতিই দেশটিকে তিনভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে: **দক্ষিণ গ্রীস, মধ্য গ্রীস এবং উত্তর গ্রীস**। উপসাগর মধ্য গ্রীসকে দক্ষিণ গ্রীস বা **পেলোপন্নেসস্** থেকে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছে; অত্যন্ত সংকীর্ণ ভূ-ভাগ দ্বারা এই দুই অংশ যুক্ত। আর উত্তর ও মধ্য গ্রীসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা। কেবলমাত্র

গ্রীসের প্রাকৃতিক শোভা। (আলোকচিত্র।) **ছবি দেখে গ্রীসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কী ধারণা পাই?**

উপকূল অঞ্চলে, পাহাড় ও সাগরের মাঝখানে অবস্থিত সংকীর্ণ **থের্মোপিলে গিরিপথ** ছিল প্রাচীন কালে মধ্য ও উত্তর গ্রীসের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র পথ।

গ্রীসের প্রত্যেকটি অঞ্চল পাহাড়-পর্বত দ্বারা আবার বহু ছোটো ছোটো এলাকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে শুধু হয় সমুদ্রপথে, নয় তো সংকীর্ণ পাহাড়ী হাঁটা-পথ দিয়ে যাওয়া যেত।

৩. প্রায় এক শ' বৎসর পূর্বেও প্রাচীন গ্রীস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মনে করা হতো যে, গ্রীক জনগণের ইতিবৃত্ত কেবলমাত্র খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দ থেকে শুরু হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পেলোপন্নেসসের উর্বর সমভূমিতে, যেখানে অতীত কালে প্রাচীন শহর **মিকেনাই*** অবস্থিত ছিল, খননকার্য শুরু করা হয়। খননকার্য শেষ হবার পর প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব দু'সহস্র বৎসর আগেও এই

* **মিকেনাই** শহরটি সাধারণত ইংরেজিতে 'মাইসেনে' (Mycenae) নামে পরিচিত। — অনু.

নগরী বিদ্যমান ছিল। শহরের সর্বাপেক্ষা উঁচু এলাকায় খাড়া পাহাড়ের উপরে ছিল তাদের দুর্গ **আক্রোপোলিস্***। চতুর্দিকে বেষ্টিত বিরাট বিরাট পাথর দ্বারা নির্মিত প্রাচীর তাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতো। আক্রোপোলিসের অভ্যন্তর ভাগে ছিল রাজপ্রাসাদ, তার অতি নিকটে প্রস্তরনির্মিত সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাধিস্থ মৃত ব্যক্তিদের মুখ সোনার মুখোশে আবৃত থাকতো। এতদ্ব্যতীত সমাধিমন্দিরে সুদক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি ব্রোঞ্জের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত জিনিসপত্রাদি পাওয়া গেছে।

মিকেনাই শহর আবিষ্কারের পর গ্রীসে খৃ. পূ. ২য় সহস্রাব্দে নির্মিত আরো অনেক শহর ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সে সব স্থানে সুদূর অতীতের অপরিচিত লিপিচিহ্ন সম্বলিত মৃত্তিকাফলক খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা এই সব মৃত্তিকাফলক পড়তে পেরেছেন। মৃত্তিকাফলকে দাসদের নামের তালিকা, জমিদারদের তালিকা ও তাদের খাজনা প্রদানের নির্দেশ, সৈন্যদল ও নৌবাহিনীর অভিযান প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ ছিল। দুসহস্র খৃষ্টপূর্বাব্দের এই শহরগুলোর প্রায় প্রত্যেকটি ধ্বংসাবশেষে অগ্নিকাণ্ড ও নগরধ্বংসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসের অজ্ঞাত পৃষ্ঠা বিজ্ঞান এভাবেই আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির ভিত্তিতে খৃ. পূ. ২য় সহস্রাব্দে গ্রীকদের জীবনধারা, সমাজবিন্যাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করো।

৪. বল্কান উপদ্বীপের উত্তরে **দোরীয়** নামে এক গ্রীক উপজাতি বসবাস করতো। তাদের সংস্কৃতি মিকেনাই-সংস্কৃতি অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্টতর ছিল। খৃ. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে যুদ্ধবাজ দোরীয় উপজাতি নিজেদের নেতৃবর্গের নেতৃত্বে মধ্য ও দক্ষিণ গ্রীস আক্রমণ করে মিকেনাই সহ বহু শহর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে দেয়। মিকেনাইয়ের জনগণের একটা অংশ দোরীয়দের অধীনতা মেনে নেয়, আর অন্যান্য সকলে বল্কান উপদ্বীপ ছেড়ে ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে এবং তার কাছে অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। (গ্রীক উপজাতিসমূহের অভিযান বোঝার জন্য ১৫১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মানচিত্র দেখো।)

দোরীয় উপজাতির আক্রমণের ফলে সমগ্র গ্রীক সংস্কৃতির পতন ঘটে। অতঃপর বেশ কয়েক শত বৎসর ব্যাপী গ্রীসে প্রস্তর নির্মিত কোনো ভবন তৈরি হয় নি, শিল্পদ্রব্যাদি তার সুকুমারত্ব হারিয়েছিল, লিপিও বিস্মৃত হয়েছিল মানুষ।

? ১. §২৫-এর অন্তর্গত উপচ্ছেদগুলোর শিরোনামা দাও। ২. গ্রীসের প্রাকৃতিক গঠনই তাকে কীভাবে তিন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছিল, ৪ নং মানচিত্রে গ্রীস খুঁজে বের করে তা দেখাও। গ্রীকরা কীভাবে এই তিন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করতো? ৩. ভূ-

* **আক্রোপোলিস্** — শহরে উঁচু ও সুরক্ষিত স্থান।

১. মিকেনাই আে লসের 'সিংহতোরণ'। দেয়াল নির্মাণে পাথরের যে রকম ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করো। ২. পেলোপন্নেসসে আবিষ্কৃত স্বর্ণ পেয়ালা। ৩. সমাধিতে মৃত ব্যক্তির মুখ ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত সোনার মুখোশ। ৪. প্রাচীন গ্রীক লিপিসহ মৃত্তিকাফলক।

প্রকৃতির দিক থেকে গ্রীস ও মিশরের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? কমপক্ষে চারটি পার্থক্য নির্দেশ করো। গ্রীসের বিশেষ প্রকৃতির জন্য প্রাচীন কালে গ্রীসের কী সুবিধা হয়েছিল? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪. খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে গ্রীক সংস্কৃতির পতনের মূলে কী কী কারণ বিদ্যমান ছিল? পতনের প্রমাণ কী? ৫. খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে গ্রীকদের বসতি কোথায় কোথায় ছিল, ৪ নং এবং ৫ নং মানচিত্রের সাহায্যে তা দেখাও।

§ ২৬. প্রাচীন গ্রীক পুরাণ

(দ্র. মানচিত্র ৪ এবং ৫)

মনে করতে চেষ্টা করো—পুরাণ কাকে বলে (§ ১৩:১); সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির কোন্ পুরাণ তোমার মনে আছে।

১. গ্রীসের ইতিহাসে পুরাণের তাৎপর্য। গ্রীকদের দ্বারা রচিত পুরাণ হলো গ্রীসের জনগণের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের একটি সূত্র। এই সব পুরাণ প্রথমদিকে
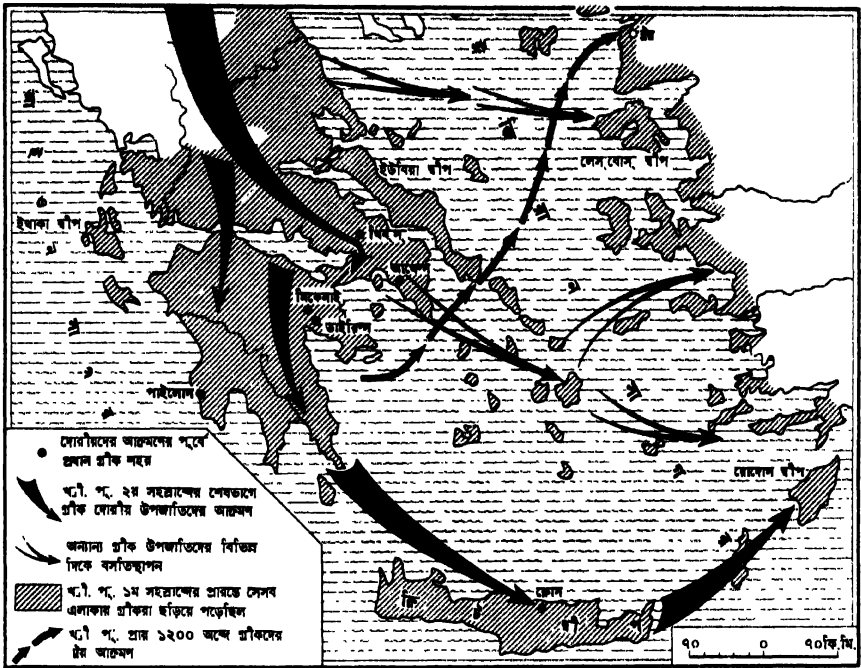
খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে গ্রীক বসতি।

শ্রুতির মাধ্যমে পুরুষানুক্রমে যুগ থেকে যুগে সঞ্চারিত হতো, পরে অবশ্য সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুরাণের বহু চরিত্র ও তাদের কীর্তিকলাপ কল্পিত হলেও সেখানে আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রাচীন গ্রীকদের সংগ্রাম, তাদের দৈনন্দিন জীবনধারা, শ্রমের হাতিয়ার, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও কোন্ কোন্ দেশে তারা যেত—সবকিছু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। গ্রীসবাসীগণ কোন্ দেব-দেবীদের বিশ্বাস করতো, তাও জানা যায় এই পুরাণ থেকেই।

ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে গ্রীক পুরাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না গ্রীসে দোরীয় উপজাতির আক্রমণের পরে দীর্ঘকাল কোনো লিপি ছিল না।

২. হেরাক্লেস সম্পর্কীয় পুরাণ। গ্রীকরা মহাবীর হেরাক্লেসের* শৌর্যগাথা সম্পর্কীয় পুরাণ খুবই ভালবাসতো।

---

* বাংলায় হার্কিউলিস্ নামে পরিচিত। মূল গ্রীক 'হেরাক্লেস' পরে রোমে 'হার্কুলেস' হয়ে যায়, লাতিন শব্দ থেকেই প্রথমে ইংরেজিতে, আর তা থেকে পরে বাংলায় আমরা শব্দটিকে গ্রহণ করি। প্রসঙ্গত, একই দেব-দেবী গ্রীসে ও রোমে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছিল। বাংলায় সাধারণত রোমে প্রচলিত নামগুলোই আমরা জানি। — অনু.

সে সব কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, বিরাটাকার এক সিংহ মানুষ, পশু সকলের উপরই আক্রমণ করতো। সিংহটির চামড়া এত পুরু ও শক্ত ছিল যে ব্রোঞ্জের তৈরি তীরও তার গায়ে না লাগে ছিটকে যায়। হেরাক্লেস তখন ওক গাছ ভেঙে বিশাল এক লগুড় বানালেন, সেটা এত ভারি ছিল যে কুড়িজন লোক মিলেও তা ওঠাতে পারতো না। তার পর দুঃসাহসিকভাবে তিনি সিংহের গুহায় প্রবেশ করলেন। সিংহ হেরাক্লেসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু হেরাক্লেস লগুড়াঘাতে তাকে নিরস্ত করলেন, তার পর দুহাত দিয়ে গলা টিপে হত্যা করলেন সিংহকে। অতঃপর সিংহের মোটা চামড়া দিয়ে হেরাক্লেস নিজের জন্য বর্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করলেন।

কর্দমাক্ত জলাশয়ে **হাইড্রা** নামে এক সর্প বাস করতো, তার নয় মাথা, আর শরীর ছিল চকচকে আঁশে ঢাকা। জলাশয় থেকে বেরিয়ে সে পশুর পাল গিলে খেয়ে ফেলতো। হেরাক্লেস হাইড্রার সাথে যুদ্ধে নামলেন, কিন্তু দেখলেন যে, তরোয়াল দিয়ে একটা মাথা কেটে ফেলামাত্রই সে জায়গায় দুটো নতুন মাথা গজিয়ে উঠছে। তখন হেরাক্লেস তাঁর তরুণ সঙ্গীকে সাপের কাটামাথা সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। এর ফলে নতুন মাথা আর গজাতে পারলো না এবং সর্পরূপী দৈত্যাকে তিনি ধ্বংস করলেন।

সম্রাট আভ্‌গিয়াসের পাঁচ হাজার ষাঁড় ছিল। পশুশালা কখনো কেউ পরিষ্কার করতো না, ফলে গোয়ালে বিপুল পরিমাণ নোংরা জমা হয়। হেরাক্লেস কথা দিলেন যে, একদিনে তিনি সবকিছু পরিষ্কার করে ফেলবেন। যে সময়ে সম্রাট তাঁর অতিথিদের সাথে ভোজোৎসবে ব্যস্ত ছিলেন, হেরাক্লেস সে সময় নিকটবর্তী দুটি নদীতে বাঁধ দিয়ে তাদের রুদ্ধগতি করে দিলেন এবং তাতে করে আশপাশের অঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেল। প্লাবনের জলস্রোতে পশুশালার সমস্ত নোংরা ময়লা ধুয়ে সাফ হয়ে গেল।

স্বর্ণ আপেলের খোঁজে হেরাক্লেস দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন। গ্রীস থেকে বহুদূরে পশ্চিমে সমুদ্রোপকূলে এক উদ্যানে সোনার আপেল ফলতো। সেখানে, গ্রীকরা মনে করতো, আকাশ মাটিতে গিয়ে মিশেছে এবং শক্তিশালী মহাবীর আৎলান্তোস* পৃথিবীর উপর অর্ধবৃত্তাকার ছাদ স্বরূপ বিশাল মহাকাশ নিজের কাঁধের উপরে ধরে রেখেছেন। পুরাণকথিত এই বীরের নাম অনুযায়ীই মহাসাগরের নাম হয় 'আটলাণ্টিক' — (Atlantic ocean)। হেরাক্লেসকে দেবার জন্য যতক্ষণ আৎলান্তোস গাছ থেকে স্বর্ণ আপেল পড়েছিলেন ততক্ষণ হেরাক্লেসকে নিজ কাঁধে আকাশ ধরে রাখতে হয়েছিল। প্রচণ্ড ভারের ফলে তাঁর পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে যায়, হাড় মড়মড় করে ওঠে, সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরতে থাকে।

* এই বীর দু'নামে পরিচিত। সর্বাধিক পরিচিত নাম ইংরেজিতে এ্যাট্‌লাস (গ্রীক Atlas — আৎলাস্‌), অন্যটি Atlantos — আৎলান্তোস। — অনু.

১. সিংহের সাথে যুদ্ধরত হেরাক্লেস। (প্রাচীন গ্রীক মূর্তি।) ২. দাইদালাস্ ও ইকারাস্। (প্রাচীন গ্রীক রিলীফ।) লক্ষণীয়, দাইদালাস্ সাধারণ কারিগরের পোষাক পরিধান করে আছেন।

পুরাণে হেরাক্লেসের আরও কীর্তির বিবরণ আছে। **হেরাক্লেসকে অক্লান্ত কর্মী ও বীর রূপে গ্রীকগণ অত্যন্ত সম্মান করতো।** দোরীয়গণ তাঁকে নিজেদের পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করতো এবং তাঁর জন্য গর্ববোধ করতো।

৩. আর্গোনৌতেস্‌দের সম্পর্কে পুরাণকথা। ককেশাস পর্বতাঞ্চলে কৃষ্ণ সাগরীয় উপকূলে কোনো এক স্থানে অরণ্যমধ্যে একটা স্বর্ণপশমী **মেষচর্ম** ঝুলতো। সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলের যিনি রাজা, তিনি এই চামড়াটির মালিক ছিলেন। এই মেষচর্মটিকে আবার পাহারা দিতো সদাজাগ্রত এক ড্রাগন।

গ্রীসের সর্বত্র থেকে সাহসী বীরপুরুষেরা একত্রে মিলিত হয়ে সোনার পশমে ভরা এই মূল্যবান মেষচর্মটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক দূরদেশে পাড়ি জমায়।

এই দলের নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন সেকালের বিখ্যাত এক যুবক ইয়াসোন*। সুদক্ষ কারিগর আর্গ তাদের জন্য দাঁড়-টানা পাল-তোলা একটা কাঠের জাহাজ তৈরি করে দেন। তাঁর নামানুসারেই জাহাজের নামকরণ হয় 'আর্গো' আর অভিযাত্রীদের নাম দেয়া হয় আর্গোনৌতেস্**।

বহু দিন ধরে অজানা রহস্যভরা সমুদ্র পাড়ি দিতে থাকে আর্গো-নাবিকেরা। সাগরাবৃত বিভিন্ন শৈল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়; কোনো কোনো স্থানে শৈল্যবিভক্ত গিরিখাত অতি সংকীর্ণ, কোথাও-বা আবার তা পরস্পরসংলগ্ন। এসব কারণে জাহাজ ভয়ঙ্কর শব্দে সজোরে শিলার উপরে ধাক্কা খেত, ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যেত, সংকীর্ণ গিরিখাত কোনো রকমে পার হয়ে যেত। ডুবো পাহাড় শুধুমাত্র জাহাজের হালের নিম্নতম কাঠকে একটু ক্ষতিগ্রস্ত করতো।***

বহু রোমাঞ্চকর ঘটনার পর আর্গোনৌতেস্‌রা ককেশাস অঞ্চলে গিয়ে পোঁছয়। সম্রাট বললেন, ইয়াসোন যদি কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন তা হলে তিনি স্বর্ণপশমী মেষচর্ম দিয়ে দেবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে ইয়াসোন মারা পড়বেন।

সম্রাটতনয়া মিদিয়া ঠিক করলেন যে, তিনি ইয়াসোনকে সাহায্য করবেন। তিনি ইয়াসোনকে এক যাদুকরী মলম দিলেন সমস্ত শরীরে মাখবার জন্য। মলম লাগানোর পর ইয়াসোন অসাধারণ শক্তি অর্জন করলেন: তাঁর পদযুগল তাম্রনির্মিত স্তম্ভের ন্যায় সুদৃঢ় হয়ে উঠলো, আর হস্তদ্বয় সাঁড়াশীর ন্যায় সুকঠিন। সম্রাটের ভৃত্যেরা দুটি ভয়ঙ্কর ষাঁড় ছেড়ে দিলো, তারা নিঃশ্বাসে আগুন ছড়ায়। মাথা নিচু করে শিং উঁচিয়ে তারা ইয়াসোনকে আক্রমণ করলো, কিন্তু স্বস্থান থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্রও নড়াতে পারলো না। সম্রাটের নির্দেশে তিনি ষাঁড়দুটোকে ধরে লাঙলে জুতে দিলেন, তাদের দিয়ে ক্ষেত চষে সেখানে ড্রাগনের দাঁত বপন করা হলো।

বপন করা দাঁত থেকে প্রথমে জমির মাটি ফুঁড়ে অন্তহীনভাবে বর্শা এবং শিরস্ত্রাণের অগ্রভাগ বেরিয়ে আসতে লাগলো, তার পর বেরিয়ে এলো তামার তৈরি বর্ম পরিহিত এক বিরাট সেনাবাহিনী। সমগ্র বাহিনী ভয়াল বিক্রমে

* ইয়াসোন (Yason) — ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী 'জেসন্' নামে আমাদের দেশে পরিচিত। — অনু.

** আর্গোনৌতেস্ — গ্রীক শব্দ Argonautes: Argo জাহাজ+nautes অর্থাৎ জাহাজী, নাবিক, মাঝিমাল্লা। ইংরেজিতে অবশ্য 'আর্গোনট' উচ্চারণ করা হয় এবং বাংলাতেও সেভাবে চালু। — অনু.

*** পুরাণ বর্ণিত এই বর্ণনায় শিলাকীর্ণ যে সমুদ্রপথের কথা বলা হয়েছে, তা যদ্দুর মনে হয়, ঈজিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগরে যাওয়ার জলপথের দৃশ্য।

ইয়াসোনকে আক্রমণ করে বসলো। ইয়াসোন তখন একটা পাথর ছুড়ে সারিবদ্ধ সৈন্যদলের মধ্যে ফেলে দিলে তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মারামারি শুরু করে দেয়, আর সেই ফাঁকে নিজের তরবারি নিয়ে তিনি এক এক করে সমস্ত সৈন্য নিহত করলেন।

ইয়াসোন তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সম্রাট কিন্তু তাঁকে অঙ্গীকার মতো স্বর্ণপশমী মেষচর্ম দিতে অস্বীকার করলেন। তখন মিদিয়া যাদুবিদ্যা দ্বারা প্রহরারত ড্রাগনকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে মেষচর্ম নিয়ে আর্গোনৌতেসরা জাহাজে চড়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। তখন সম্রাট নিজের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া করেন। আর্গো-নাবিকরা বহুকষ্টে সম্রাটের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে গ্রীসে ফিরে আসে।

দাইদালাস্ ও ইকারাসের কাহিনী

গ্রীক জনগণের কোন স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছে তাদের পুরাণে?

ক্রিট দ্বীপে সম্রাটের প্রাসাদে বহু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নির্মাতা সুদক্ষ কারিগর, স্থপতি ও ভাস্কর দাইদালাস্* বাস করতেন। দ্বীপ থেকে বাইরে কোথাও বেরিয়ে যাবার হুকুম ছিল না তাঁর। এর ফলে পাখির পালক ও মোমের সাহায্যে তিনি নিজ সন্তান ইকারাস ও নিজের জন্য ডানা তৈরি করলেন। দেহে ডানা জুড়ে তাঁরা ক্রিট দ্বীপ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলেন। দাইদালাস্ পূর্বেই নিজের ছেলেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে যেন সূর্যের বেশি কাছে না যায়। প্রথমে ইকারাস পিতার পশ্চাদগমন করলেও পরে আকাশের খুব উঁচুতে উড়তে লাগলো। সূর্যের উত্তাপে মোম গলে গেল আর ইকারাস সমুদ্রে পড়ে ডুবে গেল; শুধুমাত্র তার ডানার পালক ভাসতে লাগলো সমুদ্রের জলে। দাইদালাস্ উড়ে সিসিলি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছুলেন।

? ১. হেরাক্লেস ও আর্গোনৌতেস্ সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণে কোন্ কোন্ ধরনের কাজের কথা বলা হয়েছে? ২. গ্রীসে সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব সম্পর্কে পুরাণে কথিত উপাখ্যানগুলোয় কোন্ তথ্য পাওয়া যায়? ৩. গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী মানুষের কোন্ গুণকে গ্রীসবাসীগণ সবচেয়ে মূল্য দিত? গ্রীকরা খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো এরকম কমপক্ষে মানুষের চারটি চারিত্রিক গুণাবলীর উদাহরণ দাও। ৪. আকাশ প্রাচীন গ্রীকরা কীভাবে কল্পনা করেছিল? এ জাতীয় কল্পনা পূর্বে আর কোথায় তোমরা দেখেছো? ৫. এই বইয়ের মধ্যে বর্ণিত হেরাক্লেসের বিভিন্ন কাহিনীর জন্য শিরোনামা চয়ন করো।

* গ্রীক Daidalos ও Ikaros নামদুটি ইংরেজিতে Daedalus ও Icarus লেখা হয়। —অনু.

§ ২৭. হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি'

(দ্র. মানচিত্র ৪ এবং ১৫১ পৃষ্ঠার মানচিত্র)

মনে করতে চেষ্টা করো — সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাদের বলা হতো (§ ৫:৪)।

১. মহাকাব্যের জন্মকথা। প্রাচীন গ্রীক চারণকবিগণ বীরদের বিভিন্ন কীর্তি ও রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্বন্ধে গান রচনা করে তারের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তা গাইতেন। বিশেষত গ্রীকদের ট্রয় অভিযান নিয়ে বহু গান রচিত হয়েছিল।

ত্রোইয়া* বা **ইলিওন** শহরটি এশিয়া মাইনরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। উঁচু টিলার উপরে নির্মিত এই নগরের চতুর্দিকে প্রস্তর প্রাচীরের বেষ্টনী একে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। বিভিন্ন গ্রীক উপজাতি, স্ব-স্ব রাজ্যাধিপতির নেতৃত্বে এই নগর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করে। গ্রীকরা সমুদ্রতীরের উপর তাদের কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ টেনে নিয়ে গিয়ে শিবিরস্থাপন করে ১০ বৎসর ধরে ট্রয় অবরোধ করে রাখে।

ট্রয় অভিযান সম্বন্ধীয় সমস্ত সংগীত একত্রিত করে **'ইলিয়াদ'** এবং **'ওদিসি'** নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করা হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী বিখ্যাত অন্ধ কবি **হোমার**** এই সব সংগীত সংকলন ও পরিবর্তন-পরিমার্জন করেছিলেন। খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে মহাকাব্যদ্বয় লিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. 'ইলিয়াদের' বিষয়বস্তু। ইলিওন শহরের নামানুসারে কাব্যের নামকরণ করা হয়েছিল 'ইলিয়াদ'। 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যে ট্রয় অবরোধের দশম বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সুদীর্ঘ কাল ধরে ট্রয় নগরীর ব্যর্থ অবরোধের ফলে গ্রীক যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে যায়। তখন সৈন্যবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নেতৃবর্গ এক সভা আহ্বান করে। গ্রীক শিবিরের ময়দানে চঞ্চল সেনাদল মহা হৈচৈ করে সমবেত হলো। সভায় **থের্সিতেস** নামে জনৈক সাধারণ যোদ্ধা নির্ভয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করে যে, লুঠের মাল তারাই সব আত্মসাৎ করেছে। সৈন্যবাহিনীকে স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায় সে। সেনাপতিদের একজন — **ওদিসিউস** — তখন থের্সিতেসকে নির্মমভাবে প্রহার করে তাকে নিরস্ত হতে বাধ্য করেন।

* এখানে ট্রয় নগরীর কথা বলা হচ্ছে। Troia ত্রোয় (Troy) নগরীরই আরেক নাম। বাংলায় ইংরেজি উচ্চারণের অনুকরণে আমরা 'ট্রয়' লিখে থাকি, যদিও আসলে এর উচ্চারণ 'ত্রোয়'। — অনু.

** কবি হোমারের প্রকৃত নাম হোমেরোস (Homeros), কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হতে পারে বলে প্রচলিত বানানই বহাল রাখা হয়েছে। — অনু.
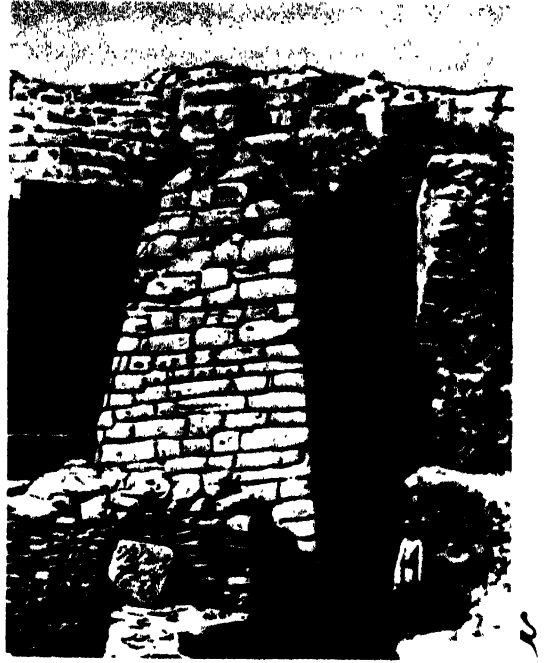
১. প্রাচীন গ্রীসে মহাকবি হোমারের আবক্ষ মূর্তি। গ্রীসের সাতটি শহরের মধ্যে সব সময়েই তর্ক চলতো হোমারের জন্মস্থান নিয়ে; প্রত্যেক শহরই দাবি করতো যে হোমার সেই শহরের সন্তান। ২. খননকার্যের পর আবিষ্কৃত ট্রয় নগরীর প্রাচীর।

সৈন্যদের ট্রয় অবরোধ চালিয়ে যাওয়ায় সম্মত করাতে সেনাপতিদের খুবই বেগ পেতে হয়েছিল।

গ্রীক ও ট্রয়বাসীদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে গ্রীকরা উপজাতি ও বংশগৌরব অনুযায়ী বিভিন্ন সেনাদলে বাহিনীকে ভাগ করে। সাধারণ যোদ্ধারা পদাতিক সেনা হিসেবে ক্যাম্বিসের তৈরি বর্ম পরে যুদ্ধে যায়। তাদের হাতিয়ার ছিল শুধু পাথর ও বর্শা। দলপতিরা যুদ্ধ করতো অশ্ববাহিত যুদ্ধরথে চড়ে, তাদের নিকট থাকতো বর্শা, তাছাড়াও ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি তরবারি; তাম্রনির্মিত বর্মে তাদের দেহ সুরক্ষিত থাকতো।

গ্রীক বাহিনীতে শ্রেষ্ঠ ও 'সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতি' যোদ্ধা হিসেবে গণনা করা হতো আখিলেস্‌কে; তিনি গ্রীসের একটি উপজাতির নেতা ছিলেন। হেক্তোর গণ্য হতেন ট্রয়-বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী বীররূপে। এই উভয় বীরের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনাই 'ইলিয়াদে' লিপিবদ্ধ হয়েছে। (দ্র. বর্তমান পরিচ্ছেদের অন্তিমে সংশ্লিষ্ট টীকা)

'ইলিয়াদে' কথিত হয়েছে যে, বিভিন্ন দেব-দেবীও এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। দেব-দেবীদের একাংশ গ্রীকদের পক্ষ নিয়েছিলেন, আরেক অংশ যোগ দিয়েছিলেন ট্রয়বাসীদের দিকে। দেব-কর্মকার হেফেস্টুস আখিলেসের বর্ম নির্মাণ করে দেন।

৩. ট্রয় ধ্বংস। ট্রয় যুদ্ধের শেষ দিকের ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায় অন্যান্য কাহিনীতে।

হেক্তোরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের অল্প কিছুক্ষণ পরেই আখিলেসের মৃত্যু হয়। পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হবার ফলে তিনি মারা যান। গ্রীক পুরাণ অনুসারে — আখিলেসের মাতা জনৈকা দেবী শিশু সন্তানকে জন্মের পরই ভূগর্ভস্থ এক নদীতে স্নান করান। এর ফলে একমাত্র পায়ের গোড়ালি (যা ধরে দেবীমাতা স্নান করিয়েছিলেন) ছাড়া আখিলেসের সমগ্র শরীর অভেদ্য হয়ে ওঠে। পুরাণোক্ত এই কাহিনী হতেই পাশ্চাত্যে এই বাগ্‌বিধির উদ্ভব: heels of Achilles (আখিলেসের গোড়ালি), অর্থাৎ 'সর্বাপেক্ষা দুর্বল স্থান'।

ট্রয় জয়ের জন্য গ্রীকদের বহু ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 'কূটবুদ্ধি' ওদিসিউসের পরামর্শক্রমে গ্রীকরা এক বিরাট কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করে। এই ঘোড়ার পেটের ভিতরে কিছু সৈন্য আত্মগোপন করে থাকে, আর বাদ বাকি সৈন্য আশ্রয় নেয় নিকটস্থ একটি দ্বীপে। ট্রয়বাসীগণ এই অতিকায় কাঠের ঘোড়াটিকে নগরপ্রাচীর ভেঙে শহরের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। রাত্রিকালে ঘোড়ার পেট থেকে যথারীতি গ্রীক সৈন্য বেরিয়ে এসে নিদ্রিত ট্রয় জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে লুকিয়ে থাকা গ্রীক বাহিনীও সেখান থেকে এসে আক্রমণ চালালো। গ্রীকরা ট্রয়ের সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করে নেয়। সমস্ত শহর লুণ্ঠন করার পর তারা আগুন ধরিয়ে ট্রয় নগরী ধ্বংস করে দেয়। লুণ্ঠিত প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে তারা গ্রীস অভিমুখে যাত্রা করে। 'ট্রয়ের অশ্ব' উক্তিটি তাই সে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় যেখানে কোনো উপহার গ্রহীতার জন্য বিপদ টেনে আনে।

৪. 'ওদিসি' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। ওদিসিউস তাঁর মাতৃভূমি ইথাকা দ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পথে যে সব রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল এই কাব্যে তার বর্ণনা আছে। ইথাকা দ্বীপ গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

ইথাকার যোদ্ধাগণ বারোটি জাহাজে চড়ে উপকূল ছেড়ে দেশের পথে পাড়ি দিলো, তখনো জ্বলন্ত ট্রয়ের ধূম্রশিখা সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নি। হিমেল উত্তর বায়ুর দেবতা প্রচণ্ড ঝটিকা সৃষ্টি করার ফলে গ্রীকগণ পথ হারিয়ে ফেললো। দু'বার ওদিসিউস ও তাঁর সঙ্গীরা দৈত্যদের দ্বীপে আটকা পড়ে। দৈত্যগণ বিশাল

পাথরের আঘাতে এগারোটি জাহাজ চুরমার করে ফেলে এবং তাদের সব যোদ্ধাকে মেরে ফেলে। শুধুমাত্র ওদিসিউসের জাহাজ দূরে সমুদ্রে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওদিসিউসের সঙ্গীরা বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা জিউসকে রুষ্ট করায় দেবতা বিদ্যুৎঝলকে জাহাজ ধ্বংস করে দেন। ওদিসিউস জাহাজের ভাঙা মাস্তুল ধরে অতিকষ্টে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পেঁাছন।

দশ বৎসর ধরে বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর ওদিসিউস ইথাকায় এসে পেঁাছেছিলেন। প্রথমেই যার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে সে শূকরচারণরত এক দাস। এই দাস জন্মেছিল এক স্বাধীন পরিবারে, কিন্তু তার বাল্যাবস্থাতে ফিনিসীয়রা তাকে চুরি করে ইথাকায় এনে বিক্রি করে দেয়। ওদিসিউসের অনুপস্থিতিকালে তাঁর গৃহ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ভোগদখল করছিল। সেজন্য ভিক্ষুকবেশে তিনি নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তার পর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সকলকে হত্যা করে ওদিসিউস ইথাকায় আবার রাজত্ব করতে লাগলেন।

৫. গ্রীক ইতিহাস চর্চায় মহাকাব্যদ্বয়ের তাৎপর্য। হোমারের মহাকাব্যে কল্পকাহিনীর পরিমাণ এত বেশি যে, বিশেষজ্ঞগণ বহুকাল যাবৎ ভেবেছেন যে কাব্যবর্ণিত ঘটনাবলী সবই কল্পিত। এমন কি অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ট্রয় নামে কোনো নগরীর অস্তিত্বই ছিল না।

এশিয়া মাইনরের একটি টিলার উপরে সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয়। তখন দেখা গেল যে, ঐ জায়গাটিতে মানুষজন বিভিন্ন সময়ে অন্তত দশবারেরও বেশি বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতিটি বসতিস্থাপনের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া গেছে—হয় ভাঙা ঘরবাড়ির চিহ্ন, নয়তো মাটিতে প্রোথিত নানান জিনিসপত্র। ট্রয় শহরের ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেছে, সেখানে অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষ্য বিদ্যমান।

খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, ট্রয় নগরী এককালে বিদ্যমান ছিল এবং তাকে ধ্বংস করা হয়। খ্রী. পূ. ১২০০ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে গ্রীকরা ট্রয় অভিযান করেছিল। কবিকল্পনা ছেড়ে দিলেও বহু কিছু সম্পর্কে যথার্থ তথ্য আমরা এ দুটি মহাকাব্য থেকে জানতে পারি, যেমন—প্রাচীন গ্রীকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন, তাদের ঘরবাড়ি, শ্রম-হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও সামাজিক লোকাচার। গ্রীসের ইতিহাসে হোমারীয় মহাকাব্যদ্বয় এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১১শ-৯ম শতককে **হোমারীয় যুগ** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হোমারের মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। গভীর ভাবব্যঞ্জক গম্ভীর, সমৃদ্ধ ও সুমধুর কাব্যভাষায় তা রচিত হয়েছে। (§ ২৭, ২৮ ও ২৯-য়ের শেষভাগে কাব্যদ্বয় হতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।)

১

২
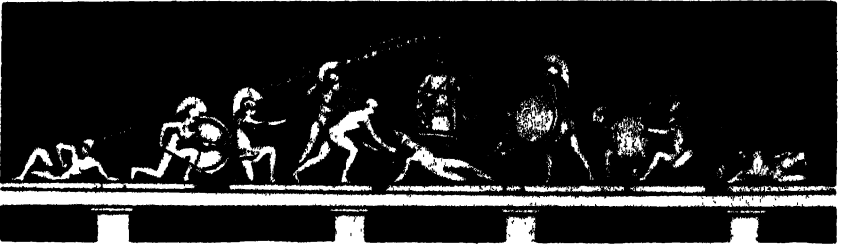
১. ট্রয় যোদ্ধাদের দ্বারা নিহত গ্রীক যোদ্ধা পাত্রোক্লুসের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম! (খ্রী. পূ. ৫ম শতকে নির্মিত মূর্তি।) মাঝখানে দণ্ডায়মানা যুদ্ধের দেবী আথেনা — ইনি গ্রীকদের পক্ষে ছিলেন। পাত্রোক্লুসকে দেবীর পদতলে শায়িত দেখা যাচ্ছে। ২. ওদিসিউস এবং সিরেন। (গ্রীক ফুলদানীর উপর চিত্রাঙ্কিত গ্রীক পুরাণ অনুসারে— সিরেনরা ছিল অর্ধপক্ষী ও অর্ধনারী, দেহ ছিল তাদের পাখির ন্যায় আর মাথা ছিল মেয়েদের। জনমানবশূন্য দ্বীপে তারা থাকতো, জাহাজের নাবিকদের তারা গান গেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে পরে হত্যা করতো। ওদিসিউস তাঁর সমুদ্রযাত্রায় যখন এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নাবিকদের নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেদের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে ফেলে এবং তাঁকে জাহাজের মাস্তুলে বেঁধে রাখে। ওদিসিউসই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সিরেনদের গান স্বকর্ণে শুনতে পেয়েও মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন।

'ইলিয়াদ' থেকে। আখিলেস্ ও হেক্তোরের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ

গ্রীকপক্ষে সহায়তাদাত্রী দেবী আথেনা হেক্তোরের ভাইয়ের মূর্তি ধারণ করে ধূর্ততার সঙ্গে হেক্তোরকে আখিলেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আখিলেস হেক্তোরকে লক্ষ্য করে প্রথম বর্শা ছুঁড়ে মারেন, কিন্তু হেক্তোর চট করে মাথা হেঁট করে ফেলায় বর্শা মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যায়। এরপর হেক্তোর বর্শা ছুঁড়লে তা আখিলেসের বর্মে প্রতিহত হয়ে গেল, হেফেস্তুস কর্তৃক নির্মিত ঢাল সে আঘাত সহ্য করলো। আথেনা তখন আখিলেসকে বর্শা আগিয়ে দিলেন। হেক্তোর বৃথাই তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে ডাকাডাকি করলেন, কেউই এসে নতুন কোনো বর্শা আর তাঁর হাতে তুলে দিলো না। তখন তিনি তরবারিহস্তে আখিলেসের দিকে অগ্রসর হলেন:

'...নিষ্কাশিয়া তরবারি, তীক্ষ্ণ, বিজুরীর সম,
সুবিশাল, মহাভার, কোষবদ্ধ ছিল যা মুহূর্তেক আগে
শোভমান পরাক্রমী জঙ্ঘা উপরি, ধাইলেন মহাবীর

আখিলেস হেক্তোরকে নিহত করার পর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। (গ্রীক ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।)

যেমতি-বা মহাশ্যেন সমুচ্চ মেঘের মিনারে
নিম্নে দৃষ্টি ফেলে দেখে' কোনো শান্ত শিশুছাগ
কিংবা সদাভীত ক্ষুদ্র শশক মুহূর্তে নামি' আসে
ছিঁড়ি কালো মেঘের গহ্বর পৃথিবীর বুকে,
তেমতি হেক্তোর বীর আক্রমিলা দুর্মদ, হাতে কৃপাণ ঝলসি'।
ঘূর্ণিবাত্যাসম দুর্ধর্ষতা নিজ করি সংহত
হুঙ্কারি আক্রমিলা বীর আখিলেস।
বক্ষ আবরিত বর্মে, মহাতেজা, নয়নলোভন;
শিরোদেশে শোভে তাঁর মহাকায় শিরোস্ত্রাণ
ত্রিশূল আকার, তন্নিম্নে শোভিতেছে চক্রের আড়ালে
স্বর্ণাভ অলকগুচ্ছ — মহাশক্তিধর তাও হেফেস্তুস বরে।'

আখিলেস্ বর্শাবিদ্ধ করে হেক্তোরকে হত্যা করেন। অতঃপর রথে এই ট্রয়বাসী নিহত বীরকে বেঁধে নিয়ে উৎসবমত্ত গ্রীক শিবিরের পানে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন।

'ওদিসি' থেকে। কিক্লোপ্সদের দ্বীপে গ্রীকরা

গ্রীকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন সম্বন্ধে এখানে নতুন কী জানতে পারছো?

পথ হারিয়ে ওদিসিউস ও তাঁর সঙ্গীরা একটি দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই দ্বীপে থাকতো কিক্লোপ্স* নামে একদল দৈত্য, তাদের কপালের মধ্যখানে একটিমাত্র চোখ। ওদিসিউস কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এক কিক্লোপসের গুহায় প্রবেশ করেন। গুহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পনিরের চাঁই এবং ভাঁড়ভর্তি দই ছিল। কিক্লোপ্সরা ভেড়া আর ছাগল চরাতো।

* গ্রীক kyklops, ইংরেজিতে cyclops লেখা হয়। — অনু.

১

২

১. গ্রীসে কৃষিকর্মের চিত্র। (গ্রীক ফুলদানীর উপরে খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে অঙ্কিত ছবি।) ক্ষেতমজুরেরা লাঙ্গল চষছে আর নিড়ানি দিয়ে কাজ করছে। ক্ষেতমজুরেরা দাস ছিল না, স্বাধীন ছিল; কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র ছিল বলে সাময়িক ভাবে তারা এধরনের কাজ বেছে নিত। নিজের মাঠে চাষী নয়, ক্ষেতমজুর যে কাজ করছে—তা এই ছবি দেখে কীভাবে বোঝা যাচ্ছে? ২. বিশাল উদুখলে শস্য মাড়াইয়ের কাজ চলছে। (গ্রীক ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।)

'বিশাল দানবশরীর দৈত্য এক থাকিত গুহায়,
কর্ম ছিল রাখালিয়া, ছিল সে একাকী,
ছাগ ও মেষের পাল চরানোই কাজ;
ঘনিষ্ঠ কাহারো নয়, ক্রোধান্ধ ভীষণ,
নহে বশীভূত কোনো আইন-নীতির;
ভয়ালদর্শন তার বিশাল শরীর, দেখিলেই তারে
ত্রাসে কাঁপে বুক, সামান্য তণ্ডুলাহারী
সামান্য মানব পানায় সন্ত্রাসে দূরে, যেন সে বিটপী
অথবা সে পাহাড়ের বন্য শীর্ষচূড়,
চড়ায় আতঙ্ক শুধু চতুঃসীমায়।'

সন্ধ্যার সময়ে কিক্লোপস্ তার পশুপাল তাড়িয়ে নিয়ে গুহায় ফিরে এসে প্রবেশমুখে এক বিরাট পাথরের চাঁই দিয়ে গুহামুখ বন্ধ করে দিলো। ওদিসিউস বা তাঁর সঙ্গীদের কারোরই ঐ পাথর সরাবার সাধ্য ছিল না। গুহায় গ্রীকদের দেখে সে তখনই দুজনকে মেরে খেয়ে ফেলে, পরের দিন আরো চারজনকে খায়। তখন ওদিসিউস কৌশলে তাকে আঙুরের সুরা পান করালেন। মদ খেয়ে দৈত্য ঘুমিয়ে পড়লে ওদিসিউস ও বাদবাকি জীবন্ত গ্রীকরা তীক্ষ্ণমুখ কোনো দণ্ড নিয়ে দৈত্যের চোখ বিদ্ধ করে তাকে অন্ধ করে দেয়। প্রত্যুষে অন্ধ কিক্লোপস নিজের

ছাগল ও ভেড়ার পালকে চরতে দেবার জন্য গুহামুখ থেকে পাথরের চাঁই সরিয়ে ফেলে গুহাদ্বারে বসে রইলো, যাতে কোনো মানুষ না বেরুতে পারে। তখন ওদিসিউসের পরামর্শক্রমে তিনটি ভেড়াকে একত্র বেঁধে একেক জন লোককে তাদের পেটের সাথে বাঁধা হলো। এইভাবে গ্রীকরা দৈত্যকে বুঝতে না দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। গুহা থেকে পরিত্রাণ পেয়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জাহাজে এসে চড়ে বসে এবং ঐ ভয়ঙ্কর দ্বীপ থেকে বিদায় নেয়।

?

১. 'ইলিয়াদ' এবং 'ওদিসি' কবে, কার দ্বারা রচিত হয়েছিল, বলো।
২. হোমারীয় যুগে গোত্রপরিচয় রক্ষার ব্যাপারে এই মহা কাব্যদ্বয়ে কী তথ্য পাওয়া যায়? গ্রীকদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কোনো প্রমাণ মেলে কি? সামাজিক বৈষম্য প্রমাণ করার জন্য অন্তত পক্ষে চারটি উদাহরণ দাও। ৩. বর্তমান পর্বের শেষে সংশ্লিষ্ট কালপঞ্জীতে (পৃঃ ২৫৪) হোমারীয় যুগ খুঁজে বের করো। আনুমানিক কত শতাব্দী পূর্বে এর শুরু ও শেষ? ৪. হোমারের মহাকাব্যে তোমার কী ভাল লাগে? ৫. প্রাচীন বঙ্গদেশে কি হোমারীয় কাব্যের মতো কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল? সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির কোথাও কি তোমরা অনুরূপ কোনো কাব্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছো?

§ ২৮. খ্রীষ্টপূর্ব ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনযাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব

মনে করতে চেষ্টা করো — মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে লৌহ ব্যবহারের তাৎপর্য কী ছিল (§ ১৬: ২)।

গ্রীক পুরাণ ও হোমারের মহাকাব্য থেকে তোমরা প্রাচীন গ্রীসের জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলে। § ২৮ পাঠ করার সময়ে সেসব কিছু স্মরণে রেখো, কেন না হোমারীয় যুগে গ্রীক ইতিহাসের তা পরিপূরক পূর্বজ্ঞান।

১. কৃষিকার্য ও হস্তশিল্প। হোমারীয় যুগে গ্রীকদের প্রধান পেষা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন।

পাথুরে জমিতে হাল চাষের জন্য গ্রীক জনগণকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো। মাটি থেকে পাথর বেছে ফেলে কাঠের লাঙল দিয়ে তিন-চার বার তা চাষ করতো, তার পর কোদাল দিয়ে আরো ভালো করে কুপিয়ে ক্ষেতের মাটি একেবারে ঝুরঝুরে করে ফেলতো। তবু তাদের এত শ্রমও অনেক সময়ই বিফল হতো। অনাবৃষ্টির দরুন ফসল জ্বলে যেত, আবার মুষলধার বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে জলের ঢল নেমে শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করে দিত।

গ্রীকরা প্রধানত যবের চাষ করতো। অনাবৃষ্টিতে যব নষ্ট হয় না, আর তাছাড়া ফসলে পাক ধরে খুব তাড়াতাড়ি। যবের রুটি ও পায়েস তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। গম চাষের প্রচলন তেমন ছিল না, কেন না পাথুরে মাটিতে গম ফলানো খুব কঠিন

ছিল। (গ্রীক অধিবাসীদের নিকট কোন্ ফলমূলের গাছ বেশি পরিচিত ছিল? তারা কোন্ ধরনের গবাদি পশু পালন করতো, মনে করে দেখো।)

কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় সবই নিজ হাতে প্রস্তুত করতো: যেমন, পশমের তৈরি মোটা কাপড়, বিছানায় বিছাবার চাদর, বাসনকোসন, পায়ে পরবার হালকা চপ্পল।

খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে গ্রীসে লৌহনির্মিত দ্রব্যাদির উদ্ভব ঘটে। অবশ্য প্রথম দিকে তার সংখ্যা ছিল খুবই কম। (গ্রীক ও ট্রয়বাসীদের অস্ত্রশস্ত্র কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি হতো, মনে করে দেখো।) ট্রয় অবরোধের সময়ে গ্রীকদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার প্রধান পুরস্কার ছিল একটুকরো লৌহখণ্ড।

লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি বিস্তারলাভ করার পর জমি চাষবাস করা সহজতর হয়েছিল, বীজ বপনের পরিমাণ এবং ফসলের ফলনও বেড়ে যায়।

২. সমুদ্রযাত্রা। ঈজিয়ান সাগরে সমুদ্রযাত্রার অত্যন্ত অনুকূল অবস্থা বর্তমান ছিল। হোমারীয় যুগে গ্রীকগণ সমুদ্রে মৎস্যশিকার করতো এবং সমুদ্রপথে দূরদেশে যাত্রা করতো। (গ্রীকদের দূরদেশযাত্রার কোন্ ঘটনা তুমি জানো?) গ্রীকদের কাঠের তৈরি জাহাজ বিশালাকার নৌকার অনুরূপ ছিল। এধরনের জাহাজে পাড়ি জমানো এমন কি ঈজিয়ান সাগরেই বিপজ্জনক ছিল। সেজন্য গ্রীসের লোকজন সমুদ্রযাত্রা করতো শুধুমাত্র শান্ত আবহাওয়ায় এবং দিনের বেলায়। জলপথে উপকূল বরাবর কিংবা দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যেত তারা, আর রাত্রিকালে জাহাজ সমুদ্রতীরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে নোঙর করতো।

৩. হোমারীয় যুগে গ্রীসে উপজাতি ও গোত্র। গ্রীস দেশে প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা অঞ্চলে ও প্রত্যেক দ্বীপে নানা উপজাতির বসবাস ছিল। কয়েকটি গোত্র মিলে একটি উপজাতি হতো এবং কয়েকটি পরিবার মিলে একটি গোত্র।

জমির মালিক হতো সমগ্র গোত্র; প্রত্যেক পরিবারকে জমি দেয়া হতো এবং নিজ নিজ জমিতে তারা চাষবাস করতো। আর পশুপালন করা হতো সর্বজনীন চারণভূমিতে।

গোত্রজ্ঞাতির কেউ নিহত হলে সারা গোত্রই সমবেতভাবে সেই হত্যার প্রতিশোধ নিত, যুদ্ধের সময়ে এইসব জ্ঞাতিভ্রাতারা পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করতো। (যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদের নিয়ে কীভাবে সমরসজ্জা করা হতো? তাদের সেনাপতিপদ গ্রহণ করতো কে?) উপজাতির পুরুষব্যক্তিরা সকলে গণ-সম্মিলনে সমবেত হতো।

গোত্রজ্ঞাতিগণের ভিতরে ইতিমধ্যেই বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। একদল গরিব হয়ে গিয়ে পরের জমিতে ক্ষেতমজুরের কাজ করতো, নয়তো ভিক্ষা করতো। ইথাকায় যখন ওদিসিউস নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন তখন কেউই আশ্চর্য হয় নি; গ্রীসে দরিদ্রের সংখ্যা কম ছিল না। সম্ভ্রান্ত জ্ঞাতিভ্রাতারাই ধনী হয়ে গিয়েছিল।

৪. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক অবস্থা। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ নদী বা খালের তীরবর্তী খুব বড়ো ও ভালো জমির টুকরো পেত। নিজের জমিতে নিজেই কাজ করতো তারা। যেমন ধরা যাক—ওদিসিউস নিজেই জমি চাষ ও ছুতোরের কাজ করতেন। (আর কোন্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষাঁড় দিয়ে জমিতে লাঙ্গল দিত?) অবশ্য জমি আকারে বড়ো হলে তা চাষ করার জন্য দিনমজুর ভাড়া করতেই হতো। দিনমজুরকে তার কাজের বদলে খাবার ও সস্তা জামাকাপড় দেয়া হতো।

লৌহনির্মিত শ্রম-হাতিয়ার আবিষ্কারের পর অন্যের জমি দখল করে নেয়া খুবই সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জমির মালিক দিনমজুর দিয়ে জমি চাষ করিয়ে উল্লেখযোগ্যরূপে বেশি পরিমাণে শস্য পেত, দিনমজুরদের প্রাপ্য দেওয়ার পরেও তা অনেকখানি অবশিষ্ট থাকতো। এই অবশিষ্ট ফসল সে হস্তগত করতো। অন্যান্য গোত্রজ্ঞাতিবর্গের তুলনায় সম্ভ্রান্তবংশীয়দের নিকট পশুপাল ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বেশি, তারা ক্রমে ক্রমে সর্বজনীন চারণভূমিও নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে লাগলো।

যুদ্ধের সময়ে সম্ভ্রান্ত গ্রীকগণ আরো ধনী হয়ে যেত। যুদ্ধবন্দী ও লুণ্ঠিত ধনসম্পদের অনেক তারা নিয়ে নিত। ('ইলিয়াদ' মহাকাব্যে এ প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে? এ ছাড়া আর কীভাবে সম্ভ্রান্তবংশীয় গ্রীকরা দাসদাসী লাভ করতো?) দাসরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করতো: কাপড় বুনতো, গৃহলগ্ন শাকসব্জী-ফলমূলের বাগানে কাজ করতো, পশু চরাতো এবং রান্না করতো।

দিনমজুর ও দাসদের পরিশ্রমে সর্দাররা শুধুমাত্র যে নিজেদের ও স্বপরিবারের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, পোষাকপরিচ্ছদ ও পাদুকা ইত্যাদি পেত তাই নয়, তারা বাড়তি গবাদি পশুর বিনিময়ে তাম্র ও ব্রোঞ্জের তৈরি নানান জিনিসপত্র, সুন্দর সুন্দর কাপড় এবং স্বর্ণালংকার লাভ করতো। এসব জিনিস ছিল মূল্যবান ও মহার্ঘ, যেমন রান্না করার তাম্রনির্মিত তেপায়াযুক্ত পাত্রের বিনিময়মূল্য ছিল ১২টি ষাঁড়।

৫. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শাসন। সর্দার ও মোড়লস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজেদের ধনদৌলত ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রায়শঃই উপজাতিগুলোর উপর বলপ্রয়োগ করতো। (জনৈক সেনাপতি একজন সাধারণ স্পষ্টবক্তা যোদ্ধাকে কীভাবে চুপ করিয়েছিল?) গণ-সম্মিলনের আয়োজন খুবই কম হতে লাগলো: ইথাকায় তো ২০ বৎসরে মাত্র একবার গণসভা বসেছিল। উপজাতিদের যাবতীয় সমস্যাদি সমাধান করতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মোড়লদের পরামর্শসভা।

সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ধনসম্পদ ও শাসনকর্তৃত্বসহ নিজেদের সমস্ত উত্তরাধিকার সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যেত। সাধারণ লোকজনদের চেয়ে নিজেরা উচ্চস্তরের, একথা বোঝাবার জন্য তারা জোরেসোরে প্রচার করতো যে,

খ্রী. পূ. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীসদেশে শ্রেণীর উদ্ভব

তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল দেবতা। ('ইলিয়াদ' মহাকাব্যে কোন্ চরিত্রকে দেবসন্তানরূপে গণ্য করা হয়েছে?)

হোমারীয় যুগে ধীরে ধীরে আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ পরিবর্তিত হয়ে দাসসমাজে পরিণতি লাভ করতে থাকে।

আখিলেসের বর্মে অঙ্কিত চিত্রের বর্ণনা ('ইলিয়াদ' কাব্য হতে)

বর্ম ও প্রাসাদ বর্ণনার ভিত্তিতে সেনাপতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কী জানতে পারি? কীভাবে সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা নিজেদের ধনসম্পদ উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতো?

দক্ষ শিল্পীকরে রূপায়িত দেখ কিবা অরূপশোভন:
দূরে রহিয়াছে পড়ি সম্মুখে বিস্তারি শস্যক্ষেত্র যতো
কুলীন কুলবর্গের সব। তীক্ষ্ন অস্ত্রাঘাতে কাটে
মজুরের দল, পক্ক ক্ষেত্রের ফসল। মধ্যভাগে বাঁধে আঁটি
তিনটি মজুর, পিছে কর্মরত কিশোর শ্রমিক
দ্রুত মুঠি ভরি তুলে নেয় শস্যমঞ্জরীকণা।
শোভিছেন অধিপতি সকলের মাঝে, হস্তে যষ্টি ধরা,
বাক্য নাহি সরে মুখে, চিত্ত বিনোদিত মুখে অবারিত...
বিশাল বৃক্ষছায়ে বসি' কিংকরবাহিনী ব্যাপৃত রন্ধনে।
অতঃপর বর্মে আঁকা: গবাদি পশুর পাল, শৃঙ্গে শোভে
মাথার উপরে, মহাকলরবে ছুটে যায় হাম্বা ডাক ছাড়ি'
গোশালা হইতে মাঠে...

'ওদিসি' মহাকাব্যে প্রাসাদ বর্ণনা

> প্রশস্ত প্রাসাদে বসি' ক্রীতদাসী বালা —
> অর্ধশতেক তারা: কেহ ভাঙে গমের দানা
> যাঁতাকলে, কেহ কাটে চরকায় সুতা...
> প্রাসাদ-আঙিনা পিছে উদ্যান বিশাল
> দশম একর জমি ফলেফুলে শোভিছে অরূপ...
> দ্রাক্ষাকুঞ্জ, আহা, নয়নাভিরাম...
> প্রান্তদেশে সারিসারি সব্জী সোমরাজি
> হরিৎবর্ণের শোভা সুস্বাদে অতুল ফলিয়াছে
> প্রস্রবণ সেথা দুটি সিঞ্চিছে সদাই
> এ উদ্যান মনোহারী... দেবতার দানে
> সুভগ প্রাসাদ নামে হর্ম্যরাজি' পরে।

১. প্রাচীন গ্রীসবাসীদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে যা জানো বলো। ২. হোমারীয় যুগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা কীরকম ছিল বর্ণনা করো। গ্রীক পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলী তোমার বর্ণনায় ব্যবহার করো। ৩. হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এবং কেন শ্রেণীভেদ উদ্ভূত হয়েছিল, বলো। ৪. নিম্নলিখিত তালিকাটি পূরণ করো:

আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের কী কী প্রথা তখনো গ্রীকদের মধ্যে হোমারীয় যুগে চলে আসছিল	গ্রীসে দাসমালিকভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি যে হয়েছিল তার প্রমাণ কিসে পাই

§ ২৯. প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম

(দ্র. মানচিত্র ৪)

মনে করতে চেষ্টা করো — আদিম সমাজে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে (§ ৩:২,৩); প্রাচীন মিশরবাসী কোন্ কোন্ দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতো (§ ১১)।

১. প্রাকৃতিক শক্তির পূজা। অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় গ্রীসের অধিবাসীরাও প্রাকৃতিক রহস্য বুঝতে না পেরে প্রকৃতিকে ভয় পেত। তারা বিশ্বাস করতো যে, দেব-দেবীগণ প্রকৃতির মধ্যে বাস করে এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেব-দেবীদের তারা মনুষ্যরূপেই কল্পনা করতো, তবে তারা ছিল সর্বৈব শক্তির অধিকারী এবং চিরঞ্জীব।

গ্রীকরা মনে করতো যে, 'মেঘতাড়ন' **জিউসের** ইচ্ছায় পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত ঘটে, অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। যে মানুষ ও অন্যান্য দেবতারা তাঁকে রাগিয়ে দেয় শক্তিশালী দেব জিউস স্বর্ণময় বিদ্যুৎবাণে তাদের আঘাত করেন।

রুদ্রদেব জিউসের মতোই গ্রীকরা ভয় পেত 'পৃথিবী ঝাঁকানো' সমুদ্রদেব পোসেইদোন্‌কে। বিশাল ত্রিশূল দিয়ে মর্তভূমি প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেন তিনি, সমুদ্রে ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করেন, জাহাজ ডুবিয়ে দেন।

আর দিন আসে তখনই, যখন তুষারশুভ্র অশ্ববাহী স্বর্ণরথে চড়ে সূর্যদেব আকাশে এসে প্রবেশ করেন।

অরণ্যের দেবতাদের বলা হতো সাতিরোস* এবং তাদের কল্পনা করা হতো পশমাবৃত ও ছাগলের পা সম্বলিত মনুষ্যরূপে। গ্রীক মানসে ঝর্ণার দেবী কল্পিত হয়েছেন তরুণীরূপে, নাম নিম্ফ** অর্থাৎ কনে বৌ।

২. **দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির রক্ষক—দেবকুল।** মনে করা হতো যে, অর্থনীতির প্রতিটি শাখায় (কৃষিকাজ, পশুপালন, শিকার, তন্তুবায় বৃত্তি ও অন্যান্য যাবতীয় হস্তশিল্প) রক্ষাকারী দেব-দেবী রয়েছে।

সুরা উৎপাদনের দেবতার নাম ছিল **দিওনিসিওস,** আঙুরের চাষ ও মদ্য প্রস্তুত করার বিদ্যা মানুষকে তিনি শিখিয়েছিলেন। বসন্তকালে আঙুরক্ষেতে কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এবং ডিসেম্বর মাসে পক্ক আঙুর থেকে টাটকা মদ তৈরির পর দিওনিসিওসের সম্মানে উৎসবের আয়োজন করা হতো।

যখন গ্রীকরা ধাতব জিনিসপত্রাদি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল, তখন দেবতা **হেফেস্তুস** সম্বন্ধীয় পুরাণের উদ্ভব ঘটে। হেফেস্তুসের কর্মশালা ভূগর্ভে। লাভা, আগুন ও ধোঁয়া উদ্গিরণকারী আগ্নেয়গিরি তাঁর পাতালস্থিত কামারশালের নিষ্ক্রমণপথ। হেফেস্তুসের পোষাকআশাক ছিল একেবারেই সাধারণ কামারের মতো, হাত মুখ সব সময়েই কালো ঝুল কালিতে মাখা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষক-দেব উদ্ভূত হলেন—দেবতা **হের্মিস।** তিনি জিউসের বিভিন্ন আদেশ পালন করতেন এবং তজ্জন্য প্রায়শঃই এক শহর থেকে আরেক শহরে তাঁকে উড়ে যেতে হতো। সে কারণে চিত্রাদিতে হের্মিসকে পাখাধারী পাদুকা পায়ে সাধারণত কল্পনা করা হয়েছে।

কলাশাস্ত্রের দেবতা হলেন চিরতরুণ দেব **অ্যাপোলো*****। সর্বদা তাঁর মুজা দল—নৃত্য, সংগীত, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার ধারিক দেবীদল—তাঁকে অনুগমন করতেন।

৩. **ধর্মে প্রতিফলিত গ্রীকসমাজের শ্রেণীবৈষম্য।** গ্রীসবাসীগণ মনে করতো যে, জিউস, অ্যাপোলো ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেব-দেবী গ্রীসের সবচেয়ে উঁচু

* গ্রীক satyros, ইংরেজিতে satyr. — অনু.

** গ্রীক nymphe, ইংরেজিতে nymph. — অনু.

*** গ্রীক Apollon. ইংরেজিতে Apollo. — অনু.

অলিম্পীয় পর্বতে বাস করতেন। তাঁদের নামকরণ করা হয়েছিল অলিম্পীয় দেবকুল।

গ্রীকদের ধারণা ছিল, অলিম্পীয় দেব-দেবীদের জীবনযাপন সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকজনের অনুরূপ: তাঁরা প্রাসাদবাসী, উত্তম পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করেন, প্রায়ই ভোজনোৎসবের আয়োজন করে থাকেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা যেমন উপজাতির উপর কর্তৃত্ব করে, অলিম্পীয় দেবকুলও তেমনি জিউসের নেতৃত্বে প্রকৃতি ও মানবজাতিকে শাসন করেন। গ্রীকগণ দেবতাদের অনেক উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের ন্যায় নির্মম, ক্ষমতালোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে মনে করতো। (মহাকাব্য থেকে দেবতাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ধূর্ততার উদাহরণ দাও।)

দেবতারাই যেন মানুষের জীবনকে সর্বদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন—তাঁরাই কাউকে করেছেন সম্ভ্রান্তবংশীয় ও ধনী, আবার কাউকে নিঃস্ব ও অন্যের ক্রীতদাস করে। দেবনির্ধারিত এই নির্দিষ্ট নিয়মের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়ায় তাকে দেবতাদের কোপানলে পড়ে অশেষ সাজা ভোগ করতে হয়।

৪. **প্রমিথিউস সম্বন্ধীয় পুরাণ।** প্রমিথিউস সম্বন্ধীয় পুরাণের কাহিনীতে বলা হয়েছে—মানুষের নিকট থেকে আগুন লুকিয়ে রেখে দেবতারা চেয়েছিল যে, মানুষ চিরকাল প্রকৃতির সামনে অসহায় থাকুক ও ধ্বংস হোক; তখন হেফেস্তুসের কাছ থেকে দয়াবান প্রমিথিউস আগুন চুরি করে এনে মানুষকে দিয়ে দেন।

ক্রোধান্ধ জিউস তখন প্রমিথিউসকে ককেশাস পর্বতে শৃঙ্খলিত করে আটকে রাখতে আদেশ দেন হেফেস্তুসকে। তারপর প্রতিদিন জিউস ঈগল পাখিকে পাঠালেন সেখানে প্রমিথিউসের যকৃৎ ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলার জন্য। ঈগল পাখি প্রমিথিউসের যকৃৎ খেয়ে ফেলতো, কিন্তু এক রাত্রির মধ্যেই পুনরায় যকৃৎ গজিয়ে উঠতো। তবু এত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সত্ত্বেও গর্বিত ও বলদৃপ্ত প্রমিথিউস কিছুতেই জিউসের কাছে মস্তক অবনত করেন নি। প্রমিথিউসের মধ্যে রূপায়িত অসৎ ও দুষ্ট দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের সুখের আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামকে গ্রীকগণ শ্রদ্ধা করতো।

অন্যান্য জাতির ন্যায় গ্রীকদের মধ্যে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল একই কারণে, অর্থাৎ অজানা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সামনে অসহায় ভীতির জন্য। নবলব্ধ সব বৃত্তি ও সমাজে বৈষম্যের সূত্রপাত তাদের ধর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ওদিসিউসের সর্বশেষ জাহাজ ধ্বংসের বর্ণনা

ওদিসিউস জাহাজ ধ্বংসের কারণ কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

মাস্তুলদণ্ড তুলি' বাঁধি সবে শ্বেত পালরাজি
জাহাজে বসিনু চড়ি, পঁহুছিনু সাগরের মাঝে;

১. খ্রী. পূ. ৪র্থ শতাব্দীতে নির্মিত দেবমূর্তি অ্যাপোলো। **ভাস্কর তাঁর দেবমূর্তির কল্পনায় গ্রীসের কোন্ শ্রেণীর মানুষকে রূপায়িত করেছেন?** ২. খ্রী. পূ. ৫ম শতকে নির্মিত দেবীমূর্তি আথেনা। দেবীর দক্ষিণ হস্তে যুদ্ধে জয়দাত্রী দেবীর ছোট্ট একটি মূর্তি, আর তাঁর বাম হস্তে ধৃত একটি বিশালাকৃতি গোলাকার ঢাল। ৩. গ্রীসের দেব-দেবী। জিউস, পোসেইদোন ও আইদেস নিজেদের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাগ করে নেন: অন্তরীক্ষ (অর্থাৎ স্বর্গ) ও মর্ত্যের অধিকারী হন জিউস (Zeus), পোসেইদোন (Poseidon) হন সমুদ্রের রাজা, আর আইদেস (Aides বা Hades) পাতালের অধিকারী। আইদেসের পায়ের কাছে বসে আছে ত্রিমস্তক বিশিষ্ট সারমেয় — কের্বেরোস্। হেরাক্লেস সিংহচর্মাবৃত বিশাল মুদ্গরের উপর ভর দিয়ে দণ্ডায়মান; সুকঠিন কর্ম সম্পাদনের শেষে বিশ্রামের ভঙ্গিতে তাঁকে দেখানো হয়েছে। **§২৯-এর অন্তর্ভুক্ত ২য় ও ৩য় প্রশ্নের উত্তরদানে এই ছবিটি ব্যবহার করো।**

মেঘতাড় জ্যুস দেব* ছুঁড়িলেন রোষভরে তবে
জাহাজ উপরি মেঘ, ঘনকৃষ্ণ, নিম্নে ফোঁসে তার
সাগরবারিধি কালো। ছুম্ব, জানি, তার পথ বটে!
পশ্চিম দিগন্ত হতে সিংহনাদে আসে ছুটি' দেব
জেফিরোস সাথে লয়ে তাণ্ডব জলঘূর্ণির লীলা;**
পালসহ মাস্তুল ক্ষিধত আক্রোশে ভাঙি

* জ্যুস দেব-দেবতা জিউস। — অনু.
** **জেফিরোস** (Zephyros) পশ্চিম বায়ুর দেবতা।

ছেঁড়ে দড়িদড়া সব... তখনি জিউস দেব হানে
সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎশর, বিদ্ধ করি' মহানাদে
মোদের জাহাজ, হায়, আবরিয়া গন্ধকধূমে।
মুহূর্তেকে সঙ্গীসাথী আছিল যতেক মোর
জলতলে পড়ে করে ডুবলীলা যেন অবিকল
বিস্রস্ত মিলায় নীলে সামুদ্রিক কাক।

'ইলিয়াদ' থেকে। আখিলেস্ বান্ধব পাত্রোক্লুসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

দীর্ঘে প্রস্থে শত পদ সাজায় সমিধ কাঠে চিতা,
তদুপরি রাখে তারা, শোকাপ্লুত, বীরে মৃত এবে।
অতঃপর দেয় বলি মেদল অমৃত মেষ আর
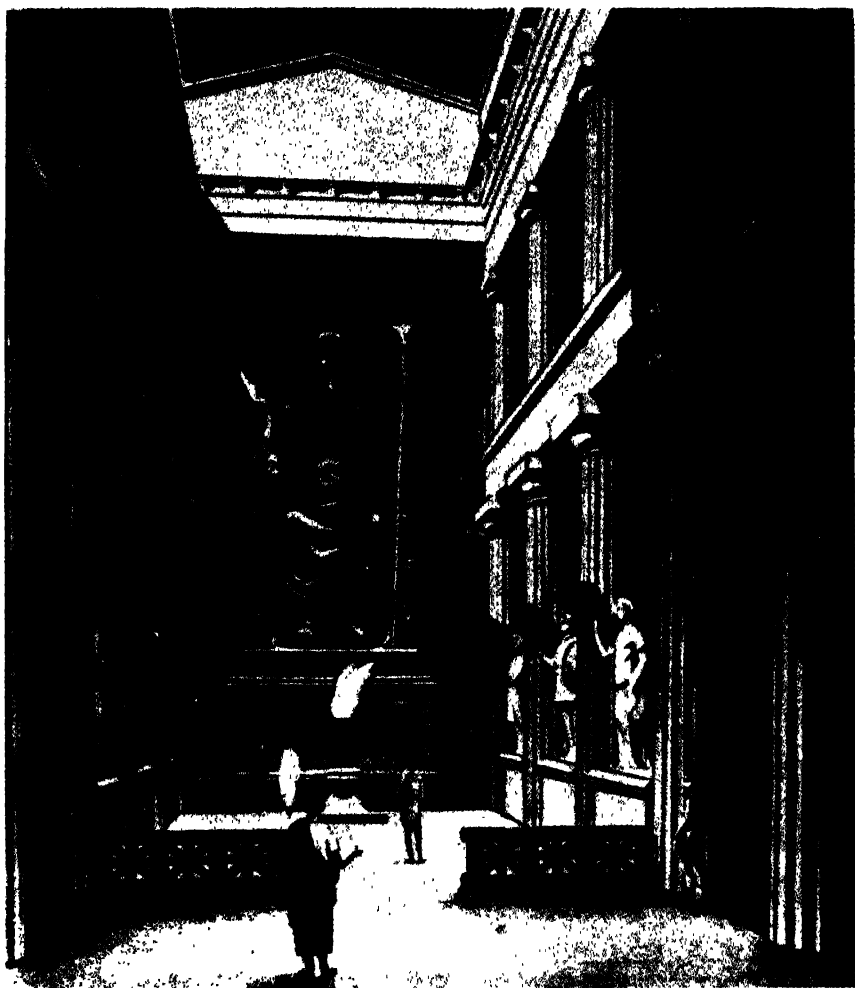
আলাম্পিয়া পাহাড়ে অবস্থিত জিউস দেবমন্দিরের অভ্যন্তরভাগ। (পুনঃকল্পিত।) সিংহাসনে আসীন দেবতা জিউস। তাঁর এক হাতে রাজদণ্ড এবং অন্য হাতে যুদ্ধের জয়দাত্রী দেবীর মূর্তি। মন্দিরটি খ্রী. পূ. ৫ম শতকে নির্মিত হয়েছিল। জিউসের মূর্তি ভাস্কর ফিদিয়াস প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরি করে তাকে হস্তীদন্তের পাৎলা আবরণে মোড়াই করে দেন। প্রাচীন কালে পৃথিবীর 'সপ্তমাশ্চর্যের' মধ্যে এই মূর্তিও পরিগণিত হতো। অলিম্পিয়া সম্বন্ধে পরে তোমরা পড়বে।

বৃষদল বক্ষপুঞ্জ, নিয়া খুলি চর্ম-আবরণ
চর্বিপুঞ্জ দিয়া তার ঘেরে বীর পেট্রোক্লুস দেহে
অরিন্দম আখিলেস... ক্রন্দনবিধুর এবে, হায়,
ছোড়ে বলী মহারোষে সুগ্রীব চতুরশ্ব সেথা...
আরো দুই সারমেয় নিক্ষেপিয়া চিতার মাঝারে

শোকমত্ত আখিলেস শেষে তুলি তীক্ষ্ণ তরবকা,
দ্বাদশ বন্দীরে বেঁধে, কাটে ক্রোধে (নীচকর্ম বটে!)
ট্রয়ের দুলালে, হায়, দ্বাদশ বীরের প্রাণ নাশে।

দেমেত্রা ও পের্সেফোনে সম্পর্কীয় পুরাণ

এই পুরাণে প্রকৃতির কোন্ বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে?

উর্বরতার দেবী দেমেত্রার কন্যা সুন্দরী পের্সেফোনে একদিন মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ ধরিত্রী দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং কৃষ্ণ অশ্ববাহী রথে এসে আবির্ভূত হলেন পাতালের অন্ধকার দেবতা আইদেস্। মৃত আত্মাদের বাসস্থান তাঁর ভূগর্ভস্থ রাজ্যে তিনি অপহরণ করে নিয়ে গেলেন পের্সেফোনেকে। মাতা দেমেত্রা কন্যার চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে গেলেন, তখন ফুল শুকিয়ে গেল, ঝরে গেল গাছের পাতা, যব আর দ্রাক্ষাকুঞ্জেও কোনো ফল ফললো না। পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। জিউস তখন আইদেসকে ডেকে পের্সেফোনেকে মায়ের কাছে প্রতি বছরে অন্তত কয়েক মাসের জন্য ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। পের্সেফোনে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুলেই দেমেত্রা পুনরায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন, পৃথিবীতে বসন্তকাল দেখা দেয়। আবার যখন ভূগর্ভে চলে যান পের্সেফোনে, তখন ফের শোকাভিভূতা হয়ে যান মাতা দেমেত্রা, পৃথিবীতে হেমন্তকাল শুরু হয়।

?

১. প্রকৃতি কীভাবে গ্রীকদের ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? গ্রীক, মিশর ও ব্যাবিলনবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে রূপায়িত প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করো। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য খুঁজে বের করো। ২. গ্রীকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কীভাবে তাদের ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩. গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসে তাদের শ্রেণীবৈষম্যের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে? *৪. প্রাচীন কালে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছিল সে সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো। ৫. গ্রীসে ধর্ম কীভাবে সম্ভ্রান্তবংশীয়দের আধিপত্য দৃঢ়তর করে তুলেছিল? প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে তোমার সাধারণ মতামত ব্যক্ত করো।

দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন
ও খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব

§ ৩০-৩১. আথেনীয় দাসমালিকদের রাষ্ট্র

(দ্র. মানচিত্র ৪)

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে অভিজাত শ্রেণীর শাসন

মনে করতে চেষ্টা করো—গ্রীসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রীসে জীবনযাত্রা সহজতর হয়েছিল (§ ২৫:১)।

১. হোমারীয় যুগের শেষভাগে আত্তিকা। মধ্য গ্রীসের যে দক্ষিণ-পূর্বাংশ সমুদ্রের ভিতরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে উপদ্বীপ, সেখানেই অবস্থিত **আত্তিকা** (Attica) প্রদেশ। কৃষিকার্যের উপযোগী সমতল ভূমিতে অধিকাংশ লোক বসবাস করতো। পাহাড়ী অঞ্চলকে ব্যবহার করা হতো ছাগল ও ভেড়ার পশুচারণক্ষেত্র হিসেবে।

আত্তিকা প্রদেশের পশ্চিম অংশ ছিল প্রশস্ত সমভূমি; তার মধ্যিখানে উঠে গেছে একটি খাড়া শৈলটিলা। খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দে সেখানে **আথেন্স*** নগর পত্তন হয়েছিল। টিলার চূড়ায় প্রস্তরপ্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ ছিল—আক্রোপোলিস্। আর পাহাড়ের ঢালু উপত্যকা ঘিরে বাস করতো আথেন্সের নাগরিকবৃন্দ—**আথেনীয় জনগণ**। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে দুর্গপার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণ দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিত।

আথেনীয়রা দোরীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। হোমারীয় যুগে আথেন্সের সম্ভ্রান্তসম্প্রদায় আত্তিকা জনসাধারণকে নিজেদের পদানত করে। আত্তিকা প্রদেশের সকল অধিবাসীদের নামকরণ করা হয়েছিল প্রধান শহরের নামে, অর্থাৎ তাদেরও বলা হতো আথেনীয়।

* শহরটির প্রকৃত নাম আথেনাই, ইংরেজিতে Athens বলা হয়। — অনু.

২. আত্তিকা প্রদেশে কৃষি ও হস্তশিল্পের বিকাশ। আত্তিকা অধিবাসীদের সবসময়েই শস্যঘাটতি পড়তো: তাদের জমিতে যব ও গমের ফলন খুবই খারাপ হতো। কিন্তু উপত্যকা অঞ্চলে জলপাই গাছ জন্মাতো প্রচুর পরিমাণে, আর পাহাড়ের ঢাল্ জায়গায়—আঙুর। খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতকে আত্তিকায় সুরা ও জলপাই তেলের উৎপাদন বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

গ্রীকরা মদ ও জলপাই তেল সংরক্ষণ ও স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য মাটির বড়ো বড়ো জালা—**আম্ফোরা**—তৈরি করতো। অনুরূপভাবে পোড়ামাটি থেকে তারা ছাদের টালি, পয়ঃপ্রণালীর নল, মদ ও শস্যাদি রাখার পাত্র, ফুলদানী ইত্যাদি নির্মাণ করতো। শিল্পীরা আবার এই সব ফুলদানীর উপর ছবি এঁকে দিত। আত্তিকায় মৃৎশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। অন্যান্য কারিগরগণ তৈরি করতো পশমী জিনিসপত্র, বা হাপরের গনগনে আগুনে লোহা পেটাই করে অস্ত্রশস্ত্র, কিংবা সোনা-রূপার গয়না বানাতো। কর্মশালায় সাধারণত কারিগর নিজে কাজ করতো, সময়ে সময়ে অবশ্য তার অধীনস্থ দুই-তিনজন দাস খাটতো।

উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে আথেনীয়গণ রৌপ্যখনি খুঁজে বের করে। খ্রী. পূ. ৭ম শতাব্দীতে আথেন্স রৌপ্যমুদ্রা নির্মাণ করতে সমর্থ হয় এবং সমগ্র গ্রীসে সেই মুদ্রার প্রচলন ঘটে।

৩. বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার প্রসার। আথেন্স শহর খুব দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আক্রোপোলিসের উত্তর-পশ্চিমে রীতিমতো এক মহল্লাই গড়ে ওঠে যেখানে কেবল কারিগরদের কর্মশালা ছিল। আথেন্সের কেন্দ্রস্থলে ছিল বাজারের চক—**আগোরা।** সমভূমির অধিবাসীরা এখানে মদ ও জলপাই তেল নিয়ে আসতো বিক্রির জন্য, পাহাড়ী লোকেরা আনতো পশু, আর কারিগররা নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র।

আথেন্স নগরের অনতিদূরে ছিল জাহাজ নোঙরের উপযুক্ত খাড়ি। এখানে হস্তশিল্পের নানাবিধ দ্রব্যাদি, আম্ফোরা ভর্তি মদ ও জলপাইয়ের তেল জাহাজে বোঝাই করা হতো। এই সব জিনিস গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলে ও সমুদ্রপারের অন্যান্য দেশে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হতো। আর বিদেশ থেকে আনা খাদ্যশস্য, লবণ, নোনা মাছ ইত্যাদি জাহাজ থেকে এখানে নামানো হতো, দাসদেরও আনা হতো আথেন্সে বিক্রয় করার জন্য।

৪. ধ্বংসোন্মুখ কৃষকসমাজ। আত্তিকায় প্রায়শঃই অনাবৃষ্টি হতো। তখন ফসল বোনার জন্য চাষীদের কাছে নতুন বীজও থাকতো না। জলপাই ও আঙুর চাষে খরচ পড়তো প্রচুর এবং রোপণের বেশ কয়েক বৎসর পরেই শুধু এসব গাছপালার দ্বারা লাভবান হওয়া যেত। কৃষকরা সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের নিকট থেকে বেশ মোটা সুদে টাকা ধার নিতে বাধ্য হতো।

চাষীদের টাকা ধার দিয়ে উত্তমর্ণ ধনী ব্যক্তি চাষীদের জমিতে একটি বড়ো

১. জলপাই সংগ্রহ। (গ্রীক পাত্রে অঙ্কিত চিত্র।) ২. দু'হাতল ও সরু গলা বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের কুঁজো আম্ফোরাতে করে তেল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (গ্রীক ফুলদানীতে অঙ্কিত চিত্র।) ৩. জলপাই তেলের কেনাবেচা চলছে। (গ্রীক ফুলদানীতে অঙ্কিত চিত্র।) ৪. আথেন্সের প্রাচীন মুদ্রা। মুদ্রার এক পিঠে দেবী আথেনার মস্তক খোদিত, অন্যপিঠে দেবীর পবিত্র বাহন—পাখি। ৫. পিঠা বিক্রেতা। (প্রাচীন গ্রীক মৃন্ময় মূর্তি।) ৬. মুচির কর্মশালা। (ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।) কর্মশালার মালিক জনৈকা মহিলার পায়ের মাপ নিচ্ছে, আর তার কর্মচারী তৈরি জুতো ধরে আছে। ডানদিকে: মহিলার স্বামী মালিককে নির্দেশ দিচ্ছে। ৭. কামারশালা। (ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।) কামার সাঁড়াশী দিয়ে উত্তপ্ত ধাতব শলাকা ধরে আছে, আর দাস তার উপরে হাতুড়ি পিটছে। ডাইনে: ফরমাইশদাতারা বসে আছে। দেয়ালের উপরে কামারের কাজ করার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও তৈরি জিনিসপত্র ঝুলছে।

পাথর পুঁতে রাখতো, এই পাথরটিকে বলা হতো জাবেদা পাথর। এই প্রস্তরখণ্ডের উপর লেখা থাকতো কবে এবং কাকে চাষী ঋণ শোধ করতে বাধ্য থাকবে। কৃষক ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সে শুধু সম্পত্তিই হারাতো না, প্রায়শঃই সপরিবারে তাকে দাসত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করতে হতো। মাতাপিতারা প্রায়শঃই সন্তানসন্ততিদের দাস হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য হতো।

খ্রী. পূ. ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে সম্ভ্রান্তসম্প্রদায় আত্তিকার অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র দখল করে নেয়। বহু কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে দাস জীবনযাপন করে। অন্যদের ভাগ্যও প্রায় একই রকম ছিল—তাদের জমিতে পড়ে থাকতো জাবেদা পাথর, যেমন দাসের শরীরে আটকানো থাকতো নামধাম লেখা গললগ্ন আংটা।

৫. আথেন্সে অভিজাতসম্প্রদায়ের শাসন। কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ জনগণ সম্ভ্রান্তসম্প্রদায়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ পেত না। আথেনীয়দের শাসন করতো মোড়লদের পরামর্শসভা ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত নয় জন প্রশাসক। পরামর্শসভার সভ্যগণ, প্রশাসকবর্গ ও বিচারকমণ্ডলী—সবই হতো আথেন্সের সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকজন।

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

প্রথম: লেখার কাজে ব্যস্ত রাজকর্মচারী। (খ্রী. পূ. ৩য় সহস্রাব্দে মিশরীয় আমলার বর্ণরঞ্জিত মূর্তি।) সে তার নিজের উপরওয়ালার হুকুম ও নির্দেশ লিখে রাখতো ।

দ্বিতীয়: ফারাওন তুতেনখামেনের স্বর্ণনির্মিত শবাধার। শবাধারের উপরে মৃতব্যক্তির মুখমণ্ডল খোদিত হয়েছে। (খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দ।) হাতে — রাজদণ্ড ও চাবুক; ললাটের উপরে সর্পমূর্তি; এসবই সম্রাটের ক্ষমতার প্রতীক।

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

তৃতীয়: রাজপোষাক পরিহিতা মিশরের সম্রাজ্ঞী নেফের্তিতি-র মস্তক। (চুনা পাথরে রঞ্জিত। খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দ।)

চতুর্থ: দেবমূর্তিসহ ফারাওনের ছবি। (দেয়ালচিত্র। খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দ।) ফারাওনের বামপার্শ্বে — দেবতা গোর. ডানপার্শ্বে — দেবতা তোৎ।
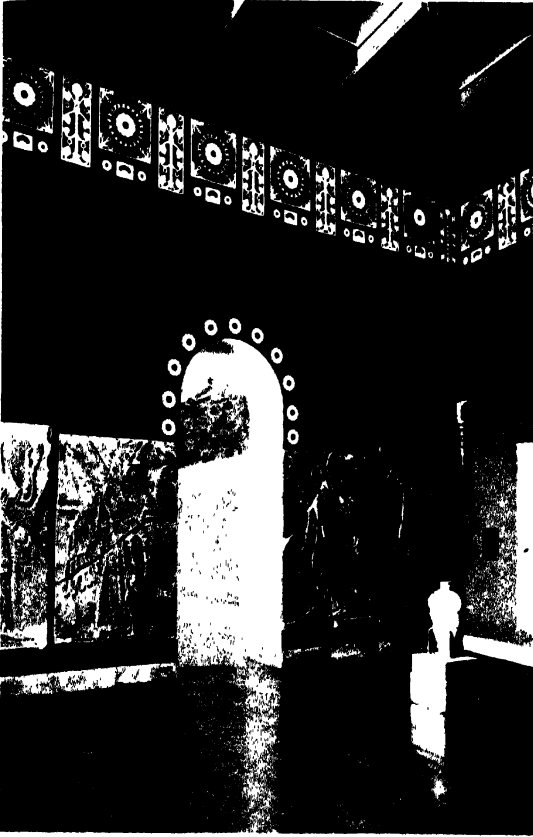
রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

পঞ্চম: আসিরীয় রাজদরবারের ভিতরে কক্ষের দেয়াল। (যথার্থ রিলীফের সহায়তায় পুনর্নির্মিত ছবি। রিলীফে অপার্থিব কাল্পনিক মূর্তির সমাহার লক্ষণীয়। খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগ।)

ষষ্ঠ: নারীমস্তক, চক্ষুদ্বয় রঙিন পাথরের। (চুনা পাথর দিয়ে তৈরি। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া। খ্রী. পূ. ৩য় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ।)

সপ্তম: ব্রোঞ্জনির্মিত ষাঁড়ের মাথা, চোখ রঙিন পাথরে তৈরি। (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া। খ্রী. পূ. ৩য় সহস্রাব্দ।)

রঙিন
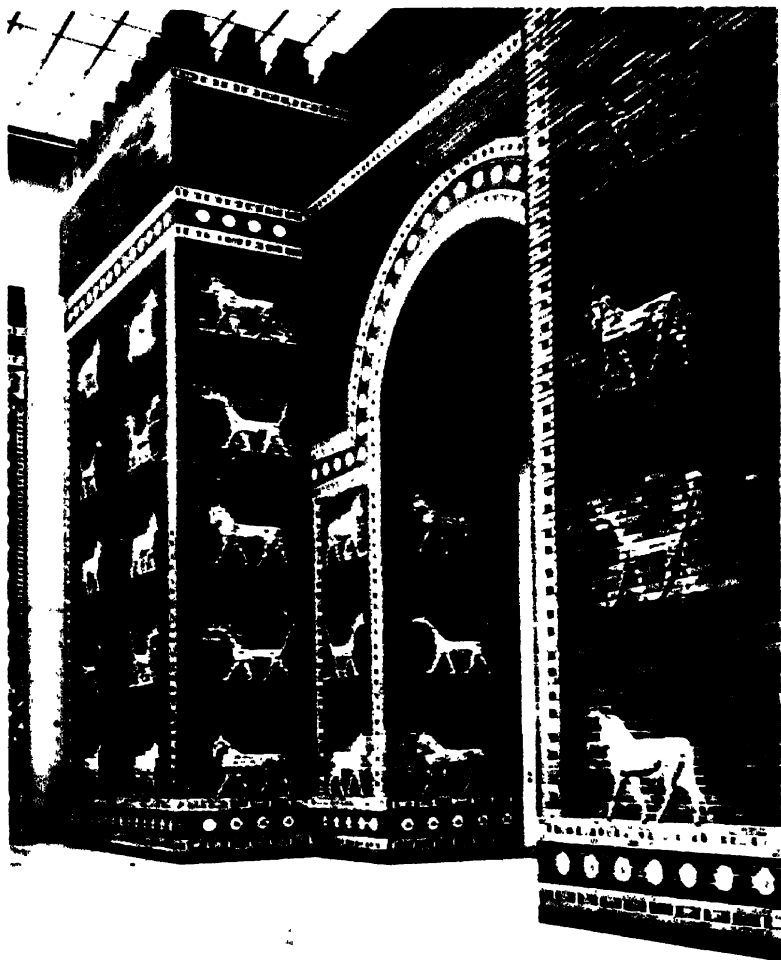
অষ্টম: ব্যাবিলনের ইশ্‌তার তোরণ। (পুনর্নির্মিত। খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতক।) সারা দেয়াল নীল ও কমলা রঙের ছোটো ছোটো টালি দিয়ে মোড়া। মাটি পুড়িয়ে তৈরি পাতলা ইঁটের একটা দিক ঝকঝকে পালিশ করা থাকলে তাকে টালি বলে। দেয়ালে পশুমূর্তি অঙ্কিত, এদের অনেকগুলোই কাল্পনিক। নগর-পরিকল্পনার নক্সায় ইশ্‌তার তোরণ খুঁজে বের করো (পৃ. ১০০)।

রঙিন আলোকচিত্র।

নবম: পারসীক সৈন্যবাহিনী। (পারস্যের রাজদরবারে টালিখচিত রিলীফ। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভ।)

রঙিন আলোকচিত্র।

দশম: দেল্‌ফি নগরে আথেনীয়দের খাজাঞ্চীখানা। সারা গ্রীসদেশে প্রণম্য অ্যাপোলো মন্দির দেল্‌ফিতেই অবস্থিত। **এই ভবনটিতে গ্রীক স্থাপত্যের কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, খুঁজে বের করো।**

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

একাদশ: মাটির তৈরি গ্রীক নারীমূর্তি। (খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকে নির্মিত, মাটির উপরে বর্ণলেপন করা হয়েছে।) লক্ষণীয়, নারীর কমনীয় দেহশ্রী, লালিত্য ও দৃপ্তভঙ্গিমা সবই শিল্পী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বাদশ: নারীমস্তকের আকারে নির্মিত একটি গ্রীক কলস। (খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের শেষদিক থেকে খ্রী. পূ. ৩য় শতকের প্রারম্ভ।) বর্তমান বুলগেরিয়ার কোনো এক স্থানে এটি খুঁজে পাওয়া গেছে।

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

ত্রয়োদশ: খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে নির্মিত কৃষ্ণমূর্তি পুষ্পাধার। ফুলদানির উপরে ত্রিদেহী ও ত্রিমস্তকধারী দৈত্যের সাথে হেরাক্লেসের যুদ্ধ অঙ্কিত হয়েছে। হেরাক্লেসের শরে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে দৈত্যের ভৃত্য।

চতুর্দশ: খ্রী. পূ. ৫ম শতকে নির্মিত লোহিতমূর্তি পুষ্পাধার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে — যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে যোদ্ধা। এই **ছবিটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী বলে তুমি মনে করো?**

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

পঞ্চদশ: রোমের জনৈকা তরুণীর প্রতিকৃতি। (পোম্পেইয়ে প্রাপ্ত ফ্রেস্কো।) **এই প্রতিকৃতির নাম 'মহিলা কবি' কেন, ব্যাখ্যা করে বোঝাও।**

ষোড়শ: ইস্ নগরের নিকটে মাকিদোনীয় ও পারসীক সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ। পোম্পেই শহরে প্রাপ্ত ছবির একাংশ এখানে দেখানো হয়েছে। বামে — মাকিদোনীয় সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট। ডাইনে — পলায়নপর ৩য় দারিউস।

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

সপ্তদশ: পোম্পেই নগরে একটি বাড়ির আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জা। বাড়ির ভিতরে বাগান ও স্নানের চৌবাচ্চা; দেয়ালে ফ্রেস্কোর ভগ্নাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। দেয়ালের উপরে কাঁচা পলেস্তারার উপরে যে সব ছবি আঁকা হয়, তাকে ফ্রেস্কো বলে। পোম্পেই শহরে ঘরবাড়ির ভিতরে অনেক তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, দেয়ালচিত্র অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঋণ নিয়ে কড়ারনামা লিখে দেওয়া শতাধিক চিরকুট পাওয়া গেছে কোনো ধনী মহাজনের সিন্দুক থেকে। মানুষজন ও পশুর দেহ পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পুঞ্জিভূত ভস্মের ভিতরে তাদের দেহের জায়গায় শুধু পড়ে ছিল ফাঁকা জায়গা। প্রত্নবিজ্ঞানীগণ এধরনের ফাঁকায় জিপ্‌সাম ঢেলে ভস্মাকারে অবলুপ্ত বস্তু প্রকৃতপক্ষে কী ছিল তা সঠিকভাবে নিরূপণ করে থাকেন। ১ম শতাব্দীতে এ শহরের রাস্তাঘাট দেখলে পোম্পেইয়ে আগত যে কোনো পর্যটকের মনে হতো, অধিবাসীরা শহরটি এখনই ত্যাগ করেছে।

অষ্টাদশ: জনৈকা রোমবাসিনী। (পোম্পেই নগরীতে প্রাপ্ত ফ্রেস্কো।)

ঊনবিংশ রঙিন আলোকচিত্র।

রোম নগরীর ফোরামের একাংশ। ধ্বংসপ্রাপ্ত ফোরামের বর্তমান রূপ। এ স্থানের পিছন দিকে বামপার্শ্বে আধুনিক কালের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে।

বিংশ রঙিন আলোকচিত্র।

ফোরামের ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশেরই পুনর্গঠিত রূপ। পিছন দিকে বামপার্শ্বে — কাপিতোলিউম টিলা। ঊনবিংশ-বিংশ ছবির মধ্যে প্রতিতুলনা করে দেখাও ফোরামের ঠিক কোন্ কোন্ অংশ এখন পর্যন্ত টিকে আছে।

৬

৫ ৭

সম্ভ্রান্তবংশীয় জনৈক গ্রীক কবি ঘোষণা করেছেন: 'জনগণের বুক কঠিন পদতলে নিষ্পিষ্ট করে রাখো, তাম্র বল্লম দ্বারা আঘাত করো তাদের', কেন না এমন জনগণ কোথাও নেই যারা স্বেচ্ছায় তাদের 'প্রভুর সুকঠোর শাসন' সহ্য করে।

বিচারকগণ সমস্ত মামলাই সম্ভ্রান্তবংশীয়দের স্বার্থে সমাধান করতো। সম্ভ্রান্তবংশীয়দের হাতে ছিল তাদের বশংবদ সেনাদল, তারা অবাধ্য লোকজনের উপর নির্যাতন চালাতো। খ্রী. পূ. ৭ম শতকে এমন অনেক আইন জারি করা হয় যার ফলে খুব সামান্য দোষেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। যেমন, পরের বাগানে আঙুর পাড়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। লোকে বলতো, এসব আইন 'কালি দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে'। মনে করা হতো, প্রশাসক দ্রাকোন্* এই আইনসমূহের প্রণেতা, তাই এগুলোকে বলা হতো 'দ্রাকোন আইন'।

* গ্রীক 'দ্রাকোন্' শব্দের এক অর্থ — সর্প, অর্থাৎ মূর্তিমান সর্বনাশ ও ধ্বংসের প্রতীক। সম্ভবত এই গ্রীক শব্দ হতেই পৌরাণিক মহাসর্প 'ড্রাগন' কথাটা এসেছে। আথেনীয়দের জন্য লিখিত আইনের প্রথম সংকলক ছিলেন দ্রাকোন (Drakon), খ্রী. পূ. আনুমানিক ৬২০ অব্দে তা সংকলিত হয়েছিল। — অনু.

খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে রাষ্ট্রের উদ্ভব। আথেনীয় রাষ্ট্র এ সময়ে কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল?

নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে সম্ভ্রান্তসম্প্রদায় বলতো **অভিজাততন্ত্র**, তার মানে 'উত্তম লোকদের দ্বারা শাসন'। সে কারণে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বলা হতো অভিজাত।

খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে আথেনীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে যা আত্তিকা প্রদেশের দাসসম্প্রদায়, কৃষক ও অবশিষ্ট জনসাধারণের উপর অভিজাতদের শাসন বলপ্রয়োগ দ্বারা বজায় রেখেছিল।

? ১. হোমারীয় যুগের গ্রীসের তুলনায় খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিকে আত্তিকা অর্থনীতিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? ২. প্রাকৃতিক কী কী বৈশিষ্ট্যের দরুন আত্তিকায় হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছিল? ৩. আথেন্সে কীভাবে খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতকে সাধারণ মানুষকে দাসত্বে পরিবর্তিত করা হতো? ৪. 'অভিজাত' কাদের বলা হতো? কীভাবে এই নামকরণ হয়েছিল? ৫. খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে আথেন্সে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কীসে তার প্রমাণ মেলে?

'দেমোসদের' বিজয় ও আথেন্সে রাষ্ট্রভিত্তি সুদৃঢ়ীকরণ

৬. দেমোস। আত্তিকা প্রদেশের শাসক অভিজাতবর্গ ব্যতিরেকে সমস্ত স্বাধীন আথেন্সবাসীদের বলা হলো **দেমোস।**

দেমোসের বেশির ভাগই ছিল কৃষক, কারিগর, মাঝিমাল্লা ও দিনমজুর। খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে দেমোসের এক অংশ ধনী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে বণিক এবং জাহাজ ও কর্মশালার মালিক দেখা দেয়। তারাও দাস রাখতো এবং দিনমজুরদের ভাড়া খাটাতো। কিন্তু তা হলেও সমগ্র দেমোস ধনী ও নির্ধন নির্বিশেষে ছিল অধিকারবঞ্চিত এবং অভিজাতবর্গের অধীন।

৭. দেমোসের জয়। অভিজাত শ্রেণীর শাসনে সার্বিকভাবে দেমোসের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল। আথেনীয়দের শাসনব্যবস্থায় দেমোসও অংশ গ্রহণের অধিকার লাভের জন্য প্রভূত চেষ্টা করে। তা ছাড়া দরিদ্রেরা ঋণ মওকুফ এবং অভিজাতসম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি অধিকার করে ভূমিহীনদের মধ্যে তা বণ্টনের দাবি জানাচ্ছিল।

খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে দেমোসের মধ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলে। জনগণ সভায় সমবেত হয়ে অভিজাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত **আরিস্তোতেলেস*** লিখেছেন: 'দেমোস অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো।' দেমোস ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হলো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

গণ-অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীত অভিজাত শ্রেণী দেমোসের নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। **খ্রী. পূ. ৫৯৪ অব্দে** আথেন্সের শাসনকর্তা নির্বাচিত হলেন **সোলোন।** দেমোস ও অভিজাতদের মিটমাট করিয়ে দেবার ভার ছিল তাঁর উপরে। সোলোন সম্ভ্রান্তবংশীয় হলেও দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা, কবি এবং বাগ্মী হিসেবে তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। আথেনীয় গণ-সম্মিলনের সমর্থন লাভ করে তিনি শাসনভার পরিচালনা ও দেমোসের অবস্থার উন্নতি কল্পে **আইন সংস্কার** করেন।

৪. ঋণ মওকুফ। সোলোনের নির্দেশে কৃষকদের সমস্ত ঋণ মার্জনা করে দেয়া হয়। ঋণ-অপরিশোধ হেতু দাসত্বে বন্দী আথেন্সবাসী মুক্তি লাভ করে। স্বাধীন আথেন্সবাসীদের দাসত্বে নিক্ষেপ করা এখন থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সোলোন লিখেছেন যে, তাঁর কার্যকলাপের সর্বাপেক্ষা চমৎকার সাক্ষ্য হচ্ছে:

> 'মলিন জননী মোর, লাঞ্ছিতা মৃত্তিকা,
> তব বক্ষ হতে ছিঁড়ি অপমান ভার;

* গ্রীক Aristoteles; ইংরেজিতে লেখা হয় Aristotle, বাংলাতেও কমবেশী ইংরেজির অনুকরণে উচ্চারিত ও তদনুরূপভাবে লিখিত হয়ে থাকে। জগদ্বিখ্যাত এই মহাপণ্ডিত খ্রী. পূ. আনুমানিক ৩৮৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রী. পূ. ৩২২ সালে মারা যান। — অনু.

১. সোলোন। (প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মূর্তি।) মূর্তিটিতে সোলোনের চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক ফুটে উঠেছে? ২. যোদ্ধার যুদ্ধসাজ। (গ্রীক ফুলদানীতে অঙ্কিত চিত্র।)

ছিলে পূর্বে ক্রীতদাসী, স্বাধীনা এখন।
আথেন্স, হে জন্মভূমি, অপূর্ব নগরী,
ফিরায়ে এনেছি আমি ভিনদেশ হতে
বিক্রীত আত্মার দল; মুক্তি ফিরে দিনু
প্রভুভয়ে কম্পমান এদেশেরও দাসে।'

ঋণপ্রথা ও ঋণের দায়ে দাসত্ব বাতিল হবার পর আত্তিকা প্রদেশে কৃষিকর্মের পরিমাণ ও কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সোলোন-কৃত সংস্কারের ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা দাসদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তারা পূর্বের মতোই কষ্টভোগ করছিল এবং তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯. আথেনীয় নাগরিক। আত্তিকার মূল পুরুষ বাসিন্দাদের সোলোন তাদের ধনসম্পদ অনুযায়ী ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। তারা সকলেই আথেনীয় রাষ্ট্রের নাগরিক* ছিল।

সেনাদল বা নৌবাহিনীতে যোগদান আথেনীয় নাগরিকগণের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। দু' বৎসর ধরে তরুণদের যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হতো। যুদ্ধের সময় নাগরিকগণ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিত। ভূমিহীন নিঃস্ব দরিদ্র লোকেরা থেতেস্—হাল্কা ধরনের অস্ত্র নিয়ে পদাতিক বাহিনীতে থাকতো, নয়তো

* নাগরিক — রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের নিকট অবশ্যকর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকেন, তিনিই নাগরিক।
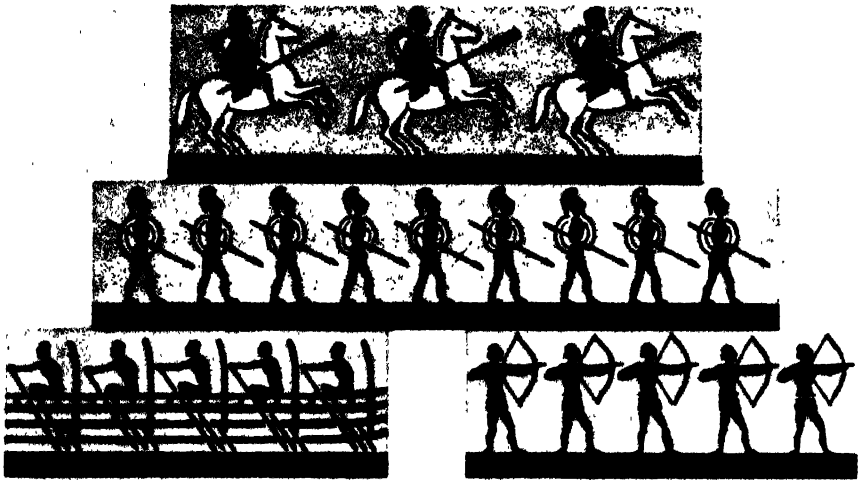
সোলোনের সংস্কারের পরে আথেনীয় সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী। আথেন্সে সমাজের কোন স্তরের কোন ধরনের সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করতো?

যুদ্ধজাহাজে মাঝিমাল্লা হিসেবে কাজ করতো। নৌবাহিনীতে সেরা নাবিকেরা যোগ দিত। যুদ্ধবর্ম কিনতে সক্ষম কৃষকেরা ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করতো; এরাই ছিল আথেনীয় সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি। যুদ্ধাশ্ব ক্রয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজন অশ্বারোহী সেনাদলে কাজ নিত, এবং ধনী ব্যক্তিরা যুদ্ধজাহাজ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করতো।

আথেন্সের সকল নাগরিকই গণ-সম্মিলনে বা গণ-পরিষদে যোগ দিয়ে আলাপ-আলোচনায় অংশ নিতে পারতো।

১০. আথেন্সে শাসনপরিচালনা। সোলোন-কৃত আইন সংস্কারের পর আথেনীয় রাষ্ট্রের শাসনপরিচালনায় গণ-পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সমাধান এবং প্রশাসক, বিচারক ও অন্যান্য **সরকারী পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের** নির্বাচন তার দ্বারাই সম্পন্ন হতো। আত্তিকার প্রত্যেক নাগরিকই বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারতো। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ধনী ও সমৃদ্ধ পরিবারের (তারা অভিজাতবংশীয় হোক বা না হোক) লোকদের নির্বাচিত করা হতো। ভূমিহীন নিঃস্বদের পক্ষে এসব পদ লাভ করা কখনোই সম্ভব ছিল না।

আথেন্সে অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করা এবং শাসনকার্যে দেমোসের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা সোলোনের সংস্কারের ফলেই ঘটে উঠতে পেরেছিল।

অবশ্য অভিজাতবর্গ ও দেমোসের মধ্যে শত্রুতা এ সংস্কারের পরেও নিঃশেষ হয় নি। অভিজাত শ্রেণী চাইতো অতীতের শাসনব্যবস্থা ফিরে পেতে, আর

দেমোস চাইতো তাদের সংগ্রামলব্ধ অর্জিত অধিকার কায়েম রেখে তাকে আরো প্রসারিত করে তুলতে। তবে কি অভিজাত, আর কি অনভিজাত দাসমালিক— উভয়ই সর্বদা চাইতো দাসদের দাবিয়ে রাখতে এবং নতুন নতুন আরো দাস ক্রয় করতে। সে কারণে এই উভয় পক্ষই আথেনীয় রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ আগ্রহী ছিল, কেন না দাসদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখায় তাদের স্বার্থ তো রাষ্ট্রই রক্ষা করবে।

খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আথেন্সে দাসমালিকভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল এবং ফলে দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার সময়ে
আথেনীয় তরুণদের শপথ

আমি এই পবিত্র অস্ত্রের অসম্মান করবো না এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানেই থাকি কখনোই আমার সঙ্গীকে পরিত্যাগ করবো না। আমি আমার পর্ণকুটির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করবো এবং তার পরে পিতৃভূমিকে দুর্বল তো করবোই না, বরং আরো পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী করে তুলবো। আমি নিজে অন্যদের সাথে বর্তমানে প্রচলিত আইনকানুন, এবং ভবিষ্যতে যে সব আইনকানুন প্রবর্তিত হবে সে সবও মেনে চলবো। স্বদেশের সমুদয় পবিত্র বস্তুকে আমি ভক্তি করবো। দেবতারা আমার সাক্ষী — সাক্ষী স্বদেশের সীমানা, গম ও যবের শস্যক্ষেত, জলপাইয়ের বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ।

? ১. খ্রী. পূ. ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে 'দেমোস' বলা হতো কাদের? দেমোসভুক্ত লোকজন কি বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসতো, নাকি একটি শ্রেণী থেকে? ২. সোলোনের আইন সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিল কেন? এতে কাদের উপকার হয়েছিল? ৩. সোলোন-কৃত সংস্কারের পর আথেনীয় জনগণ কী কী অধিকার লাভ করেছিল এবং কোন্ কোন্ দায়িত্বপালনে তারা বাধ্য থাকতো? ৪. সোলোন-কৃত সংস্কারের পূর্বে এবং পরে আথেনীয় রাষ্ট্র কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো? এই সংস্কার আথেনীয় রাষ্ট্রকে আরো বেশী জোরদার করেছিল কেন, ভেবে বলো। ৫. সোলোনের সংস্কার কোন্ শতকে হয়েছিল? এবং সেই শতকের কোন্ চতুর্থাংশে? সোলোন-সংস্কারের সময়ে মিশরে স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল কি? হিসাব করে বলো, সোলোন-কৃত সংস্কারের পর ২৫০০ বৎসর কোন্ বছরে পূর্ণ হয়েছে?

§ ৩২. স্পার্তায় খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে দাসমালিকদের রাষ্ট্র

মনে করতে চেষ্টা করো— খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে কোন্ উপজাতিরা গ্রীক আক্রমণ করেছিল (§ ২৫:৪)।

১. পেলোপন্নেসসের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে **লাকোনিয়া** নামে একটি প্রদেশ ছিল। তার মধ্যভাগে যে নদী-অববাহিকা ছিল তা তিন দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু ও দুর্গম

পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়ী অঞ্চলে লোহের খনি ছিল। লাকোনিয়ার সমুদ্রোপকূল হয় খাড়া পর্বতময় নয়তো-বা নিচু জলাভূমি; নৌচলাচলের জন্য মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। অববাহিকা অঞ্চলের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, পশুচারণক্ষেত্রও ছিল চমৎকার। পেলোপন্নেসসের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত মেস্সেনিয়া প্রদেশ শস্যশ্যামল দেশ রূপে আরো বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

২. দোরীয়গণ লাকোনিয়া জয় করে সেখানে স্পার্তা নামে নগর স্থাপন করে। বিজয়ীরা নিজেদের নাম দিয়েছিল স্পার্তান্। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর তারা মেস্সেনিয়াও দখল করে নেয়।

বিজিত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে স্পার্তানরা দাসে পরিণত করে। দাসদের বলা হতো **হিলোতেস***, অর্থাৎ 'বন্দীত্বে আবদ্ধ'।

বিজয়ীরা অতঃপর দাসমালিকভিত্তিক সমাজের পত্তন করে এখানে। প্রত্যেক স্পার্তান একখণ্ড করে জমি পেত; কয়েকটি হিলোতেস-পরিবার (অর্থাৎ দাস-পরিবার) মিলে তা চাষবাস করতে বাধ্য হতো। সমকালীদের ভাষ্য অনুযায়ী, হিলোতেসরা 'তাদের মালিককে নিজের পরিশ্রমে জমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর অর্ধেক দিতে বাধ্য হতো'।

হিলোতেসগণ অত্যাচারী শোষক স্পার্তানদের ঘৃণা করতো এবং বহুবার বিদ্রোহ করেছিল। হিলোতেসরা যাতে সর্বদা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে এবং বিদ্রোহ করার সাহস না পায় তজ্জন্য তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী হতো স্পার্তানরা তাদের মেরে ফেলতো।

হিলোতেস এবং স্পার্তানদের মধ্যে সংগ্রাম ছিল দুটি অসম শ্রেণী — দাস ও দাসমালিকদের মধ্যে সংগ্রাম; এ ছিল শ্রেণীসংগ্রাম।

৩. সবচেয়ে বড়ো আকারে হিলোতেস-অভ্যুত্থান (অর্থাৎ দাসবিদ্রোহ) ঘটেছিল খ্রী. পূ. ৭ম শতকে মেস্সেনিয়ায়। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা পরাজয় বরণ করে। তাদের একাংশ মহাদুর্গম এক পর্বতশীর্ষে আশ্রয় নেয়।

স্পার্তানরা এই পলাতক হিলোতেসদের অবরোধ করে রাখে। রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্যে তারা চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় বেয়ে উপরে গিয়ে ওঠে। বিদ্যুতের আলোকে তখন শুরু হয় নির্মম সংগ্রাম। হিলোতেসগণ শুধু নিজেরাই নয়, তাদের স্ত্রীরাও যুদ্ধ করেছিল। প্রাচীন লেখকের রচনা সাক্ষ্য দিচ্ছে: 'এমন কি তাদের স্ত্রীরা হাতে পাথর নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। হাতে

* হিলোতেস্ (গ্রীক heilotes) শব্দটি ইংরেজিতে helot রূপে পরিচিত। — অনু.
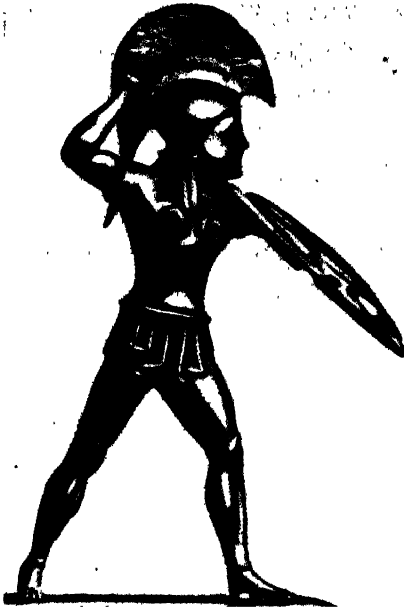
সংগ্রামরত স্পার্তান যোদ্ধা। (প্রাচীন মূর্তি।)

অস্ত্র তুলে নিয়েছিল তারাও, আর পুরুষরা যখন দেখলো তাদের পত্নী ক্রীতদাসীর জীবনযাপনের চেয়ে স্বামীর সাথে সহমরণকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তখন তাদের সাহস ও বীরত্ব সহস্রগুণ বর্ধিত হয়েছিল।'

তিন দিন তিন রাত্রি একনাগাড়ে যুদ্ধ চলে। স্পার্তানরা চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে। তাদের অবস্থা ছিল আশাহীন। কিন্তু ওদিকে আবার স্পার্তানরাও দেখতে পাচ্ছিল যে, যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বিপুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা তখন বিদ্রোহীদের কথা দিলো যে, মেস্সেনিয়া ছেড়ে চিরতরে চলে যাবার অঙ্গীকার যদি তারা করে, তা হলে তাদের স্বাধীন হিসেবে গণ্য করা হবে। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে হিলোতেসদের এক অংশ দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

৪. হিলোতেসদের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য স্পার্তানরা অত্যাবশ্যকীয়রূপে যার প্রয়োজন অনুভব করলো, তা হলো রাষ্ট্র—অর্থাৎ সেনাবাহিনী, আইন, বিচারব্যবস্থা।

রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হলো স্পার্তানগণ। বয়োপ্রবীণদের পরামর্শসভার জন্য সম্ভ্রান্ত স্পার্তানদের ভিতর থেকে লোক নির্বাচন করা হতো। পরামর্শসভার পরিচালনায় ছিল দুজন রাজা, সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাদেরই। এই সভায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং অপরাধীদের বিচার ও শাস্তিদান করা হতো।

অস্ত্রধারণে দক্ষ সমস্ত স্পার্তান ছিল সৈনিক; যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনো কাজকর্ম করা আইনবলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। শান্তির সময়েও স্পার্তানরা সারা দিন সেনাশিবিরে অতিবাহিত করতো; সেখানে তারা প্যারেড করতো, দৌড়াতো, বর্শা ক্ষেপণ ও অন্যান্য সামরিক বিদ্যাদি অনুশীলন করতো।

স্পার্তান সৈন্যেরা ভালো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকতো। তারা সকলেই ছিল

মেস্সেনিয়ায় বিদ্রোহী হিলোতেসদের সাথে স্পার্তানদের যুদ্ধ। (আমাদের সমসাময়িক কালে জনৈক শিল্পীর আঁকা ছবি।)

পদাতিক সেনা। যুদ্ধকালে তারা সৈন্য সমাবেশ কয়েকটি সারিতে বিন্যস্ত করতো; এধরনের সৈন্যসজ্জাকে বলা হতো ফালাঙ্গোস্। রণশিঙা ও সমবেত ঐকতান-গীতির আওয়াজের মধ্যে সারবদ্ধ ফালাঙ্গোস্ শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হতো; দেখে মনে হতো, বর্শাসজ্জিত সারি সারি বর্ম দিয়ে তৈরি একটি দেয়াল যেন এগিয়ে যাচ্ছে।

৫. স্পার্তান ছেলেদের বাল্যকাল থেকেই ভবিষ্যৎ সৈনিক এবং দাসমালিকদের স্বার্থরক্ষকরূপে গড়ে তোলার জন্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাদান করা হতো। ইস্পাতকঠিন দেহ ও মনের যাতে অধিকারী হতে পারে সেজন্য ছোটো ছোটো ছেলেপিলেদের অত্যন্ত কঠোর অবস্থার মধ্যে মানুষ করা হতো। দেহচর্চাই তাদের প্রায় সমস্ত সময় অধিকার করে থাকতো।*

দেহকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করায় ধীরে ধীরে সক্ষম করে তোলার জন্য তাদের

* পাশ্চাত্যে প্রচলিত প্রবাদ 'স্পার্তানের মতো বাঁচা' মানে দেহকে শীত-গ্রীষ্ম সর্বপ্রকার আবহাওয়ার উপযুক্ত মজবুত করে গড়ে তোলা।

নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হতো। বেত্রাঘাতের ফলে ক্ষতবিক্ষত শরীরের রক্তে মাটি ভিজে যেত, তার উপরে সাজাপ্রাপ্ত তরুণ পড়ে থাকতো। তাদের মনকে হিংস্র ও নিষ্ঠুর করে তোলার জন্য হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে হিলোতেসদের তুলে দেয়া হতো।

জ্যেষ্ঠদের যাবতীয় নির্দেশ বিনাপ্রশ্নে অবনত মস্তকে পালন করতে হতো। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের এমন কি কথা বলা পর্যন্ত বড়োদের হুকুম ছাড়া নিষিদ্ধ ছিল। গ্রীকরা ঠাট্টা করে বলতো, পাথরের তৈরি মূর্তিও হয়তো শুনবে কথা বলছে, কিন্তু স্পার্তান ছেলেদের গলার এতটুকু আওয়াজও কখনো শুনতে পাবে না।

অতি সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে সঠিক কথা বলা শেখানো হতো তাদের। সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট কথা বলার ধরনকে বলা হয় 'লাকোনীয়' অর্থাৎ লাকোনিয়ায় প্রচলিত বাক্‌পদ্ধতি*। যেমন ধরো, যুদ্ধে পাঠাবার সময় মা ছেলের হাতে বর্ম তুলে দিয়ে বলছে: 'সাথে করে, নয়তো ওপরে'; স্পার্তায় বর্ম বিহীন হওয়া কলঙ্কজনক ব্যাপার বলে গণ্য হতো; যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির দেহ তার বর্মের উপরে ফেলে শিবিরে নিয়ে আসা হতো। 'বর্ম সাথে করে, নয়তো বর্মের উপরে' বাক্যটির অর্থ তাই—ভীরুর মতো নিজেকে দেখানোর চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু-বরণও শ্রেয়।

স্পার্তার তরুণসম্প্রদায় প্রচণ্ড শক্তিশালী, সাহসী ও সহ্যশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধা হিসেবে বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা যেমন ছিল নিষ্ঠুর, তেমনি অসভ্য—কদাচিৎ তারা লিখতে-পড়তে পারতো।

স্পার্তান তরুণদের জীবনযাত্রা

(প্রাচীন ঐতিহাসিক প্লুতার্কের রচনা থেকে)

নিজ সন্তানকে পিতা মোড়লের কাছে নিয়ে আসতো। যদি দেখা যেত সন্তান স্বাস্থ্যবান ও শক্তসমর্থ, তখন মোড়ল তাকে মানুষ করে তোলার অনুমতি দিত; আর সন্তান দুর্বল ও হীনস্বাস্থ্য হলে তাকে গহ্বরে ফেলে দেয়া হতো।

সাত বৎসর বয়স হলেই সব ছেলেদের একত্র সমবেত করে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হতো। অতঃপর তারা থাকা-খাওয়া সবই একসাথে করতো একই রকম অবস্থার মধ্যে থেকে। দলের মাথা করা হতো সেই ছেলেটিকে যাকে দেখা যেত বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিবিবেচনায় অন্যদের চেয়ে বেশি দক্ষ। বাদ বাকি অন্য সবাই এমনভাবে তাকে অনুসরণ করতে, তার নির্দেশ মান্য করতে, তার দেওয়া শাস্তি সাহসের সাথে সহ্য করতে বাধ্য ছিল যে, এ যেন মুখবুজে শুধু সব শুনে যাবার একটা বিদ্যায়তন মনে হতো।

লিখন ও পঠনের অভ্যাস ততোটুকুই করানো হতো, যতোটুকু না হলেই একেবারে নয়। আর তার বাইরে সমস্ত কিছুই ছিল এই সব অভ্যাসাদির অনুশীলন—বিনাবাক্যে নির্দেশ মান্য করা,

* বাংলায় অবশ্য এধরনের কোনো কথা প্রচলিত নেই, তবে সমগ্র পশ্চিমী জগতে আছে; ইংরেজি বাগ্বিধি ও অলংকারশাস্ত্রে laconic শব্দের উৎপত্তি এখান থেকেই। — অনু.

১. একটি ছোটো ছেলে পায়ের কাঁটা তুলছে। (প্রাচীন গ্রীক মূর্তি।) দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়াতে গিয়ে ছেলেটির পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়। তবু কষ্ট সহ্য করে সে দৌড়োয় এবং প্রথম স্থান অধিকার করে। এর পরে বেচারি বসে বসে কাঁটাটা বের করছে। ২. মল্লযুদ্ধ। (প্রাচীন গ্রীক মূর্তি।)

সাহসিকতার সাথে দুঃখকষ্ট সহ্য করা, যুদ্ধানুশীলনে জয়ী হওয়া। যতো বয়স বাড়তো ততো কঠোর অবস্থার মধ্যে তাদের রাখা হতো—মাথা ন্যাড়া করে দেয়া হতো, খালি পায়ে তাদের চলাফেরা করতে হতো, এবং বিনা কাপড়ে খেলাধুলো করতে হতো। তাদের বারো বৎসর পূর্ণ হলে তারা পরার জন্য বৎসরে মাত্র একটি করে আলখেল্লা জাতীয় পোষাক পেত। তাদের গায়ের চামড়া কর্কশ হয়ে যেত। গরম জলে গা-হাত ধৌত করতে পারতো না। তারা খড়কুটি দিয়ে নিজ হাতে প্রস্তুত তোশকের উপরে শুয়ে ঘুমাতো।

স্পার্টান কবি তির্তেওস*-এর কবিতা থেকে

রক্ষি জন্মভূমি আর দেশের সন্তানে
দাঁড়াই বিক্রমে, এসো; যায় যাক প্রাণ!
যুদ্ধ করো প্রাণপণে, হে তরুণ দল,

* খ্রী. পূ. ৭ম শতকের কবি Tyrtaios; গ্রীক ভাষায় যুদ্ধবিষয়ক কবিতা লিখে গেছেন।-অনু.

সারিবদ্ধ হও সবে। ধিক্ তোরে, যদি
হীন ভীরুতার বশে যুদ্ধ ছাড়ি আসো।
বক্ষে রাখো গর্বে ভরি সাহস বিপুল,
দেহ-মন পণ রাখো, যুদ্ধে পিছু নয়...
এসো তবে, দৃঢ়পদে দাঁড়াও ভূমিতে
বীরদর্পে বলভরে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়
ওষ্ঠাধরে দন্ত চাপি', হে বীর সন্তান।

? ১. স্পার্তার সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণী ছিল? আত্তিকা ও স্পার্তার মধ্যে জনশ্রেণীবিন্যাসগত পার্থক্য কী কী ছিল? ২. শ্রেণীসংগ্রাম মানে কী? স্পার্তায় শ্রেণীসংগ্রাম কোন্ রূপে দেখা দিয়েছিল? সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির দেশে দেশে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দাও। ৩. স্পার্তায় রাষ্ট্রব্যবস্থা কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো? তোমার উত্তর যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করো। ৪. স্পার্তায় পুত্রসন্তানকে মানুষ করে তোলার সর্বপ্রধান লক্ষ্য কী ছিল? কী কী উপায়ে সেই লক্ষ্যে তারা পৌঁছতো? স্পার্তান শিশুদের শিক্ষাদানপ্রণালীর মধ্যে তোমার কী ভালো লেগেছে এবং কী লাগে নি? ৫. বর্তমান পরিচ্ছেদের (§৩২) উপচ্ছেদসমূহের শিরোনামা নির্দেশ করো।

§ ৩৩. গ্রীসে এবং ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরীয় তীরে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

(দ্র. মানচিত্র ৪ এবং ৫)

মনে করতে চেষ্টা করো—খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের শুরুর দিকে গ্রীকদের অধিকৃত এলাকা কী কী ছিল (১৫১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মানচিত্র দেখ)।

১. গ্রীসে নগর-রাষ্ট্র। খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসের প্রায় সব শহরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শহর আর তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল নিয়ে ছিল রাষ্ট্রের সীমা। এধরনের নগর-রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকতো, থাকতো রাজকোষ এবং নিজেদের মুদ্রাও তারা ঢালাই করতো।

গ্রীসের বহু নগরেই দেমোস ও অভিজাতবর্গের মধ্যে নির্মম সংগ্রাম চলেছিল। বেশ কিছু শহরে দেমোস ঋণদাসত্ব বাতিল করতে এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য শহরে অভিজাতসম্প্রদায়ই কঠিন হস্তে শাসনক্ষমতা ধরে রেখেছিল; সে সব নগরে দেমোসের অবস্থা যে কেমন ছিল তা গ্রীক কবি **হেসিওদ** (তিনি খ্রী. পূ. ৮ম শতকের শেষভাগ থেকে খ্রী. পূ. ৭ম শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন) তাঁর নীতিকবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। (দ্র. § ৩৩-য়ের শেষে সন্নিবিষ্ট পংক্তিমালা।)

নগর-রাষ্ট্রের ভিতরে এই সংগ্রাম অনেককেই মাতৃভূমি ত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছিল। হেসিওদ লিখেছেন যে, 'ঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্য এবং অনাহারের

১

২
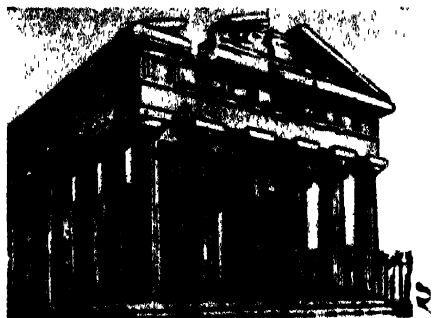
১. ক্রিমিয়া অঞ্চলে গ্রীক শহর খের্সোনেসের নগরপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। (আলোকচিত্র।) তোরণসহ প্রাচীরের নিম্নাংশ মাটিতে ঢাকা পড়েছে। তোরণের উপরে দেয়ালের গায়ে ছোটো দরজা ছিল। প্রস্তরনির্মিত এই প্রাচীরের পাথরগুলো ভালো করে লক্ষ্য করো। ২. সিসিলিতে খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে নির্মিত একটি গ্রীক ধর্মমন্দির। (আলোকচিত্র।) ৩. সিসিলির সিরাকিউস নগরে ব্যবহৃত মুদ্রা। মুদ্রার উপরে সূর্যদেবের ছবি—স্বর্ণরথ ছুটিয়ে আকাশ পাড়ি দিচ্ছেন। ৪. প্রাচীন গ্রীক বাণিজ্যপোত। ৫. প্রাচীন গ্রীক যুদ্ধজাহাজ। (ফুলদানীর উপরে অঙ্কিত ছবি।) ব্রোঞ্জ বা লোহা দিয়ে মোড়া জাহাজের সূচাল সম্মুখভাগ; শত্রুপক্ষীয় জাহাজের পার্শ্বদেশ এর ধাক্কায় ফুটো হয়ে যেত। যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যপোত ভালভাবে দেখে বিচার করে বলো, এগুলোর তৈরির পিছনে নির্মাতাদের মনে সর্বপ্রথমেই কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করেছিল।

৩

৫

৪
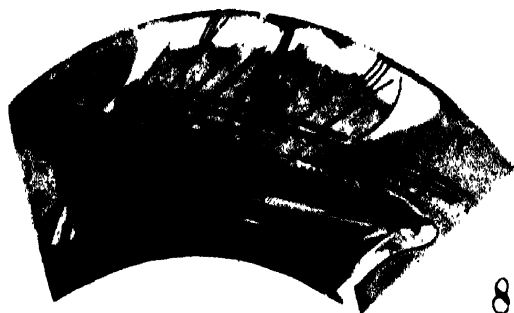
হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য' গরিবেরা পালিয়ে গিয়েছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয়দের বিজয় ঘটলে তাদের বিপক্ষদলের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। দেমোসের হাতে শাসনক্ষমতা চলে এলে তারা শত্রু অভিজাতদের বহিষ্কার করে দিত। জনৈক পলায়নপর অভিজাতের লেখায় এর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে: 'আমার জাঁকজমকপূর্ণ ভবনের বিনিময়ে পালিয়ে যাবার জন্যে জাহাজ পেয়ে গেছি।'

২. উপনিবেশ। গ্রীকরা কাঠের টেকসই জাহাজ তৈরি করতে জানতো। সওদাগরেরা তাতে করে কারিগরদের তৈরি নানান ধরনের হস্তশিল্প সম্ভার ও অন্যান্য গ্রীক দ্রব্যাদি নিয়ে সাগরপারের নানা দেশে যেত। পশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল মিলেতুস, এশিয়া মাইনরের এক গ্রীক শহর। সবচেয়ে ভালো অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের খ্যাতি ছিল কোরিন্থ নগরের, আর আথেন্সের ছিল শ্রেষ্ঠ কুম্ভকারের জন্য খ্যাতি।

প্রথম দিকে বণিকেরা অল্পকালের জন্য ভিনদেশে পাড়ি দিত নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য। পরে গ্রীসের বাণিজ্যনগরীগুলো ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরীয় তীরবর্তী স্থানসমূহে চিরস্থায়ী উপনিবেশ* নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে।

উপনিবেশ স্থানে গিয়ে দেশান্তরী হতে চাইতো গ্রীসের প্রচুর লোক: অধিকতর মুনাফা প্রত্যাশী কারিগর, ভূমিহীন কৃষক আর অবস্থার চাপে দেশান্তরী হতে বাধ্য যারা। যে সব শহর নতুন উপনিবেশ নির্মাণ করছে তারা ঐ সব উপনিবেশে তাদের সামরিক ও সওদাগরী জাহাজের সারবদ্ধ বহর পাঠাতো।

৩. উপনিবেশের জীবনযাত্রা। ভিনদেশের মাটিতে গ্রীকদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো হতো হয় কোনো উপসাগরের পাশে, নয়তো কোনো নদীমুখে। সে সব স্থানে তারা শহর নির্মাণ করে তার চতুষ্পার্শ্বে দুর্গপ্রাচীর তুলে দিত। বহিরাগত বসবাসকারী লোকজন হস্তশিল্পের কর্মশালা তৈরি করতো, শহরের পাশে জমি চাষবাস করতো, পশুচারণ করতো, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন উপজাতিদের সাথে ব্যবসা চালাতো। স্থানীয় উপজাতিদের কাছ থেকে গ্রীকরা দাসদের ক্রয় করতো। দাসদের একাংশকে উপনিবেশেই রেখে দেয়া হতো কাজ করবার জন্য, বাদ বাকি সকলকে বিক্রয়ের জন্য গ্রীসে পাঠিয়ে দেয়া হতো।

উপনিবেশগুলোয় দাসমালিকদের স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠলো। অনেক উপনিবেশই আকারে গ্রীসের বড়ো বড়ো শহরের মতো ছিল। সাগর থেকে বেশি দূরে গ্রীকরা যেত না। জনৈক প্রাচীন লেখক লিখে গেছেন, ডোবার চারপাশে ব্যাং যেমন বসে থাকে, গ্রীকরাও তেমনি সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ঘিরে ছিল।

* উপনিবেশ অর্থে এখানে বোঝাচ্ছে — ভিন্ন দেশ থেকে আগত ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত দেশ বলতে যে 'উপনিবেশ' শব্দ আমরা ব্যবহার করি, তা কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে না।
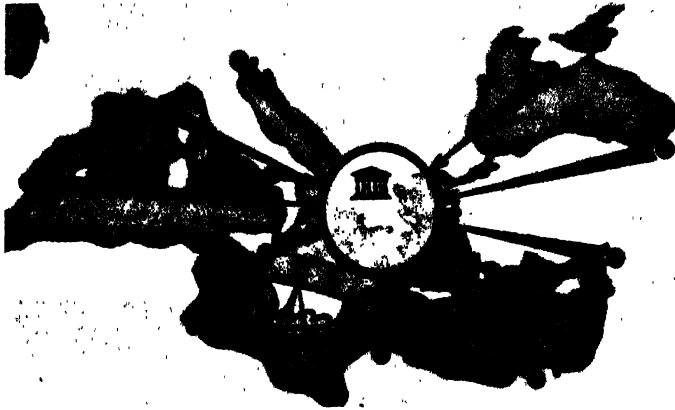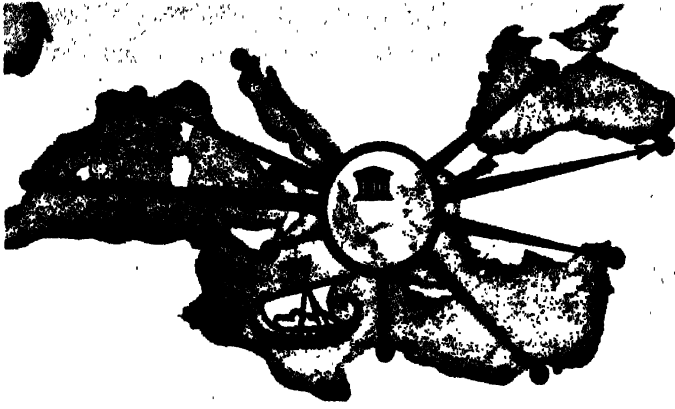
প্রাচীন গ্রীস থেকে দূরদেশে কী পাঠানো হতো, আর গ্রীসে নিয়ে আসা হতো কোন্ কোন্ জিনিস? ছবিতে বর্ণিত বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার চিনতে পারো কিনা দেখ। কোন্ ছবিতে মধু এবং পাপিরাস আছে, বলো।

৪. উপনিবেশ গড়ে ওঠার তাৎপর্য। নিজেদের বিভিন্ন উপনিবেশের সাথে গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন গ্রীক হস্তশিল্পের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল, এবং তার ফলে গ্রীসে হস্তশিল্প ও বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রসার ঘটে। সুবিধাজনক বন্দরগুলোর পাশে পাশে অবস্থিত গ্রীক নগরীগুলো দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠছিল। উপনিবেশসমূহ থেকে দাস আমদানির ফলে গ্রীসে দাসতন্ত্র বিকশিত হয়ে ওঠে। যে সব জায়গায় উপনিবেশ দেখা দিয়েছিল, সেখানে বাণিজ্য ও গ্রীক সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে; এবং স্থানীয় উপজাতিগুলো দ্রুত আদিম সমাজব্যবস্থা থেকে দাসমালিকভিত্তিক সমাজে উন্নীত হয়।

গ্রীকরা বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু মাতৃভাষাকে তারা কখনো পরিত্যাগ করে নি। নিজেদেরকে তারা **হেল্লেন** নামে অভিহিত করতো, আর নিজ মাতৃভূমিকে বলতো **হেল্লাস**।

৫. সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশ। কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের তীরে এখনো অনেক প্রাচীন গ্রীক নগরীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান—দুর্গপ্রাচীর, বাড়িঘর ও ধর্মমন্দিরের অবশিষ্টাংশ আজো পড়ে আছে। ধ্বংসাবশেষ ও সমাধির মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন মুদ্রা, হস্তশিল্পের নানান জিনিসপত্র, গ্রীক ভাষায় লিখিত বস্তুসামগ্রী খুঁজে পেয়েছেন। সে সব জিনিস অংশত গ্রীস থেকে আনীত, আর অংশত স্থানিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রীক নগরসমূহের অন্যতম একটি শহর গড়ে উঠেছিল কের্চ প্রণালীর* তীরে, নাম—**পান্তিকাপেইওন্**। (সোভিয়েত দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অন্যান্য গ্রীক শহর মানচিত্রে খুঁজে বের করো।)

খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর দিকে ককেশাস থেকে স্পেন পর্যন্ত সাগরতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে শত শত গ্রীক নগর-রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল।

হেসিওদের নীতিকবিতা থেকে বুলবুল ও বাজপাখির গল্প

বুলবুল ও বাজপাখির অন্তরালে কবি প্রকৃতপক্ষে কাদের অঙ্কন করেছেন?

> **বুলবুল পক্ষীরে বি'ধি তীক্ষ্ম নখরেতে**
> **শূন্যগামী শ্যেন, জানো, তারে কী কহিল?**
> **যন্ত্রণায় বুলবুল আর্তনাদ ছাড়ে,**
> **ওদিকে সম্ভাষি তারে শ্যেন বাণী ঝাড়ে:**
> **'বৃথাই চেঁচাস তুই, ওরে হতভাগা,**
> **মোর শক্তি বহু বেশি; নিতে পারি তোকে**
> **যথা ইচ্ছা তথা কিংবা পেতে পারি তোকে**
> **খাবার টেবিলে আর নইলে ছেড়ে দিতে।'**

? ১. গ্রীসে রাষ্ট্রের উদ্ভব কেন হয়েছিল? আথেন্স ও স্পার্তার ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। ২. গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী ছিল? এসব বৈশিষ্ট্য কীভাবে দেখা দিয়েছিল? ৩. গ্রীকরা কীভাবে উপনিবেশ পত্তন করেছিল, বলো। কেন তারা উপনিবেশ পত্তন করেছিল, বলো।

* সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন প্রজাতন্ত্রে ক্রিমিয়া অঞ্চলে আজভ্ সাগরকে কৃষ্ণ সাগরের সাথে যুক্ত করেছে কের্চ্ প্রণালী। — অনু.

খ্রী. পূ. ১১শ-৯ম ও খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে গ্রীসের ইতিহাস সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারলে। এই সময়পরিধির প্রত্যেকটি যুগে গ্রীকদের জীবন কীরকম ছিল, তাও তোমরা জেনেছো। ইতিহাসবিজ্ঞানে 'যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয় সেই সব সময়কে যা তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাল অপেক্ষা নির্দিষ্টভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করলে ইতিহাসের গতিবিধি বুঝতে সুবিধে হয়। গ্রীক হতিহাসের যুগবিভাগ চিহ্নিত করতে ২৫৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কালপঞ্জী তোমাদের সাহায্যে আসবে।

খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে এবং খ্রী. পূ. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীক জনগণের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রতিতুলনা করো:

ক) খ্রী. পূ. ৫ম শতকের দিকে বিভিন্ন স্থানে গ্রীকদের বসতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?

খ) কৃষিকর্ম, হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?

গ) গ্রীকদের সমাজব্যবস্থার বিন্যাসে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

ঘ) শাসনপরিচালনায় কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?

* তোমার খাতায় একটি তালিকা তৈরি করো যার শিরোনামা হবে: 'খ্রী. পূ. ১১শ থেকে ৩য় শতক পর্যন্ত গ্রীক ইতিহাসে যুগবিভাগ'। তালিকা কীভাবে করবে তার দৃষ্টান্ত ২৫৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তালিকায় দেখ। ঐ অনুযায়ী খ্রী. পূ. ৮ম-৬ম শতাব্দীতে গ্রীকদের জীবনধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লেখ।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতন্ত্রের বিকাশ ও আথেন্সের উন্নতি

§ ৩৪. গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ

(দ্র. মানচিত্র ৪ এবং ১৯৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র)

মনে করতে চেষ্টা করো — খ্রী. পূ. ৫ম শতকের প্রারম্ভে পারস্য সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা ও তার জনসংখ্যা কী ছিল (§ ১৬:৫, এবং ১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র); আথেনীয় সৈন্যবাহিনী কাদের নিয়ে কীভাবে গঠিত হয়েছিল (§ ৩০-৩১:৯)।

১. মারাথনের যুদ্ধ। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এক শত্রুর ভয়াবহ অভিযান গ্রীক জনগণকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। অত্যন্ত পরাক্রমশালী পারস্য সাম্রাজ্য ঈজিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপ ও সাগরের উত্তর উপকূল দখল করে নিয়েছিল। সম্রাট প্রথম দারিউস সমগ্র গ্রীসের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছিলেন।

খ্রী. পূ. ৪৯০ সালে পারস্য বাহিনী জাহাজে চড়ে ঈজিয়ান সাগর অতিক্রম করে আত্তিকায় **মারাথন ময়দানে** অবতরণ করলো, জায়গাটি আথেন্স থেকে মাত্র ৪২ কিলোমিটার দূরে।

যদিও আথেন্স-বাহিনী পারসীকদের চেয়ে বহুগুণ ছোটো ছিল, তবু মাতৃভূমি রক্ষার্থে বীরত্বের সহিত তারা যুদ্ধ করেছিল। মারাথন যুদ্ধে পারসীকগণ পরাজয় বরণ করে দ্রুত জাহাজে চড়ে গ্রীস ছেড়ে পালিয়ে যায়। (যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা ১৯৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। এতদ্‌সঙ্গে ১১ নং রঙিন ছবিটিও দেখ।)

২. জের্ক্সেসের গ্রীস অভিযান। খ্রী. পূ. ৪৮০ অব্দে পুনরায় পারস্যের সৈন্য ও নৌবাহিনী গ্রীস অভিমুখে যাত্রা করলো। সম্রাট প্রথম দারিউসের মৃত্যুর পর নতুন সম্রাট **জের্ক্সেস্** বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল:
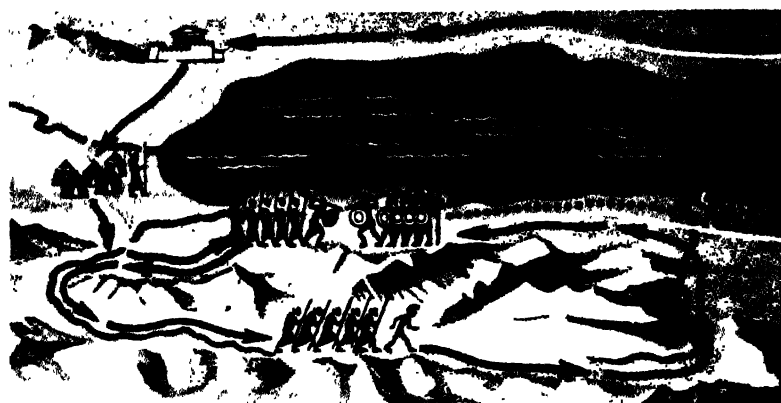
১. মারাথনের যুদ্ধ। ২. থের্মোপিলের পথে যুদ্ধ।

'যারা আমাদের দৃষ্টিতে দোষী (অর্থাৎ পারসীকদের সাথে যারা যুদ্ধে লিপ্ত), এবং যারা নির্দোষ উভয়ের উপরেই আমরা সমভাবে দাসত্বশৃঙ্খলের জোয়াল তুলে দেবো।'

জের্ক্সেসের বাহিনীতে পারসীক ছাড়াও পারস্য-অধিকৃত অন্যান্য দেশের যোদ্ধারাও ছিল, যেমন—আসিরীয়, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, এশিয়া মাইনরের গ্রীক জাতি ও অন্যান্যেরা। যুদ্ধজাহাজসমূহ তৈরি করতে সম্রাট ফিনিসীয়দের বাধ্য করেছিল। পারস্যসম্রাটের অধীনে যোদ্ধৃদল গ্রীস দখলের জন্য অনিচ্ছাভরে রওনা দিলো।

জের্ক্সেসের সৈন্যদল বিনাযুদ্ধে উত্তর গ্রীস দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ গ্রীসের বেশ কয়েকটি নগর-রাষ্ট্র শত্রু-অভিযান প্রতিহত করার

উদ্দেশ্যে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। স্পার্তার সম্রাট **লেওনিদাসের** অধিনায়কত্বে গ্রীক বাহিনী সংকীর্ণ থের্মোপিলে গিরিপথ পাহারা দিয়ে মধ্য গ্রীসে পারসীকদের প্রবেশপথ অবরোধ করে রইলো।

৩. থের্মোপিলেতে যুদ্ধ। জেরক্সেস্ থের্মোপিলে অভিমুখে যাত্রা করলেন। লেওনিদাসের নিকট দূত পাঠালেন অস্ত্রত্যাগ ও পারস্যবাহিনীর হাতে অস্ত্রসমর্পণের নির্দেশ জানিয়ে। লেওনিদাস উত্তর দিয়েছিলেন: 'এসে নিয়ে যাও।' জের্ক্সেস্ প্রেরিত দূতদের একজন গ্রীকদের ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পারস্যবাহিনীর বিশালত্ব সম্বন্ধে গল্প করেছিল: 'আমাদের তীর আর বল্লম এত যে ছুঁড়লে সূর্য ঢেকে যাবে।' গ্রীক যোদ্ধা উত্তর দিয়েছিল: 'ঠিক আছে, কী আর করা যাবে, অন্ধকারের মধ্যেই তা হলে যুদ্ধ করবো।'

দুদিন ধরে পারস্যবাহিনী গ্রীকদের উপর আক্রমণ চালালো। পারসীক সেনাপতিরা অনিচ্ছুক সৈন্যদের চাবুক মেরে মেরে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছিল। সব আক্রমণই গ্রীসের সৈন্যেরা প্রতিহত করে। কিন্তু রাত্রে কোনো এক বিশ্বাসঘাতক পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ ধরে রাস্তা দেখিয়ে পারসীকদের নিয়ে আসে। লেওনিদাস্ যখন দেখলেন যে তাঁর গ্রীকবাহিনী প্রায় শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি স্পার্তান ব্যতিরেকে সমস্ত গ্রীকদের পিছু হটতে আদেশ দিলেন।

১. জের্ক্সেস বাহিনীর গ্রীস আক্রমণ।
২. সালামিস্ প্রণালীতে যুদ্ধ।

লিওনিদাসের সাথে তিন শ'জন স্পার্তান যোদ্ধা এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হলো: এতে করে পারস্যবাহিনীকে কিছু সময়ের জন্য বাধাদান করে অবশিষ্ট গ্রীকদের রণভূমি ত্যাগের সুযোগ দেয়া গিয়েছিল।*

পারসীকগণ মধ্য গ্রীস অধিকার করে নিল। আথেন্সবাসীরা তাদের নগর ছেড়ে চলে গেল। যুদ্ধে সক্ষম সমস্ত পুরুষ পদাতিক বাহিনী বা নৌবাহিনীতে যোগ দিলো। আথেন্সের নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও দাসদের পেলোপোন্নেসসে নিয়ে যাওয়া হলো এবং **সালামিস** দ্বীপে নৌবাহিনীর প্রহরাধীনে তাদের রাখা হলো। জাহাজ ও দ্বীপ থেকে তারা দেখতে পেলো, জের্ক্সেসের নির্দেশে তাদের জন্মশহর কীভাবে দাউদাউ করে জ্বলছে।

৪. **সালামিসের যুদ্ধ।** আত্তিকা ও সালামিসের মধ্যে যে প্রণালী রয়েছে সেখানে গ্রীকদের সম্মিলিত নৌবাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যান্য গ্রীক নগর-রাষ্ট্রদের চেয়ে আকারে বৃহত্তর ২০০টি জাহাজ ছিল আথেনীয়দের। জাহাজগুলোর উভয় পার্শ্বে তিন সারিতে দাঁড় ছিল বলে তাদের বলা হতো **ত্রিয়েরেস্**, অর্থাৎ ত্রিপংক্তিক। তাদের প্রত্যেকটিতে ১৮০ জন করে দাঁড়ী ও ২৩-৩০ করে সৈনিক থাকতো।

* পরে ঐ স্থানে যুদ্ধের জায়গায় লেওনিদাস্ ও তাঁর যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। তার উপরে লেখা ছিল: 'হে পথিক, আমাদের অন্তিম সম্বন্ধে স্পার্তানদের বলো: স্বধর্মে স্থিত থেকে আমরা আমাদের অস্থি এখানে রেখে গেলাম।'

১, ২, ৩. গ্রীক সৈন্য। (প্রাচীন গ্রীক শিল্পনিদর্শন।) ৪, ৫. পারসীক সৈন্য। (প্রাচীন শিল্পনিদর্শন।)

খোলামেলা বাহির সমুদ্রে অধিকতর দক্ষতার সাথে কর্মক্ষম বিশালাকার ও ভারি পারসীক নৌযান অপেক্ষা গ্রীকদের ত্রিয়েরেস্‌গুলো ছিল দ্রুততর গতিবেগ সম্পন্ন। উপরন্তু **সালামিস্‌ প্রণালীতে** কোন্‌ জায়গায় জলের নিচে চড়া জেগেছে, বা কোথায় জলতলে খাড়া গিরিশৃঙ্গ মুখ উঁচিয়ে রয়েছে গ্রীকরা তা ভালোই জানতো।

নিজের সুবিশাল নৌবাহিনীর বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে জের্ক্‌সেস্‌ তাদের প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করে গ্রীকদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। আত্তিকার উঁচু সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে অমাত্যবর্গ পরিবৃত জের্ক্‌সেস্‌ দেখতে লাগলেন, তাঁর রণতরী গ্রীকদের মুখোমুখি হচ্ছে। আর সালামিস্‌ দ্বীপ থেকে বৃদ্ধ ও নারীর দল তাকিয়ে তাকিয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগলো। যুদ্ধজয় অথবা মৃত্যু—আথেনীয়দের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই: পশ্চাদপসরণ করলে তাদের সকল পরিবার দাস হয়ে যাবে।

পারস্যের নৌবাহিনী প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করামাত্রই গ্রীক রণতরীর দাঁড়ীরা একসাথে তাদের দাঁড় বেয়ে শত্রুর দিকে প্রবলবেগে ধেয়ে এলো। অগ্রসরমান গ্রীক ত্রিয়েরেসের ধাক্কায় শত্রুপক্ষের জাহাজের দাঁড় ভেঙে গেল, জাহাজের সম্মুখস্থ নসাচঞ্চু দিয়ে শত্রুতরীর পার্শ্বদেশ ছিদ্র হয়ে গেল। পারসীকদের জাহাজ অকেজো করে দিলো গ্রীকরা। চড়ায় ঠেকে, জলতলের গিরিশৃঙ্গে আঘাত লেগে এবং নিজেদের মধ্যে গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে পারস্য-রণতরীর ২০০টিরও বেশি জাহাজ ডুবে গেল। বাকি নৌযান যা ছিল, রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলো।

৫. গ্রীকদের চূড়ান্ত বিজয়। পারসীক নৌবাহিনীর পরাজয়ে জের্ক্‌সেস্‌ তাঁর সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে দ্রুত গ্রীস ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন। পারস্য ফিরে যাবার রাস্তাও পাছে গ্রীক যুদ্ধজাহাজ বন্ধ করে দেয়, সে ভয় তাঁর ছিল।

গ্রীসে ফেলে রেখে যাওয়া পারসীক সেনাদের সাথে সম্মিলিত গ্রীক বাহিনীর যুদ্ধ হলো খ্রী. পূ. ৪৭৯ অব্দে **প্লাতেয়া** শহরের কাছে। দীর্ঘকাল ধরে ভয়ানক সংগ্রাম চলেছিল। শত্রু নিধন করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিলো গ্রীকরা।

৪

৫

পারস্য সম্রাটের পদানত গ্রীকদের স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম চলেছিল আরো ৩০ বৎসর ধরে।

সাগরতীরের বহু গ্রীক নগর-রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করলো। এই জোটের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সভ্য ছিল আথেন্স। আথেন্সের অধিনায়কত্বে গ্রীকদের এই সম্মিলিত শক্তি পারস্য নৌবাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছিল এবং এশিয়া মাইনরের সমুদ্রতীরবর্তী ভূখণ্ডে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিল। **পারস্যের সম্রাট তখন বাধ্য হয়ে বিভিন্ন দ্বীপে ও এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করলেন।**

মারাথনের যুদ্ধ

(হেরোদোতোস্ ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের রচনা অবলম্বনে)

মারাথন যুদ্ধে গ্রীক স্ত্রাতেগোস্দের সমরবিদ্যাকৌশল এবং গ্রীক সেনার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় কীসে?

মারাথনের ময়দানে পারস্যবাহিনী অবতরণের দুঃসংবাদ আথেন্সে এসে পেঁছুলো। আথেনীয় অভিজাতবর্গের এক অংশ পারসীকদের পক্ষে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো; তাদের আশা ছিল, পারস্যসম্রাটের সহায়তায় তারা পুনর্বার দেমোসের উপরে প্রভুত্ব করার অধিকার লাভ করবে।

আথেন্সবাসীদের তখন সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। আথেনীয় সৈন্যদল দ্রুত সমবেত হলো। তাদের মধ্যে ছিল ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ১০ হাজার পদাতিক; ছোটো শহর প্লাতেয়া

এক হাজার সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিল সাহায্য করার জন্য। স্ত্রাতেগোস্‌দের* অধিনায়কত্বে সেনাবাহিনী শত্রুর মুখোমুখি হতে চললো। মারাথন ময়দানে চতুর্দিকের উঁচু টিলা থেকে দেখা যাচ্ছিল, আথেন্সবাসীদের সামনে পারস্যবাহিনীর ছাউনি এবং সমুদ্রতীরে টেনে আনা তাদের রণতরী সারি সারি পড়ে আছে। আথেনীয় সৈন্যদলের চেয়ে আকারে পারস্যবাহিনী বহুগুণ বড়ো।

শত্রুরা যাতে আথেন্সের দিকে অগ্রসর হতে না পারে সে পথ বন্ধ করে দিয়ে গ্রীকরা পারসীক অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অগম্য সব পাহাড়ী টিলায় উঠে রইলো। অভিজ্ঞ স্ত্রাতেগোস্‌ মিল্‌তিয়াদেসের উপর বাহিনী পরিচালনার ভার অর্পণ করা হলো।

প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী উভয় পক্ষই সামনাসামনি অবস্থান করে রইলো। অবশেষে গ্রীক বাহিনী ফালাঙ্কসে সারিবদ্ধ হয়ে মারাথন ময়দানে রণাভিযান করলো। মিল্‌তিয়াদেস্‌ জানতেন যে, পারস্যবাহিনীর সেরা সৈন্যদল থাকে বাহিনীর মধ্যভাগে। ফালাঙ্কসের উভয় পার্শ্বদেশে তিনি নিজস্ব বাহিনীর সেরা যোদ্ধাদের রাখলেন।

শত্রুসৈন্যের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত তীরের নিচে আথেন্সবাহিনী পারস্যবাহিনীকে আক্রমণ করলো। তাদের সাহস ও শক্তির পিছনে কাজ করছিল একটিমাত্র বোধ যে, তারা লড়ছে মাতৃভূমির জন্য, জননী, জায়া ও সন্তানসন্ততির জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আথেনীয় ফালাঙ্কসের দুর্বল মধ্যভাগ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে পারস্যসেনারা বিজয়োল্লাস করতে লেগে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই গ্রীক ফালাঙ্কসের পার্শ্বদেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুবাহিনীকে তাড়া করলো, এবং তার পরে শত্রুপক্ষীয় সেরা দলগুলোর উপর দুদিক থেকে আক্রমণ করে বসলো। পারসীকরা সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে নিজেদের জাহাজের দিকে দৌড়ে পালাতে লাগলো। শত্রুপক্ষের ৭টি জাহাজ দখল করে নিল গ্রীকরা, আর অন্যগুলো ততক্ষণে সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়েছে।

একটি আথেনীয় সৈনিক আথেন্সবাসীর কাছে এই সুসংবাদ দ্রুত বহন করার জন্য আনন্দে ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ—মারাথন থেকে আথেন্স—দৌড়ুতে লাগলো। নগরপ্রবেশের পর সে চিৎকার করে উঠেছিল: 'আথেনীয় ভাইসব, তোমরা আনন্দ করো, আমরা জিতেছি!' আর পরক্ষণেই নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এই মহাদৌড়ের স্মৃতি সংরক্ষণার্থেই পরবর্তীকালে ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ দৌড়প্রতিযোগিতা 'মারাথন দৌড়' প্রচলিত হয়।

* স্ত্রাতেগোস্‌ (Strategós) — আথেনীয় সেনা ও নৌবাহিনী পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সেনাধ্যক্ষ।

এস্খিলোস* রচিত 'পারসীক' কাব্য থেকে

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক কবি এস্খিলোস নিজে সালামিসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সম্পর্কে বর্ণনা তাঁর 'পারসীক' কাব্যে পাওয়া যায়।

পলায়ন মানসে নহে
প্রস্তুতিছে হেল্লেন সেনা গাহি' সামগান
সুগম্ভীর ধায় বেগে আক্রমিতে শত্রুর
সেনানী...
একই সাথে অকস্মাৎ দাঁড়ের আঘাতে
ফেনোজ্জ্বল করি তোলে সমুদ্রসলিল...
অগ্রভাগে বাহি' চলে দক্ষিণী সেনা,
ধায় পিছে সারি সারি দাঁড়ের মূর্ছনা,
তীব্রবেগে ধায় নৌদল, সেই সাথে
উঠিল গর্জন: 'ধাও বেগে, হেল্লাস সন্তান!
মাতৃভূমি রক্ষা করো, রক্ষো পরিজনে
দারা-পুত্র সবে, দেবমন্দির আর
প্রপিতামহের কবর! জেনো, যুদ্ধ এবে —
সর্বস্ব সাধনা।

ভেসে আসে চিৎকার পারস্য দলের,
একটি জাহাজ তার তাম্রচঞ্চু দিয়ে
করিল আঘাত... জলে সবখানে রণ ভয়ানক।
পারস্যবাহিনী ছিল অনড় দাঁড়ায়ে,
কিন্তু যবে অগণন তরী যত তার
সংকীর্ণ সাগরে মরে ঠেলাঠেলি করি,
নিজেদেরই চঞ্চুঘাতে ডোবে নিজেরাই,
তখন আঘাত হানে সর্বদিক হতে
হেল্লাসবাহিনী আসি অতি সুকৌশলে...
ডুবিল সকল তরী। জলধিসলিলে
ঢাকে ভগ্ন তরী আর মৃতের শোণিত।
মৃতের শরীরে ঢাকে সমুদ্রবেলা;
শিলাশ্রেণী যত; আর পারস্যবাহিনী
হুলুস্থুলী পড়িমরি পলায় দূরেতে।

? ১. গ্রীক ও পারসীকদের যুদ্ধ সম্পর্কিত এই তালিকাটি প্রণয়ন করো:

যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল	কবে	জয়ী কে হয়েছিল	যুদ্ধে বিভিন্ন লড়াইয়ের তাৎপর্য কী ছিল

২. পারসীকদের সাথে যুদ্ধে গ্রীকরা জয়ী হয়েছিল কেন? মূল কারণগুলোর অন্তত তিনটি উল্লেখ করো। উত্তরদান কঠিন মনে হলে এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও: ক) পারস্যবাহিনী অপেক্ষা গ্রীক সৈন্যদল কেন ভাল যুদ্ধ করতে পেরেছিল? খ) গ্রীক সেনা ও নৌবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কেন সম্ভব হয়েছিল? গ) জের্ক্সেসের

* গ্রীক ট্র্যাজিক নাটকের জন্মদাতা এস্খিলোস (৫২৫-৪৫৬ খ্রী. পূর্বাব্দ) মহান নাট্যকার রূপে অদ্যাবধি সমাদৃত। তাঁর অসংখ্য নাটকের মধ্যে মাত্র সাতটি খুঁজে পাওয়া গেছে। বাংলায় তাঁর নাম ইংরেজির (Aeschylus) অনুকরণে লোকে সাধারণত ইস্কিলাস (ইস্কাইলাস) বা এস্কিলাস (এস্কাইলাস) লেখে। — অনু.

সেনা ও নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো গ্রীক শহর কি যুদ্ধ করতে পারতো? ৩. সোলোন-সংস্কারের পর থেকে মারাথন যুদ্ধ পর্যন্ত কত বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল? এখন হতে কত বছর আগে মারাথন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? খ্রী. পূ. ৪৮০ অব্দের পরবর্তী বৎসর কোন্‌টি? খ্রী. পূ. ৪৮০ অব্দের পূর্ববর্তী বৎসর কোন্‌টি? *৪. খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে আথেন্সে দেমোসের বিজয় কীভাবে মারাথন ও সালামিস যুদ্ধে গ্রীকদের জয়লাভে সহায়তা করেছিল? *৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো গ্রীক যোদ্ধার পক্ষ থেকে তার জবানীতে থের্মোপিলে অথবা সালামিস যুদ্ধ বর্ণনা করো।

§ ৩৫. খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতন্ত্র

(দ্র. মানচিত্র ৪)

মনে করতে চেষ্টা করো—আথেন্সে মানুষদের দাসে পরিণত করার কোন নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল; তা কেন এবং কবে করা হয় (§ ৩০-৩১:৮)।

১. গ্রীসে দাস আমদানী। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে দাসদের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে রীতিমতো বেড়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের ফলে বহু দাস পাওয়া যেত। যুদ্ধবন্দী সৈনিকদেরই শুধু নয়, তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদেরও গ্রীকরা শত্রুদেশ থেকে ধরে এনে দাসত্বে আবদ্ধ করতো। এশিয়া মাইনরের উপকূলে একবারের আক্রমণেই আথেন্সবাসীগণ ২০ হাজারের উপর লোককে বন্দী করে এনে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেয়।

বোম্বেটে—অর্থাৎ জলদস্যুরা—তাদের দ্রুতগামী জাহাজ নিয়ে অন্যান্য বাণিজ্যজাহাজ আক্রমণ করতো, সমুদ্রতীরবর্তী জনপদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তার পর এভাবে লোকজন ধরে এনে দাস হিসেবে তাদের বিক্রি করে দিত।

ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরীয় বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা দাসদের গ্রীসে নিয়ে আসা হতো গ্রীক হস্তশিল্প ও অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে।

দাসের সন্তানসন্ততিও দাস হিসেবে গণ্য হতো, এবং তাদের মা যে দাসমালিকের সম্পত্তি, তারাও তার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। অবশ্য এধরনের ছেলেপিলের সংখ্যা ছিল একান্তই নগণ্য, কেন না গ্রীসে দাসদের জীবন এত দুঃসহ ও কঠোর ছিল যে, তারা শেষ পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা যেত।

গ্রীসে অধিকাংশ দাসই ছিল বিদেশাগত, তবে গ্রীকও তাদের মধ্যে দেখা যেত। কিছু কিছু নগর-রাষ্ট্রে ঋণ অপরিশোধের দায়ে লোকজনকে দাসে পরিণত করা তখনো চলেছিল।

২. দাস ক্রয়বিক্রয়ের বাজার। প্রায় সমস্ত গ্রীক নগরেই **দাস-বাজার ছিল**। সেখানে সব সময়েই প্রচুর 'মাল' পাওয়া যেত। পুরুষ, নারী, কিশোর-কিশোরী ও একেবারে
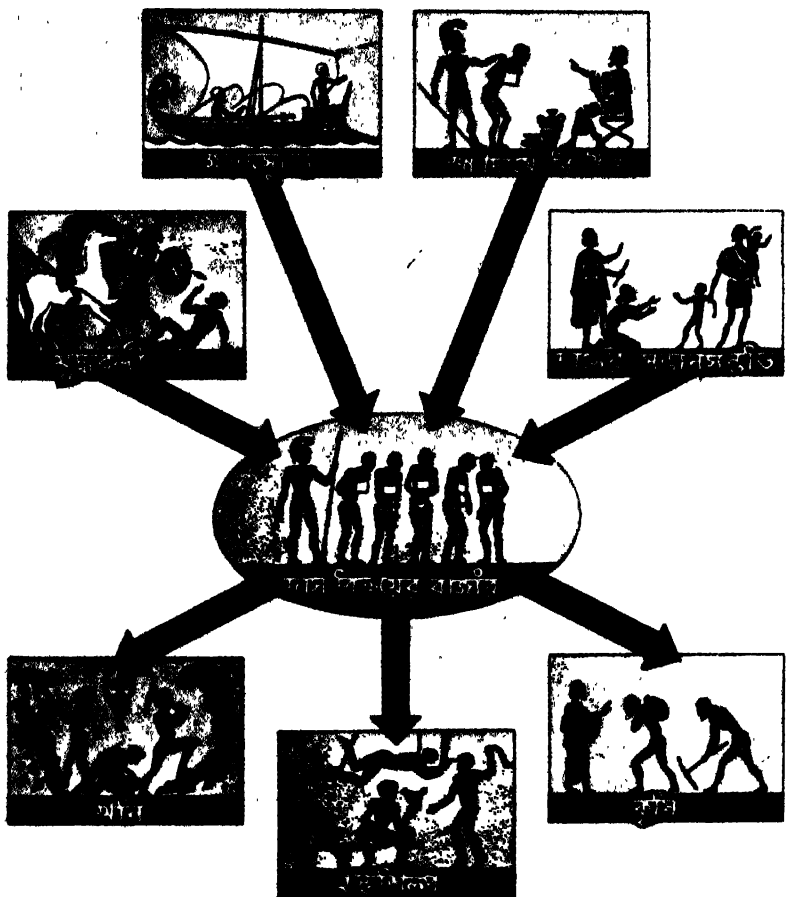
খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গ্রীসে দাসদের উৎস: যুদ্ধবন্দী, জলদস্যুতা, ঋণশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রয় এবং দাসদের সন্তানসন্ততি।

দাসশ্রমের প্রধান প্রয়োগ: খনিতে, হস্তশিল্পের নানান ধরনের কারিগর বৃত্তিতে, কৃষিকর্মে, গৃহভৃত্য হিসেবে।

ছোটো ছেলেমেয়েরও কেনা-বেচা চলতো। তাদের বুকের উপর ঝুলিয়ে দেয়া ছোটো কাষ্ঠফলকে লেখা থাকতো তার দেশ, বয়স এবং কী কী কাজ সে করতে পারে তার ফিরিস্তি। খরিদ্দাররা এই সমস্ত 'জ্যান্ত মাল' বাছাই করে কেনার জন্য তাদের দৈহিক শক্তি ও সহ্যক্ষমতা পরীক্ষা করতো, তাদের শরীরের মাংসপেশী টিপে টিপে দেখতো, ভারি জিনিস তুলতে এবং দৌড়ঝাঁপ করতে বাধ্য করতো।

৩. দাস-শ্রম। গ্রীসের সেই সমস্ত এলাকাই সর্বাপেক্ষা দাস অধ্যুষিত ছিল যেখানে পাথর ও আকরিক খনি ছিল এবং হস্তশিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। **সর্বাপেক্ষা শক্ত পরিশ্রমের কাজ গ্রীকরা দাসদের দিয়েই করাতো।** আকরিক ও মর্মর প্রস্তর সংগ্রহের কাজ একমাত্র দাসরাই করতো। কোনো স্বাধীন গ্রীক, তা সে যত দরিদ্রই হোক, কখনোই পাথর ভাঙার ও আকরিক সংগ্রহের কাজ করতো না। বাণিজ্যপোতে কর্মরত দাস-দাঁড়ীরা একটানা একসুরো শিঙাধ্বনির তালে তালে অত্যন্ত ভারি দাঁড় টানতে থাকতো।

খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে ধনী গ্রীসবাসীরা হস্তশিল্পের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানাদির মালিক হয়ে বসে। এধরনের একেকটি কারখানায় এক শ' জন পর্যন্ত দাস কাজ করতো। যে কাজ তাদের করতে হতো তা জটিল ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল। যেমন মৃৎশিল্পের কর্মশালায় দাসেরা জল তুলতো, জ্বালানি নিয়ে আসতো, মাটি ছেনে তার দলা বানাতো, কুমোরের চাকা ঘোরাতো। পাত্রাদি তৈরি এবং তা অলংকরণের কাজকর্ম করতো স্বাধীন কর্মীরা। (দ্র. রঙিন ছবি ১২)

হস্তশিল্পের চেয়ে কৃষিকাজে কমসংখ্যক দাস নিয়োগ করা হতো। চাষীরা নিজেরাই স্বহস্তে চাষবাস করতো। অবশ্য বিষয়সম্পত্তি সম্পন্ন ধনীরাই শুধু নয়, অবস্থাপন্ন কৃষকরাও বাড়িতে দাস রাখতো। তারা যব ও গম মাড়াই করতো, পা দিয়ে ছেনে এবং পেষণযন্ত্রের সাহায্যে আঙুরের রস ও জলপাইয়ের তেল বের করতো, ভারি ভারি ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেত হাটবাজারে। জমি চাষআবাদের ব্যাপারে দাসদের সাধারণত বিশ্বাস করা হতো না।

গৃহভৃত্য হিসেবে দাস ব্যবহারের প্রচলন গ্রীসে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান ছিল। অবস্থাপন্ন গৃহে ৩-৪ জন করে দাস থাকতো, আর ধনী লোকের বাড়িতে থাকতো ৫০ জন পর্যন্ত দাসদাসী।

৪. দাসদের শাস্তিদান। বেত্রাঘাত ও নানাবিধ শাস্তি ব্যতিরেকে দাসদের খাটানো যেত না। তারা নিজেদের পরিশ্রমের ফলাফল বিষয়ে কখনোই আগ্রহী ছিল না, কেন না যাই সে করুক না কেন সবই তো তার মালিক পাবে। 'ওদিসি' মহাকাব্যে বলা হয়েছে: 'দাস অমনোযোগী; মালিক তাকে কাজ করতে বাধ্য না করলে সে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করতে চায় না...'

দাসদের কাজকর্মের খবরদারি করতো পরিদর্শক। হয়তো একটু হাঁফ ছাড়ার জন্য কাজে একটু ঢিল দিয়েছে কোনো দাস, অমনি সঙ্গেসঙ্গে তার পিঠে চাবুক পড়তো। প্রায়শঃই চাবুকের প্রান্তদেশ শিসা দিয়ে মোড়ানো থাকতো। পিঠে-কাঁধে চাবুকের মারে দগদগে ঘা হয়নি নেই, এমন দাস কদাচিৎ চোখে পড়তো।

দাসকে যে কী পরিমাণ কষ্ট দেয়া হতো সমকালীন ব্যক্তিদের লেখায় তার বর্ণনা পড়লে শিউরে উঠতে হয়: 'চাবুক মারো, মারো কিল, চড়, ঘুষি, লাথি,

১. খনিতে কর্মরত দাস। (ফুলদানিতে অঙ্কিত চিত্র।) ২. আথেনীয় কুম্ভকারের কাজ। (গ্রীক ফুলদানির উপরে আঁকা ছবি। বর্তমান গ্রন্থে কোথায় এই অঙ্কিত ছবি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে, খুঁজে বের করো। ৩. ঊর্ধাকাশ থেকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে দেখলে আথেন্স ও পিরেউস শহরকে যেমন দেখায়। (পুনঃকল্পিত রূপ।)

৩
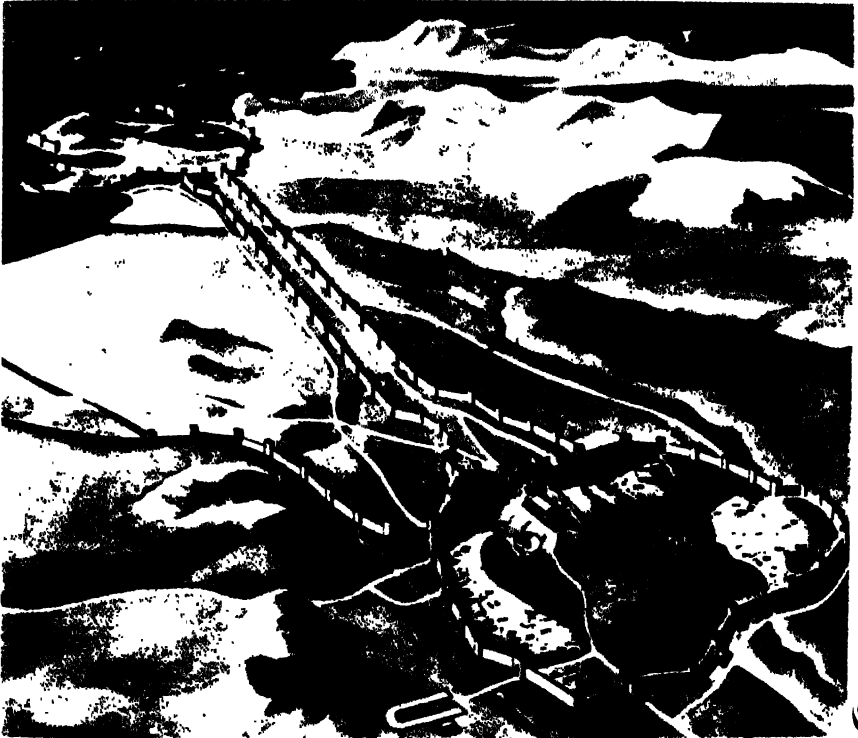
ছ্যাঁকা দাও, গাঁট মুচড়ে দাও, নাকের মধ্যে সির্কা ঢেলে দিতে পারো, কিংবা পেটের উপরে ইঁট চাপিয়ে রাখতে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।'

৫. দাসমালিকদের সাথে দাসের সংগ্রাম। দাস সর্বদা যতভাবে সম্ভব সবরকমে মালিকের ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করতো: **যন্ত্রপাতি ভেঙে দিত,** গৃহপালিত পশু **খোঁড়া করে দিত, কী করে সবচেয়ে খারাপ ভাবে কাজ করা যায়** তার চেষ্টা করতো। প্রায়ই মালিকদের কাছ থেকে **পালাবার** চেষ্টা করতো, যদিও ভালোই জানতো যে একবার ধরা পড়লে কী দুর্বিষহ অত্যাচারই না সইতে হবে। নিষ্ঠুর দাসমালিক দাস কর্তৃক **নিহত হতো** বড়ো কম নয়। মাঝে মাঝে দাসদের **বিদ্রোহ** দেখা দিত। **এ ছিল শ্রেণীসংগ্রাম — দাসমালিকের বিরুদ্ধে দাসের সংগ্রাম।**

খ্রী. পূ. ৫ম শতকের মধ্যভাগে ভয়াবহ ভূমিকম্পে স্পার্তা নগর ধ্বংস হয়ে যায়। তখন চতুর্দিক থেকে হিলোতেসের দল স্পার্তায় ছুটে আসে; উদ্দেশ্য — আকস্মিকভাবে দাসমালিকদের কব্জা করে ফেলে ভালোমতো একটু শিক্ষা দেওয়া। স্পার্তাবাসীরা এই আক্রমণ প্রতিহত করেছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয় নি। তখন তারা বাধ্য হয়ে অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রের দাসমালিকদের সাহায্য চেয়েছিল। আতঙ্কিত, ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া স্পার্তান দূত হিলোতেসের সাথে তাদের যুদ্ধে অন্যান্যদের সহায়-সামর্থ্য প্রার্থনা করে ফিরেছিল। কয়েকটি নগর-রাষ্ট্র সাহায্যও করেছিল। তবু মোটের উপর হিলোতেসের এক অংশ নিজেদের মুক্তি অর্জন করে স্পার্তা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

? **১. খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে লোকজন কীভাবে দাসে পরিণত হতো? ২. গ্রীসে দাসরা কী কী কাজ করতো? ৩. সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশের তুলনায় গ্রীসে দাসমালিকভিত্তিক সমাজ ব্যাপকতরভাবে যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ কি? ৪. দাসরা তাদের মালিকদের সাথে কী কী উপায়ে সংগ্রাম করেছিল? কমপক্ষে ছ'টি উপায় বলো। এই সংগ্রাম কীজন্য শ্রেণীসংগ্রাম আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে?**

§ ৩৬. খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকের মধ্যভাগে আথেন্সের শক্তি ও সমৃদ্ধি

(দ্র. মানচিত্র ৪ ও ৫)

১. আথেনীয় নৌ-জোট*। পারস্যের সাথে শান্তি স্থাপনের পরেও আথেন্সের অধিনায়কত্বে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের জোট অব্যাহত রইলো। এই জোটের সদস্য

* এই জোট ইংরেজিতে ভিন্ন নামে পরিচিত। প্রথমদিকে জোটের সভা অনুষ্ঠিত হতো দেলোস্ দ্বীপে এবং সেখানেই এর খাজাঞ্চিখানাও ছিল বলে এক The Delian League নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। — অনু.

ছিল ২০০টিরও বেশি নগর-রাষ্ট্র। যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক বাহিনী ছিল সামগ্রিকভাবে জোটের অধীন। জোটের সদস্য প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রকে নির্দিষ্টসংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করতে হতো অথবা জোটের অর্থ-তহবিলে চাঁদা দিতে হতো।

আথেনীয় সেনাপতিরা সমগ্র জোটের অধীনস্থ নৌবাহিনী ও সৈন্যদল পরিচালনা করতো। জোটের খাজাঞ্চীখানা আথেনীয়গণ নিজেদের শহরে তুলে নিয়ে আসে এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অর্থ-তহবিলে কী পরিমাণ চাঁদা দিতে হবে তাও তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে দিত। জোটটির নামকরণ করা হয় **আথেনীয় নৌ-জোট**, আথেনীয়দের বলা হতো — 'সমুদ্রের রাণী'।

২. আথেন্সের নৌ-বাণিজ্যের উন্নতি। সমুদ্রপথে আথেন্সের আধিপত্যের জন্য তাদের বাণিজ্য অত্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধজাহাজ দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে আথেনীয় বাণিজ্যপোতসমূহ ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরে পাড়ি জমাতো। আথেন্স থেকে ছ'কিলোমিটার দূরে অতিশয় গভীর ও শান্ত উপসাগরের তীরে আথেনীয়রা **পিরেউস** বন্দর নির্মাণ করে; তাতে **জেটি**, গুদাম ও **জাহাজ নির্মাণ কারখানা** ছিল। পান্তিকাপেইওন্, সিরিয়া, মিশর, সিসিলি ও অন্যান্য নানান দেশ থেকে আগত বহু জাহাজ এই বন্দরে মাল খালাস করতো। আফ্রিকায় এবং গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলে প্রস্তুত মালপত্রাদিও এখানে নামানো হতো। (দ্র. রঙিন ছবি ১৩।) এমন কি গ্রীস থেকে বহু দূরে অবস্থিত অনেক দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খ্রী. পূ. ৫ম শতকের আথেনীয় কারিগরদের তৈরি অনেক আম্ফোরা ভগ্ন ও আভাঙা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন। বন্দরে আনীত মালপত্রের জন্য বণিকগণ আথেন্সের সরকারি কোষাগারে **শুল্ক** অর্থাৎ বাণিজ্য কর দিত।

বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে দেশে শান্তি থাকাকালেও আথেন্সে 'জ্যান্ত মাল' আমদানি করা হচ্ছিল; গ্রীসে বৃহত্তম দাস-বাজারগুলোর একটি এখানে গড়ে উঠেছিল।

৩. আথেন্সের রৌপ্য খনি। আথেনীয় রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বিভিন্ন খনিতে হাজার হাজার দাস-মজুর খাটতো। মাটির গভীর নিচে ধূম্রাচ্ছন্ন বাতির স্বল্পালোকিত গহ্বরে তারা শাবল, গাঁইতি আর ভারি হাতুড়ি দিয়ে আকরিক ভাঙতো। সেখানে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ এত সংকীর্ণ হতো যে এমন কি শুয়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হতো। কিশোরবয়সী দাসদের কাজ ছিল আকরিক ভর্তি ভারি চুবড়ি হামাগুড়ি দিয়ে টেনে টেনে গহ্বরের বাইরে নিয়ে আসা। মাটির উপরে দাসরা বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপরে আকরিক রেখে লোহার মুষল মেরে মেরে তা ভাঙতো এবং পরে যাঁতাকলে তা গুঁড়ো করতো। যাঁতা ঘোরাবার কাজ করানো গাধা দিয়েও সম্ভবপর ছিল, কিন্তু আথেনীয়রা দাসদের দিয়ে করানোই বেশি পছন্দ করতো, কেন না তা আরো শস্তা পড়তো, এতে আথেনীয় কোষাগারে রাজস্ব আসতো প্রচুর। আকরিক সংগ্রহ ও ভাঙার কাজে দাসদের এত পরিশ্রম করানো হতো যে তারা আহার-নিদ্রার

সময় খুবই সামান্য পেত। রাষ্ট্রের মালিকানায় যে সব লবণ কারখানা ছিল, সেখানে দাসদের খাটানো হতো।

৪. **আথেনীয় রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য কাদের কাজে লাগতো।** খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গ্রীস দেশে আথেন্স নগর-রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

আথেনীয়দের ধনসম্পদের ফলে বড়ো বড়ো **সার্বজনীন ভবন** ও নগররক্ষার্থে বিশালাকার দুর্গাদি নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠেছিল। নিজেদের শহরের চারদিকে তারা মিনারসমেত দুর্গপ্রাচীর তুলেছিল। এমন সুদীর্ঘ প্রাচীর তারা তৈরি করেছিল যে লোকে বলতো **লম্বাই**। আথেন্স থেকে পিরেউস্‌গামী পথ এই প্রাচীরটি রক্ষা করতো; শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে এরই আড়ালে থেকে আথেন্সবাসীগণ সমুদ্রের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারতো।

স্থাপত্যের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল আথেন্সের আক্রোপোলিসে। এখানে পারসীকদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির জায়গায় অপূর্ব সব মন্দির ও মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। এতে শুধু আথেনীয় রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে নয়, সমগ্র আথেনীয় নৌ-জোটের অর্থ-তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল।

নির্মাণকার্যের ফলে আথেনীয় কারিগর, পাথরকাটিয়ে, শকটচালক, মাঝি প্রভৃতি পেশার লোকজনদের পক্ষে সর্বদাই উপার্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

'সমুদ্রের রাণী' শক্তিশালী নৌবহর টিকিয়ে রেখেছিল। জাহাজে চাকরি করার জন্য আথেন্সের কোষাগার থেকে টাকা খরচ করে মাইনে দেয়া হতো; আথেন্সের বহু লোক দাঁড়ী ও মাঝিমাল্লার চাকরি নিয়ে এই মাইনের উপরই জীবনধারণ করতো।

একইভাবে অন্যান্য পদে আসীন ব্যক্তিদের, বিচারকদের পারিশ্রমিক দেয়া হতো। লটারির মাধ্যমে এই সব পদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসানো হতো। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যক্তিরাও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রায় সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার আদায় করেছিল। প্রচুর গরিব আথেনীয় সরকারি চাকরি করে সেই উপার্জনে কালাতিপাত করতো। একটি হাসির কবিতায় বলা হয়েছে:

> একটা কথা কি বলবে আমায়, বাবা,—
> বিচারের সভা নাই যদি বসে তবে,
> সকালে ও রাতে মোদেরে কেমন করে
> খাওয়াবে? পয়সা, বলি, কোত্থেকে হবে?

বিনামূল্যে কাঙালীভোজন করানোরও চল ছিল। আথেন্সবাসীদের কোনো খাজনা দিতে হতো না।

আথেন্সের দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সম্মানজনক তো ছিলই, উপরন্তু তার সুযোগসুবিধাও ছিল বহু।

পিরেউস বন্দরে মাল আমদানী

(খ্রী. পূ. ৫ম শতকের একটি বর্ণনা থেকে)

মানচিত্রে নিম্নবর্ণিত দেশ ও শহর খুঁজে বের করো।

কত জিনিসই না এখানে আসে। কিরেনা (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গো-চর্ম, কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চল থেকে আসে নোনতা মাছ, উত্তর গ্রীস থেকে — খাদ্যশস্য ও মাংস, সিসিলি পাঠায় তার শূকর ও পনির; মিশর থেকে আসে জাহাজের পাল আর পাপিরস, গন্ধদ্রব্য আসে সিরিয়া থেকে; ক্রিট দ্বীপ পাঠায় মন্দির ও দেবমূর্তি নির্মাণের জন্য মূল্যবান কাঠ, আর লিবিয়া (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গজদন্ত স্ফীতকায় মেষ আর স্বপ্নের মতো মিষ্টি অজস্র ফলমূল পাঠাতো বিভিন্ন দ্বীপ... এশিয়া মাইনর হতে আসে দাসদাসী আর বাদাম। ফিনিসিয়া পাঠায় গমের ময়দা, খেজুর; আর কার্থেজ (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গালিচা।

? ১. আথেনীয় নৌ-জোট কীভাবে গঠিত হয়েছিল? এই জোট গঠন করার পিছনে কারা, কী কারণে সবচেয়ে আগ্রহী ছিল? ২. খ্রী. পূ. ৫ম শতকে আথেনীয় রাষ্ট্রের ধনসম্পদ কী কী উৎস থেকে সঞ্চিত হয়েছিল? ৩. আথেন্স নগরের সমৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধির ফলে আথেনীয় জনগণ কী উপকার পেয়েছিল?

§ ৩৭. আথেনীয় দাসমালিকদের গণতন্ত্র

(দ্র. মানচিত্র ৪)

মনে করতে চেষ্টা করো — সোলোনের সংস্কার সাধনের ফলে দেমোস কী কী অধিকার পেয়েছিল (§ ৩০-৩১: ৮, ৯, ১০)।

১. আথেন্সে গণ-সম্মিলন। খ্রী. পূ. ৫ম শতকে আথেন্স রাষ্ট্রে সর্বাধিক ক্ষমতা গণ-সম্মেলনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মাসে ৪ বার এই সভা বসতো। এখানে আইনবিধি প্রণয়ন এবং যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হতো; আথেন্স ও নৌ-জোটের কোষাগারের দায়িত্বগ্রহণ, স্ত্রাতেগোস্ ও অন্যান্য উচ্চ পদে বিভিন্ন ব্যক্তি নির্বাচন এই গণ-সম্মেলনেই সম্পন্ন হতো।

আত্তিকার সমস্ত নগর ও গ্রাম থেকে আথেনীয়গণ এসে গণ-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারতো। সাধারণত কয়েক সহস্র লোক জমায়েত হতো, তাদের বেশির ভাগই শহরের বাসিন্দা। সভায় ভয়ানক তর্কবিতর্ক হতো। কোনো বাগ্মী হয়তো অভিজাতবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে বক্তৃতা দিচ্ছে, আর কেউ-বা — দেমোসের জন্য। সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হতো। (দ্র. রঙিন ছবি ১৪)

২. আথেন্স রাষ্ট্রের পরিচালনায় পেরিক্লেস। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে পেরিক্লেস নামে জনৈক রাষ্ট্রীয় কর্মী সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

ধনী ও সমৃদ্ধ পরিবারে পেরিক্লেসের জন্ম; তাঁর জমিজমায় বহুসংখ্যক দাস কাজ করতো। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আথেন্সে যেখানে অজস্র ভালো বাগ্মী ছিলেন, সেরকম স্থানে পেরিক্লেস তাঁর অপূর্ব ভাষণে সকলকে জয় করে নিতেন। স্বভাবে তিনি শান্ত ও সংযমী ছিলেন, কিন্তু যখন কোনো ক্রুদ্ধ বক্তৃতা দিতেন, গ্রীকরা বলতো যে, তখন তিনি শত্রুর উপর বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতকারী জিউসের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়ে যেতেন।

খ্রী. পূ. ৪৪৩ অব্দে অনুষ্ঠিত গণ-সম্মেলন পেরিক্লেসকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চপদ **প্রথম স্ত্রাতেগোসের** আসনে নির্বাচিত করলো এবং তার ফলে আথেন্স ও নৌ-জোট পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল।

আথেন্সের অধীনে সমস্ত গ্রীসকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন পেরিক্লেস। তিনি সর্বোপায়ে নৌ-জোটকে শক্তিশালী করেছিলেন এবং আরো নতুন সদস্যকে নিজেদের জোটে টেনে এনেছিলেন। কিছু কিছু নগর-রাষ্ট্র ঐ জোটে আথেন্সের অধিনায়কত্বে বিরূপ হয়ে জোট ত্যাগ করার মনস্থ করে। তাদের সেধরনের চেষ্টা পেরিক্লেস নিষ্ঠুরভাবে সশস্ত্র উপায়ে দমন করেন। জোটভুক্ত সদস্য নগর-রাষ্ট্রসমূহে তিনি ভূমিহীন আথেনীয়দের পুনর্বাসন করিয়ে সেখানে উপনিবেশ্ গড়ে তোলেন।

গণ-সম্মেলনে পেরিক্লেস আথেন্সে বিভিন্ন সার্বজনীন ভবন ও দুর্গপ্রাচীর নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন।

দেমোস পেরিক্লেসকে সমর্থন জানায়। ১৫ বৎসর ধরে, পেরিক্লেস যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গণ-সম্মেলন তাঁকে প্রতি বৎসর প্রথম স্ত্রাতেগোস্ পদে নির্বাচন করে এসেছে।

৩. আথেনীয় গণতন্ত্র ও তার দাসতন্ত্রী চরিত্র। আথেন্সে রাষ্ট্রপরিচালনাপদ্ধতিকে গ্রীকরা বলতো **দেমোক্রাতিয়া***, অর্থাৎ 'দেমোসের শাসন'। নিজেদের শাসনক্ষমতাকে দেমোস দাসমালিকভিত্তিক সমাজকে আরো শক্তিশালী করা এবং নৌ-জোটভুক্ত সদস্যদের আথেন্সের অধীনস্থ রাখার কাজে ব্যবহার করেছিল। এতে যে শুধু দাসমালিকরাই আগ্রহী ছিল, তা নয়; ভূমিহীন ব্যক্তিরা যারা খনি ইত্যাদিতে দাসশ্রমের ফলে এবং জোটের সদস্যদের দেওয়া চাঁদায় উপকৃত হচ্ছিল, তাদেরও স্বার্থ ছিল এতে।

দাসদের উপর দাসমালিকদের কর্তৃত্ব ও শাসন আথেনীয় গণতন্ত্র সংরক্ষণ করেছিল; ঐ গণতন্ত্র ছিল দাসমালিকদের স্বার্থে।

আথেন্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গ্রীসের আরো অনেক নগর-রাষ্ট্র গণতন্ত্র প্রবর্তন করে। সর্বত্রই তা দাসদের উপরে স্বাধীন ব্যক্তিদের শাসন ছিল।

* এই শব্দ থেকে ইংরেজি democracy শব্দের উদ্ভব, আমরা যার বাংলা করেছি 'গণতন্ত্র'। — অনু.

২
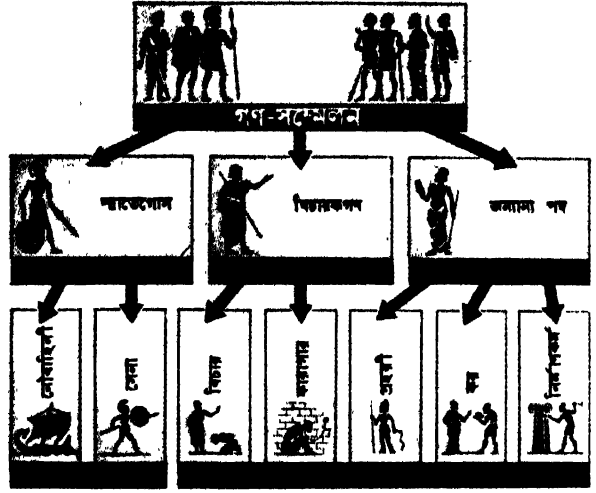
১. খ্রী. প্. ৫ম শতকে এথেন্সে দাসমালিকদের গণতন্ত্র। ২. পেরিক্লেস। (প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মূর্তি।) শিরস্ত্রাণ পিছনে সরানো। যুদ্ধের সময়ে গ্রীকরা শিরস্ত্রাণ দিয়ে মুখ পর্যন্ত ঢেকে দিত।

তবু খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গণতন্ত্রের বহুল প্রসারলাভ সত্ত্বেও আত্তিকায় সংখ্যালঘিষ্ঠ একটা অংশই শুধু সেই শাসন কাজে লাগাতে পেরেছিল। আথেন্সে যে পুরুষ ব্যক্তিদের বাবা-মা উভয়েই জন্মসূত্রে আথেন্সের বাসিন্দা, শুধুমাত্র সেই সব পুরুষই নাগরিকত্বের সব অধিকার লাভ করতে পারতো।

অন্যত্র থেকে এসে আত্তিকায় বসবাসকারী লোকজন ও তাদের বংশধর আথেন্সের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আত্তিকায় বসবাসের অনুমতি লাভের জন্য তাদের নির্দিষ্ট কর দিতে হতো। যদি কেউ মিথ্যে করে আথেনীয় নাগরিক বলে নিজের পরিচয় দান করতো, তা হলে তাকে দাসে পরিণত হতে হতো।

আথেনীয় নারী গণ-সম্মেলনে যোগদান তো দূরের কথা, বাড়ির বাইরে কখনো পা দিত না। নারীর একমাত্র কর্তব্য বলে ধরা হতো 'নিজের ঘরকন্না সামলানো আর স্বামীর সেবা করা।'

দাসদের অবস্থার সাথে গৃহপালিত পশুদের জীবনের কোনো পার্থক্য ছিল না।

৪. আথেন্সে সামাজিক জীবন। যদিও আথেন্সের নাগরিকত্ব দানের নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়াভাবে মেনে চলা হতো, তবু **প্রাচীন কালে আথেন্সের মতো পৃথিবীর**

আথেনীয় 'আগোরা'। (চিত্রটি আধুনিক শিল্পীর আঁকা।) মাঝখানে: বিদেশাগত লোকের সাথে আলাপরত একদল আথেন্সবাসী। বামদিকে: মাটির উপরে জিনিসপত্র রেখে কুম্ভকার তার হাঁড়িপাতিল বিক্রি করছে। ডাইনে: জনৈক ধনী আথেনীয়কে আসতে দেখা যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করছে কয়েকজন দাস; চাষী গাধার পিঠে চাপিয়ে মাল আনছে বিক্রয়ের জন্য। দূরে পিছনে সুবিশাল আক্রোপোলিস দৃশ্যমান।

আর কোথাও এত বেশি লোক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে নি। দাসের কাঁধে কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে আথেনীয় পুরুষ নিজের ফাঁকা সময়ের বেশির ভাগই কাটাতো শহরের সার্বজনীন সামাজিক নানান কাজে।

আথেন্সে সর্বাধিক জনাকীর্ণ ও কোলাহলমুখর স্থান ছিল আগোরা। সকাল থেকেই সেখানে দোকানপসারি বসে যেত। সন্ধ্যের সময় সেগুলো আবার তুলে নেয়া হতো। আগোরার এক প্রান্তে আথেনীয় রাষ্ট্রের আইনবিধি খোদিত বৃহৎ একটি প্রস্তরফলক রাখা থাকতো, সেখানে আগামী গণ-সম্মেলনের সংবাদ, বিচার সংক্রান্ত ঘোষণাদি টাঙিয়ে দেয়া হতো। সেখানে ধনী লোকজন আসতো, দিনের কাজ শেষ করে আসতো কারিগরের দল এবং বাজারে নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রি করার পর চাষীরাও আসতো। আগোরাতে আথেনীয়রা কোথায় কী ঘটছে তার খবরাখবর জানতে পারতো। প্রাচীন কালে গ্রীসে আগোরার গুরুত্ব ততখানিই ছিল, আজ আমাদের কাছে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের গুরুত্ব যতখানি।

তরুণ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা গিম্‌নাসিওন্‌ অর্থাৎ যে স্থানে বিখ্যাত পণ্ডিতজন তাঁদের ভাষণ দান করতেন, অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন, সেখানে

সমবেত হতো। এখানেও অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রীকরা শরীরচর্চা করতো।

কন্সার্ট বা সংগীতানুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট বিশাল ভবনে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। সংগীত রসিক প্রচুর লোকজন এখানে এসে জড়ো হতো, তারাই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নির্ধারণ করতো।

হাজার হাজার দর্শককে আনন্দদানের জন্য বৎসরে অন্তত বেশ কয়েক বার নাটক মঞ্চস্থ করা হতো।

স্বাধীন নাগরিকদের বুদ্ধিবৃত্তি ও দেহসৌষ্ঠব বিকশিত করার ক্ষেত্রে আথেনীয় সামাজিক জীবন এক বিশাল দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল।

? ১. আথেনীয় দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত লোকজন কেন আগ্রহী ছিল: (ক) বড়ো বড়ো ভূস্বামী, (খ) কারিগর শ্রেণী, (গ) সওদাগর, (ঘ) চাষী এবং (ঙ) ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যক্তি? ২. সোলোনের সংস্কার ও পেরিক্লেসের শাসনের মধ্যে কত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল? এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক কী? ৩. প্রাচীন মিশরীয় রাষ্ট্রের সাথে আথেনীয় রাষ্ট্রের তুলনা করো। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। প্রতিতুলনার জন্য ৬৪ ও ২১১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নক্সা ব্যবহার করো। ৪. প্রাচ্য দেশসমূহে সম্রাটদের শাসন, আর অন্যত্র অভিজাতবর্গ বা 'দেমোক্রাতিয়ার' শাসন — এর মধ্যে কোন্‌টি সংস্কৃতিবিকাশে সর্বাপেক্ষা সহায়ক হয়েছিল? যুক্তি সহকারে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো। ৫. খ্রী. পূ. ১১শ থেকে খ্রী. পূ. ৩য় শতক পর্যন্ত গ্রীক ইতিহাসের মৌলিক যুগবিভাগ সংক্রান্ত সারণীটি (দ্র. ২৫৪ পৃষ্ঠা) আরো বিশদভাবে পরিবর্ধন করো।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকে গ্রীক সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ

§ ৩৮. লিপি ও শিক্ষায়তন। অলিম্পিক খেলা

(দ্র. মানচিত্র ৪)

১. প্রাচীন গ্রীসে লিপিমালা। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কালে গ্রীসে যে লিপি চালু ছিল খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষ দিকে তার প্রচলন উঠে যায়। বিস্মৃত সেই লিপিমালা গ্রীস আর কখনো গ্রহণ করে নি। হোমারীয় যুগের শেষ ভাগে ফিনিসীয়দের লিপির সাথে গ্রীক পরিচিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত করে গ্রীকরা মোট ২৪টি অক্ষরের বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। **লিপিমালার বিকাশ সাধনে এ ছিল এক অভিনব বৃহৎ পদক্ষেপ।**

গ্রীকরা পাপিরসের উপরে লিখতো, লিখতো মাটির তৈরি স্লেটে আর কাঠের পাতলা মোম দিয়ে মুড়িয়ে তার উপরেও। যে কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি ছড়ির এক প্রান্ত ধারালো করে নিয়ে সেই প্রান্তদেশ দিয়ে মোমের উপরে লিখতো তারা। ছড়ির অন্য প্রান্ত হতো থ্যাবড়া; এই দিকটা দিয়ে তারা লেখা মুছে ফেলতে পারতো। এই ধাতুনির্মিত ছড়িটির নাম **স্তিলুস্।** স্পষ্ট ও নির্ভুল লেখার ব্যাপারে গ্রীকরা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিল। তারা বলতো: 'ঘন ঘন স্তিলুস্ ওল্টাও', তার মানে — ছড়ির ধারালো প্রান্ত দিয়ে লেখো, তার পরেই ছড়ির অন্য দিক থ্যাবড়া প্রান্ত দিয়ে তা মুছে ফেলো, এভাবে বারংবার লিখে লিখে হস্তাক্ষর সুন্দর করো।

পাপিরসের উপরে লিখিত গ্রীক পুঁথিপত্র দেখতে হতো লম্বা ফিতের মতো; গোল করে মুড়িয়ে তা রেখে দেয়া হতো, তখন নলের মতো দেখাতো। প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীগণ বই পড়া খুব পছন্দ করতো, বই পুনর্লিখিত হতো বহু বার, আর সে সবের সযত্ন সংরক্ষণেও তারা ছিল অত্যন্ত যত্নবান।

২. গ্রীক বিদ্যায়তন। স্বাধীন গ্রীসবাসীর ছেলেপিলেরা সাত বৎসর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করতো। কারিগর ও কৃষকের সন্তান শুধু প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করতো, কেন না একটু বড়ো হলেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে হতো তাদের। ধনী ব্যক্তিদের ছেলেরা গিম্‌নাসিওনে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করতো।

গ্রীক বিদ্যায়তনগুলোয় স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কথা বলা শেখানো হতো। ছাত্ররা হোমার, হেসিওদ্‌ ও অন্যান্য কবির কবিতা পাঠ করতো। গ্রীসবাসী বিশেষত হোমারের কবিতা অত্যন্ত ভালবাসতো; 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' মহাকাব্যদ্বয় যদিও কয়েক হাজার পংক্তির দীর্ঘায়তন কাব্য, তবুও অনেকেরই তা কণ্ঠস্থ থাকতো। ছবি আঁকা, নাচ, গান এবং **লিরা বাদ্যযন্ত্র** বাজানো শেখানো হতো তরুণদের। নাচতে না জানলে, গাইতে না পারলে সে লোককে গ্রীকরা অশিক্ষিত জ্ঞান করতো। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহ স্থাপিত ছিল আথেন্সে।

সন্তান যাতে সাহসী, শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতি হবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে গ্রীকরা অত্যন্ত নজর দিত। বিদ্যায়তনে যোদ্ধা তৈরি করা হতো—যারা রাষ্ট্রকে বাঁচাবে। ছাত্রের বয়স যত বাড়তো, তত বেশি করে তারা দেহচর্চা করতো—দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকতি ও বর্শা নিক্ষেপ।

ছাত্র অলস ও অবাধ্য হলে তাকে চামড়ার বেল্ট, ছড়ি ও বেত দিয়ে প্রহার করা হতো। ধনী লোকের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিত বৃদ্ধ দাস, সে লক্ষ্য রাখতো যাতে তার প্রভুপুত্র ঠিকমতো ভদ্র ব্যবহার করে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মান দেখিয়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

দাসদের ছেলেদের পক্ষে বিদ্যায়তনের দ্বার বন্ধ ছিল। গ্রীসে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যও কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। মায়েরা মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ, হাতের কাজ ইত্যাদি শেখাতো।

৩. অলিম্পিয়া। গ্রীসে উৎসব দিবসে নানান ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। তন্মধ্যে **সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা: অলিম্পিয়া** শহরে প্রতি ৪ বছরে একবার করে এই উৎসব আয়োজিত হতো। পেলোপোন্নেসসে অবস্থিত ছিল এই নগরী। (তোমরা উত্তর গ্রীসের অলিম্পীয় পর্বতের সাথে একে আবার গুলিয়ে ফেলো না।)

গ্রীকদের নিকট অলিম্পিয়া ছিল তীর্থস্থান। তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল অপূর্ব এক ধর্মমন্দির—**অলিম্পীয় জিউস মন্দির;** মন্দিরটির নামে নগরের নামকরণ করা হয়েছিল। মহান গ্রীক ভাস্কর ফিদিয়াস নির্মিত জিউসের বিশাল দেবমূর্তি ছিল এই মন্দিরে। (১৭২ পৃষ্ঠায় পুনর্নির্মিত মন্দিরের ছবি দেখ।) জিউস মন্দিরকে ঘিরে তার চারপাশে আরো অন্যান্য মন্দির এবং দেব-দেবী, বীর ও
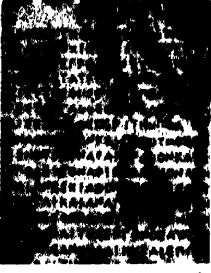
১

২

৩

১. প্রাচীন গ্রীক লিপি। ২. মোম দিয়ে পালিশ করা তক্তা ও স্তিলুস। ৩. আথেনীয় চতুষ্পাঠী। (ফুলদানির উপর অঙ্কিত চিত্র।) বইপত্রের পাঠাভ্যাস ও 'লিরা' বাদ্যযন্ত্রে সংগীতানুশীলন চলছে। ছাত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে যে দাস তাকে ডানদিকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ৪. অলিম্পিয়া। (পুনঃকল্পিত রূপ।) মধ্যভাগে — প্রধান জিউস মন্দির। তার পাশে — অন্যান্য মন্দির এবং ক্রীড়াবিজয়ীদের মূর্তি। ছোটো ছোটো ভবনের সারি — বিভিন্ন শহরের কোষাগার, অলিম্পিয়াকে প্রদত্ত উপহার। মাঝখানে ফাঁকা মাঠের চারদিকের গিম্‌নাসিওন, অন্যান্য ভবন ও প্রতিযোগিতার জায়গা।

৪
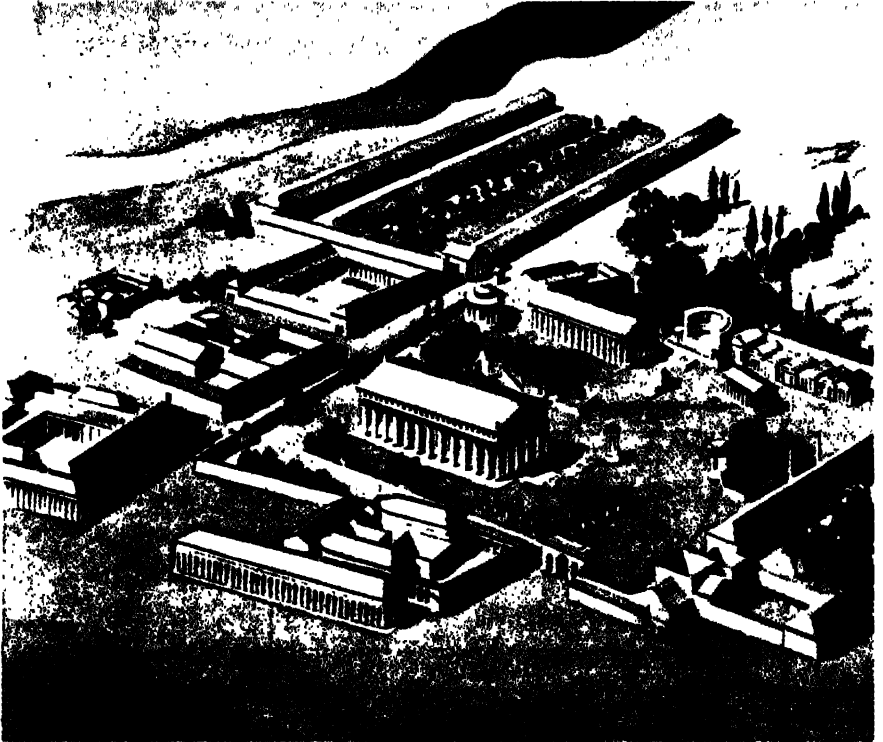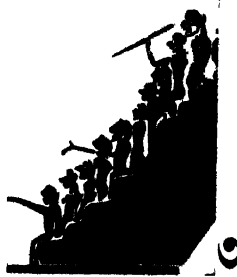
১. 'দিস্কোবোলোস্'। (ভাস্কর মিরোন্।) **এই মূর্তিটি সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হচ্ছে?**
২. অশ্ববাহী রথচালনা প্রতিযোগিতা। (ফুলদানির গায়ে অঙ্কিত চিত্র।) ৩. প্রতিযোগিতার সময়ে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী। (ফুলদানির গায়ে অঙ্কিত চিত্র।)

ক্রীড়াবিজয়ীদের প্রস্তরমূর্তি ছিল। মন্দিরসমূহের পিছন দিকে ক্রীড়াদি অনুশীলনের জন্য অনেক ভবন ছিল।

খেলা দেখার জন্য সারা গ্রীস থেকে হাজার হাজার দর্শক এসে জড়ো হতো। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, গাড়িতে করে, নৌকা চেপে দলে দলে লোক আসতো। এমন কি বহুদূরের উপনিবেশগুলো থেকেও গ্রীকরা এসে হাজির হতো। অলিম্পিয়া নগরকে ঘিরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো আরেকটা শহর—তাঁবু খাটানো ছাউনির শহর। অলিম্পিয়ায় মেয়েদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; আইনভঙ্গকারিনীর একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

৪. অলিম্পিক খেলা। অলিম্পীয় ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলীরা দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোঁড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতো। কিশোর বয়সী প্রতিযোগীদের জন্য নির্ধারিত ছিল একটি দিন।

প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক খেলা ছিল চার ঘোড়ায় টানা **শকটচালনা প্রতিযোগিতা।** হাজার হাজার দর্শকের হর্ষধ্বনির মধ্যে **ঘোড়দৌড়ের মাঠ** মোট ১২ বার প্রদক্ষিণ করতে হতো। শকটের উপরে দণ্ডায়মান **ঘোড়সওয়ার** তা চালিয়ে

নিয়ে যেত। এর জন্য প্রচণ্ড সাহস ও অভূতপূর্ব কলাকৌশলের প্রয়োজন হতো। দুর্ধর্ষ এই প্রতিযোগিতায় প্রায়শঃই হয় ঘোড়দৌড়-মাঠের থাম, নয় তো অন্য প্রতিযোগীর গাড়ির চাকায় ধাক্কা লাগতো; ভেঙে পড়ে যাওয়া শকটের উপর দিয়ে অন্যেরা তাদের গাড়ি হাঁকিয়ে বাতাসের বেগে বেরিয়ে যেত। এরকম এককে পাল্লা দৌড়ে ১০টা গাড়ির মধ্যে ৮টা অন্তত ভেঙে যেত। (দ্র. ২১৭ পৃষ্ঠায় ২ নং ছবি এবং রঙিন ছবি ১৬।)

গ্রীসে স্বাধীন নাগরিকদের প্রত্যেকেরই অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। কিন্তু তার জন্য দরকার হতো বেশ কয়েক বৎসরের নিরন্তর সাধনা; অথচ কৃষক ও কারিগরদের অত সময় কোথায় যে ক্রীড়া অনুশীলনে ব্যয় করবে! সেজন্য বস্তুত অবস্থাপন্ন লোকজনেরাই শুধু এতে অংশ নিতে পারতো। দৌড়ে সক্ষম চারটি ঘোড়া কেনা গ্রীসে একমাত্র ধনী দাসমালিকদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। একবার অত্যন্ত ধনী এক আথেনীয় প্রতিযোগিতায় ৭ দল (প্রত্যেক দলে ৪টি করে ঘোড়া) ঘোড়া পাঠায়; প্রতিযোগিতায় তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতো যে নিজের জীবন বিপন্ন করে ঘোড়া ছুটিয়েছে সেই ঘোড়সওয়ার নয়, ঘোড়াগুলোর মালিককে গণ্য করা হতো বিজয়ী বলে।

বিচারকমণ্ডলী সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে কণ্ঠে মালা পরিয়ে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করতেন; এই মালা তৈরি করা হতো জলপাই গাছের ডালপাতা দিয়ে। বিজয়ী যখন নিজের শহরে ফিরে যেত, তখন তার সমস্ত অধিবাসী তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে নগরের বাইরে এসে দাঁড়াতো; ক্রীড়ায় জয়লাভের মধ্য দিয়ে সে যে তার শহরকে বিখ্যাত করে দিয়েছে, এ ছিল তারই স্বীকৃতি। বিজয়ীর সম্মানে তার প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হতো।

যে মাসে অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হতো, তাকে পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য করা হতো। এ সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল গ্রীসে। গ্রীকরা বৎসরগণনা শুরু করেছিল প্রথম অলিম্পিক খেলা থেকে; কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রী. পূ. ৭৭৬ অব্দে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১. প্রাচীন লিপিমালা থেকে কীভাবে নতুন লিপি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, বলো। গ্রীক লিপির তাৎপর্য কী? ২. আথেনীয় এবং স্পার্টান — এই দু'ধরনের শিক্ষায়তনের মধ্যে কোন্‌টি তোমার বেশি পছন্দ? এদের কোন্‌টার কী তোমার পছন্দ ও অপছন্দ হয়, বলো। ৩. প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলায় কী তোমার ভালো লাগে এবং কী ভালো লাগে না, বলো। *৪. অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণকারী কোনো খেলোয়াড় বা একজন দর্শক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি বিবরণ দাও।

§ ৩৯. প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চ

মনে করতে চেষ্টা করো — দিওনিসিওস দেবতার সম্মানে গ্রীসবাসী কোন্ সময়ে উৎসব পালন করতো (§ ২৯:২)।

১. রঙ্গমঞ্চের জন্ম। দিওনিসিওসের উৎসবের সময়ে গ্রাম ও নগরের রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করে কৃষকেরা উৎসব উদ্‌যাপন করতো। গান গেয়ে গেয়ে তারা দিওনিসিওস সম্পর্কীয় পুরাণ বর্ণনা করতো, পুরাণ-কাহিনীর সমস্ত চরিত্রগুলো তারা অভিনয় করে দেখাতো। দিওনিসিওসের নিত্যসঙ্গী পার্শ্বচর সাতিরোস্‌দের অনুকরণে উৎসবমুখর শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারীগণ ছাগচর্ম পরিধান করতো। প্রায়ই তারা শহর বা গ্রামের খ্যাতনামা লোকজনদের হাস্যকর নকল সেজে, হাসিঠাট্টা — রঙ্গতামাসা করে দর্শকদের আনন্দ জোগাতো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের চারদিক ঘিরে ভিড় করে থাকতো দর্শকের দল। যাতে বেশিসংখ্যক মানুষ এই অভিনয় দেখতে পারে তার জন্য পরে পর্বতের পাদদেশে তা আয়োজন করা হতো।

আথেন্সে তা অভিনীত হতো আক্রোপোলিসের পাদদেশে। দর্শকবৃন্দ পাহাড়ের ঢালু জায়গায় বসতো; নিচে তাঁবু খাটানো হতো, গ্রীক ভাষায় তাকে বলা হতো **স্কেনে**। তার ভিতরে অভিনেতারা পোষাক পরিবর্তন করতো এবং তার কাছাকাছি স্থানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে যেত। পরে অবশ্য তাঁবুর জায়গায় ছোটোখাটো বাড়ি তৈরি করা হয়, অভিনয়ের সময়ে বাড়িটিকে সাজানো হতো। নাম অবশ্য 'স্কেনে'ই থেকে যায়। তার সামনে থাকতো খোলা জমি — **ওর্খেস্ত্রা**, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকতো কোরাস দল। পাহাড়ের ঢালুতে দর্শকদের বসার জন্য বেঞ্চি তৈরি করা হয়েছিল প্রথমে কাঠ দিয়ে, পরে অবশ্য পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়।

এভাবেই খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ দিক থেকে খ্রী. পূ. ৫ম শতকের প্রথম দিকের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে প্রথম **রঙ্গমঞ্চ** তৈরি হয়েছিল গ্রীসদেশে। থেয়াত্রোন্* — রঙ্গমঞ্চ বোঝাতে প্রযোজ্য এই গ্রীক শব্দটির অর্থ ছিল 'দর্শকদের জন্য স্থান'। গ্রীসে এবং গ্রীক উপনিবেশগুলোর প্রায় সমস্ত শহরেই থেয়াত্রোন্ তৈরি করা হয়েছিল।

২. গ্রীক মঞ্চে অভিনেতা ও কোরাস দল। উৎসবের সময়ে মঞ্চে অভিনয় করা হতো এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক দিন একনাগাড়ে সে অভিনয় চলতো। প্রত্যেক দিন কয়েকটি করে নাটক মঞ্চস্থ করা হতো।

* এই শব্দ থেকেই ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় থিয়েটার শব্দটি এসেছে। — অনু.

থিয়েটারে অভিনয় করতো শুধু পুরুষেরা, নারী চরিত্রের ভূমিকাতেও তারাই অভিনয় করতো। অভিনেতারা মুখে চরিত্রোপযোগী মুখোশ পরে নিত: ছেলে বা মেয়ের মুখোশ, কিংবা ক্রোধ বা প্রার্থনার ভাবপ্রকাশক, অথবা আনন্দ বা হতাশা বোঝাবার জন্য সেইভাবে আঁকা কোনো মুখোশ। নাটক চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী তারা মুখোশ বদলে ফেলতো। ঝকঝকে রঙে রঞ্জিত মুখোশ এমন কি বিশাল মঞ্চের পিছন সারির লোকেরাও ভালোভাবে দেখতে পেত। একটু উঁচু হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিনেতারা পায়ের তলায় ছোটো কাঠ লাগাতো।

মঞ্চাভিনয়ে কোরাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নাটক যেমন হতো সেই অনুযায়ী কোরাসের অভিনেতারা কখনো তরুণী, কখনো পারসীক অমাত্য, আবার কখনো-বা এমন কি ব্যাঙ বা পাখির সাজে সজ্জিত হতো।

১. গ্রীক থিয়েটার (আলোকচিত্র।) ডাইনে: ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কেনে। পাহাড়ের গা বেয়ে অর্ধবৃত্তাকারে উঠে গেছে দর্শকদের বসবার সারি সারি আসন। মধ্যস্থলে—ওর্খেস্ত্রা। (সেকালে গ্রীক থিয়েটার দেখতে কেমন ছিল তা ১৫ নং রঙিন ছবিতে দেখানো হয়েছে।) ২. ট্র্যাজেডি অভিনেতাদের মুখোশ। ৩. কমেডি অভিনেতাদের মুখোশ। ৪. ট্র্যাজেডি অভিনেতা। (গ্রীক মূর্তি।) **ট্র্যাজেডি অভিনেতা একটু উঁচু হওয়ার জন্য কী করেছিল?** ৫. কমেডি অভিনেতা। (গ্রীক মূর্তি।)

৩. **ট্র্যাজেডি**। পুরাণভিত্তিক একধরনের নাটককে বলা হলো **ত্রাগোদিয়া**। শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'ছাগলের গান'। প্রাচীন কালে যখন অভিনেতারা ছাগচর্ম পরিধান করে অভিনয় করতো, সেই তখন থেকে এই শব্দটি চালু হয়ে গিয়েছিল। ট্র্যাজেডির চরিত্রাবলী হতো সাধারণত দেবতা কিংবা পুরাণকথিত বীর। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাত, তাদের কীর্তি, দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং বিনাশ দেখানো হতো ট্র্যাজেডিতে।

ট্র্যাজেডির প্রথম বিখ্যাত লেখক ছিলেন আথেনীয় নাট্যকার **এস্খিলোস**। (তাঁর কোন্ রচনার সাথে তোমরা ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছে, মনে করে দেখ।) তাঁর রচিত ট্র্যাজেডির মধ্যে অন্যতম একটি হলো **'বন্দী প্রমিথিউস'**।

নাটকে প্রমিথিউস কোরাস দলকে বলছেন যে, জিউসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি উলুখাগড়ার শিকড়ে করে আগুন নিয়ে এসে মানুষকে দিয়েছেন, বাড়ি তৈরি,

পশুপালন করা শিখিয়েছেন, 'অক্ষর পরিচয় ও গণনা' করতে শিখিয়েছেন, জাহাজ আবিষ্কার করেছেন। এ সবের জন্য জিউস ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বেঁধে এক পর্বতশৃঙ্গে ফেলে রাখতে আদেশ দেন।

প্রমিথিউস জানতেন যে, জিউসের ক্ষমতা ভবিষ্যতে কে খর্ব করবে। ঐ গুপ্ত তথ্য প্রমিথিউস প্রকাশ না করা পর্যন্ত জিউসের আদেশে হের্মিস তাঁর উপর ভয়াবহ অত্যাচার করতে হুমকি দেন। কোরাস জিউসকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রমিথিউসের জন্য সমবেদনা জানায়, কিন্তু নতি স্বীকার করতে অনুরোধ করে। প্রমিথিউস 'জিউসের মোসাহেবকে' দৃপ্ত স্বরে জবাব দেন:

হেন শাস্তি নাই ভবে, হেন শাঠ্যকলা
যদ্দ্বারা জিউস মোরে কহাবে গোপন।
আমারে হানুক বাণ তড়িৎ আঘাত,
প্রলয়গর্জন যথা পাতালপুরীর,
শ্বেতপক্ষ ঝঞ্ঝা যদি ছেঁড়েও নিলীমা,
আমূল উপাড়ি সব করে ভূপাতিত,
তবুও আমারে সে যে ভাঙিতে অক্ষম,
কহিব না—হীনবল কে তারে করিবে।

ট্র্যাজেডির শেষে দেখা যায়, প্রচণ্ড অশনিগর্জন ও বিদ্যুৎপাতের মধ্যে গিরিশৃঙ্গ শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসকে নিয়ে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়।

মহান গ্রীক নাট্যকার **সোফোক্লেয়েস*** রচিত **'আন্তিগোনে'** অন্যান্য ট্র্যাজেডির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; নাটকটি আথেনীয় থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল।

৪. কমেডি। উৎসবের রঙ্গরস-হাসিতামাসা ও হাস্যপরিহাস মুখর অভিনয় থেকে সৃষ্টি হয়েছিল **কোমোদিয়া**—আনন্দোজ্জ্বল, পরিহাসদীপ্ত নাটক। কোমোদিয়া শব্দের অর্থ 'আনন্দিত অধিবাসীদের গান'।

কমেডি দর্শকদের যে শুধু আনন্দ পরিবেশন করতো, তা নয়। প্রায়শঃই তার মধ্যে সমকালীন সমস্যাদির রূপায়ণ দেখা যেত, যেমন—যুদ্ধ আরো চালানো হবে কিনা, কিংবা সন্ধিস্থাপন দরকার কিনা ইত্যাদি। গণ-সম্মেলনের অন্তর্নিহিত

* আথেনীয় নাট্যকার **সোফোক্লেয়েস** (৪৯৭-৪০৬ খ্রী. পূর্বাব্দ) ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এস্খিলোসকে হারিয়ে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। শতাধিক নাটকের জন্মদাতা হলেও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাঁর মাত্র সাতটি নাটক, তন্মধ্যে 'রাজা অয়দিপাউস', 'আন্তিগোনে' ও 'এলেক্ত্রা' সমধিক খ্যাত। বাংলায় তাঁর নাম ইংরেজির (Sophocles) অনুকরণে লোকে সাধারণত সফোক্লেস বা সোফোক্লেস লিখে থাকে। — অনু.

সংঘর্ষ থিয়েটারেও চলতে থাকতো—কমেডি রচয়িতাগণ নিজেদের প্রতিপক্ষকে হস্যাকরভাবে নাটকে উপস্থিত করতেন। দর্শকেরা নাটকের চরিত্রের মধ্যে নিজেদের সমকালীন লোকজনদের সহজেই সনাক্ত করতে পারতো। পরিহাসের ভিতরেই ক্ষুরধার বুদ্ধি ও ব্যঙ্গের সম্মিলন ঘটানোর জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আথেনীয় কমেডি রচয়িতা **আরিস্তোফানেস***।

কমেডি নাটকের চরিত্র কখন কখন দেবতা হতো। কপট ও লোলুপ ভাবে অঙ্কিত চরিত্রাদি সাধারণ মনুষ্যচরিত্রের বিভিন্ন ত্রুটি উদ্ঘাটন করে দেখাতো।

৫. রঙ্গমঞ্চের গ্রীক দর্শক। গ্রীসের অধিবাসীরা রঙ্গমঞ্চের খুব ভক্ত ছিল। অভিনয়ের দিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সঙ্গে জলখাবার নিয়ে দর্শকবৃন্দ থিয়েটারে চলে আসতো। আথেন্সে কোনো নাটক মঞ্চস্থ হলে অন্যান্য শহর থেকেও প্রচুর নাট্যামোদী এসে ভিড় জমাতো। আথেনীয় রঙ্গমঞ্চে ১৭ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলানের মতো জায়গা ছিল। অনুষ্ঠানের পর দর্শকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচন করতো। চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা দিয়ে তৈরি পত্রমাল্য ও মূল্যবান উপহারে বিজয়ীদের ভূষিত করা হতো। হাজার হাজার খুঁতখুঁতে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা বড়ো সহজ ছিল না। অন্যপক্ষে, গ্রীসে নাট্যকারদের অকল্পনীয়রূপে সম্মান করা হতো, রঙ্গমঞ্চকে লোকে বলতো 'বয়স্কদের বিদ্যাপীঠ'। থিয়েটার দেখতে যাবার জন্য গরিব লোকজনকে আথেন্সে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অর্থ দেয়া হতো।

সোফোক্লেয়েসের ট্র্যাজেডি 'আন্তিগোনে'

এই নাটক দেখে দর্শকদের মনে কোন চিন্তা ও ভাবের উদয় হতো?

দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুই ভাই পরস্পরকে নিহত করে। তাদের একজন নিজের মাতৃভূমিতে শত্রুদের নিয়ে আসায় দেশের রাজা হুকুম জারি করেন যে, তার মৃতদেহকে সমাধিস্থ না করে হিংস্র পক্ষীর শিকার হিসেবে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখতে হবে, অন্যথায় আইন অমান্যকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগ্নী আন্তিগোনে যখন হেল্লেনদের পবিত্র আচার অনুযায়ী ভ্রাতাকে সমাধিস্থ করতে যাচ্ছিলেন তখন প্রহরী আন্তিগোনেকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসে। ক্রুদ্ধ রাজা মেয়েটিকে জীবন্ত কবর দেবার আদেশ দেন। রাজার ছেলে, যার সাথে আন্তিগোনের বিবাহের কথা, পিতাকে এই শাস্তিদান যে অন্যায় তা বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাজার মনে কোনো করুণার উদ্রেক হয় না।

* **আরিস্তোফানেসের** (Aristophanes) জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৬ সালে এবং মৃত্যু ৩৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (আনুমানিক)। কবি ও প্রহসন রচয়িতা ছিলেন তিনি। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত গ্রন্থ 'বিহঙ্গ' এবং 'অম্বুবাহ'।

এক অন্ধ জ্ঞানী পুরুষ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পবিত্র আচার ভঙ্গ করা ও নিষ্ঠুরতার জন্য রাজাকে শাস্তি পেতে হবে: 'শীঘ্রই তোমার ভবন নারী ও পুরুষের আর্তনাদে পূর্ণ হবে, নগরসমূহের ক্রোধ বর্ষিত হবে তোমার উপরে।' রাজা ভয় পেয়ে আন্তিগোনেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখনি দূত এসে সংবাদ দেয় যে, আন্তিগোনে মারা গেছেন এবং তাঁর ভাবী স্বামী তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করেছে। আরেক জন দূত এসে বলে যে, রাণীও পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

কোরাসের একটি গান আথেনীয়দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল:

এ ভবে রয়েছে মহান শক্তি বহু; তবু নর, মানি, বলিশ্রেষ্ঠ ভবে।
ঝঞ্ঝার গর্জন, সাগরতরঙ্গ কভু অবহেলি ছোটো উন্দাম অবাধ...
মানুষের মুখে তাবার মহিমা আর বায়ুগতিসম মুক্ত চিন্তাভার।
অথবা আইন — তাহারই সৃজন বটে... হেমন্তকালে ঝড়ে বাদলেতে,
ঘাতক তুষার হইতে বাঁচায়ে নিজে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই খুঁজে নেয়।
মহামারী ব্যাধি পরাজয় মানে তার; বহুগতি মন দুরতিবিষ্য দেখে,
কিন্তু তথাপি — অজেয় রাজার প্রাণও শাশ্বত বিনা করুণ ধ্বংসে মজে।

আরিস্তোফানেসের কমেডি 'বিহঙ্গ'

এক চতুর আথেনীয়র প্রস্তাব অনুযায়ী পাখিরা মাটি ও আকাশের মাঝখানে একটি শহর নির্মাণ করতে থাকে। পূর্বে দেবতারা মনুষ্য-উৎসর্গিত বলিধূমে জীবনধারণ করতো। এখন পাখিরাই তা অধিকার করতে থাকে। জিউসের জ্ঞাতে মেঘের পোষাকে পাখিদের নিকটে আসেন প্রমিথিউস; তিনি এসে পাখিদের বলেন যে, বলি না পেয়ে দেবতারা উপবাসে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে তাঁর পিছন পিছন জিউসের দুই দূত — পোসেইদোন ও হেরাক্লেস — এসে হাজির। আথেনীয় লোকটি দাবি জানায় যে, জিউস নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিক এবং পৃথিবীর উপরে তার প্রভুত্বক্ষমতা পাখিদের হাতে তুলে দিক; তার বদলে অবশ্য সে বিবাহোৎসব উপলক্ষে এক মহাভোজের আয়োজন করবে। কমেডিতে হেরাক্লেসকে ভোজনবীর মহাপেটুকরূপে অঙ্কন করা হয়েছে — তাকে উত্তম আহার জোগালে তাকে দিয়ে সব কিছুই করিয়ে নেয়া সম্ভব। আর পোসেইদোন — পরইচ্ছাবশ নির্বোধ। চতুর আথেনীয় ভদ্রলোকটি তাদের কাছ থেকে জিউসের কন্যাকে পত্নীরূপে পাবার সম্মতি আদায় করে নেয়।

? ১. গ্রীসে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব কীভাবে ঘটেছিল? তার উদ্ভাবক কে, ভেবে বলো। ২. ট্র্যাজেডি ও কমেডি কী থেকে এসেছে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? ৩. প্রাচীন গ্রীসে থিয়েটার ভবন কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল? থিয়েটার ভবনের নক্সা বুঝিয়ে বলো এবং তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪. গ্রীসে রঙ্গমঞ্চকে 'বয়স্কদের বিদ্যাপীঠ' বলা হতো কেন? সেখানে কী শেখানো হতো? *৫. প্রাচীন গ্রীক থিয়েটার ও আমাদের বর্তমান যুগের থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়ের মধ্যে মিলই-বা কোনখানে?

§ ৪০. খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীক স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

(দ্র. মানচিত্র ৪)

মনে করতে চেষ্টা করো — মিশরীয় মন্দির ও আসিরীয় প্রাসাদগুলোয় কাকে মহিমান্বিত করে অঙ্কন করা হয়েছিল (§ ১৩:৩; § ১৭:২)।

১. সার্বজনীন ভবনসমূহের স্থাপত্যশৈলী। আগোরা, গিম্‌নাসিওন্‌, থেয়াত্রোন্‌ — সমস্ত সার্বজনীন স্থানই গ্রীসবাসীগণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করেছিল।

গল্পগুজব ও বিশ্রামের জন্য তারা সাধারণত **পোর্টিকোর*** ছায়ায় এসে জড়ো হতো। প্রথম দিকে কাঠের বড়ো বড়ো গুঁড়ি দিয়ে বানানো থাম ব্যবহার করা হতো ছাদ ধরে রাখার জন্য; পরে অবশ্য পাথর দিয়ে, এবং তা প্রায়শঃই মর্মরপ্রস্তর হতো, স্তম্ভ নির্মাণ শুরু হয়। পোর্টিকো থাকার ফলে দক্ষিণসূর্যের খর রৌদ্রতাপ গায়ে লাগতো না, অথচ সমাগত লোকজনরা গায়ে চমৎকার হাওয়া পেত।

মন্দির নির্মাণের ভিতর দিয়েই হেল্লেনীয় স্থাপত্যকলার মূল বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। নগর-রাষ্ট্রসমূহের জনগণের সামাজিক জীবনধারায় অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল মন্দির। তার ভিতরেই অবস্থিত ছিল কোষাগার, তার আশেপাশে সমারোহে উৎসব পালিত হতো। অন্যান্য ঘরবাড়ি থেকে মন্দিরকে বিশিষ্ট ও আলাদা দেখাবার জন্য মজবুত ও উঁচু ভিতের উপর মন্দিরভবন নির্মাণ করা হতো। মন্দির আয়তক্ষেত্রাকার করে তৈরি করা হতো, তার ছাদ হতো দুদিকে ঢালু। ছাদের ঢালু দুটি অংশ কার্নিসের সঙ্গে মিলে এক ত্রিভুজের সৃষ্টি করতো, ভবনের উপরে সম্মুখভাগে এই ত্রিভুজাকার গাঁথুনিটির নাম **ফ্রোন্তোনে।**

মন্দিরে পোর্টিকো থাকতো; পোর্টিকোর স্তম্ভগুলো সাধারণত সারা মন্দিরের চতুর্দিকে ঘিরে তৈরি করা হতো। দর্শকের মনে অত্যন্ত গভীর ও সুমহান ভাব উদ্দীপ্ত করার জন্য পোর্টিকোর স্তম্ভ বিশালাকার করা হতো, দেখে মনে হতো প্রস্তরনির্মিত ভূমিতল থেকে সেগুলো যেন উত্থিত হয়েছে। এধরনের স্তম্ভের নাম **দোরীয়।** আর যদি জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির গড়ার দরকার হতো, তখন তৈরি করা হতো ছিমছাম ধরনের **ইয়োনীয়** স্তম্ভ; তার উপরে আঁকাবাঁকা প্যাঁচালো অলংকরণ থাকতো যা দেখলে ভেড়ার বাঁকা শিং মনে পড়ে যেত। (দ্র. ২২৬ পৃষ্ঠা এবং দশমসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্র।)

* কোনো ভবনের সম্মুখভাগে বা পার্শ্বদেশে দেয়ালগাত্রের বাহিরে এক বা ততোধিক সারি স্তম্ভ গৃহের ছাদ ধরে থাকতো; কক্ষবহির্ভূত এই স্থানটিই পোর্টিকো। বর্তমান গ্রন্থে বিংশতিসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্রে যে ভবনটি আছে তাতে পোর্টিকো রয়েছে। লাতিন 'পোর্তিকুস্' শব্দ থেকে এই ইংরেজি শব্দের উদ্ভব। — অনু.
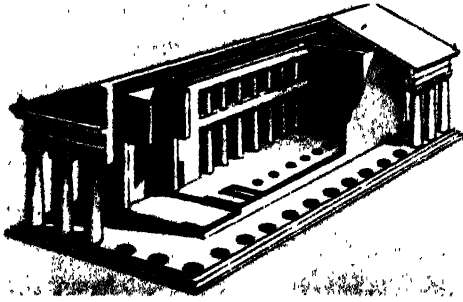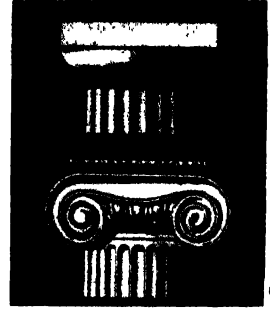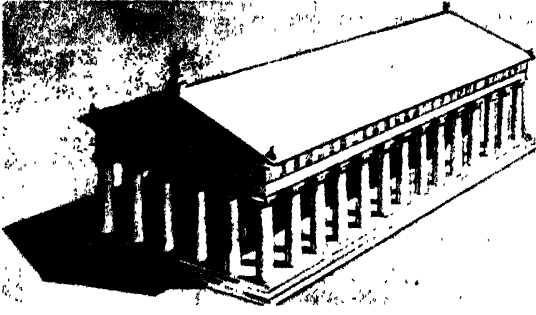
১. গ্রীক মন্দিরের মডেল। উপরের ছবিতে বাইরে থেকে মন্দির যেমন দেখতে হতো; নিচের ছবিতে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখানো হয়েছে: কালো কালো ফুটকি ও রেখাগুলো স্তম্ভ ও দেয়ালের চিহ্ন। ২. স্তম্ভের উপরিভাগ। এই স্তম্ভসমূহের কী নাম তোমার পঠিত অংশে তা খুঁজে বের করো। ৩. বল্লমধারী। (ভাস্কর পোলিক্লিতোস।) ৪. দেবী আথেনার মস্তক। (ভাস্কর ফিদিয়াস।)

২. গ্রীক ভাস্কর্য। মন্দিরের বাহির ও ভিতর প্রস্তরমূর্তি ও রিলীফ দ্বারা সুসজ্জিত থাকতো। শহরের ময়দানে এবং বিভিন্ন সার্বজনীন স্থানে প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হতো। প্লুতার্ক পরিহাস করে বলেছিলেন যে, আথেন্সে জীবন্ত মানুষের চেয়ে মূর্তির সংখ্যা বেশি।

মর্মর প্রস্তর কেটে, ব্রোঞ্জ ঢালাই করে, কাঠ খোদাই করে মূর্তি গড়ে তুলতো ভাস্কর্যশিল্পীরা। মর্মর পাথরের মূর্তি তারা মানুষের গায়ের রংয়ে রঞ্জিত করতো, আর ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তির চোখ তৈরি করতো রঙিন পাথর দিয়ে। কাঠের মূর্তির উপরে গজদন্তের পাতলা আবরণ বসাতো এবং তাও মানুষের গায়ের রংয়ের মতোই দেখাতো।

দেব-দেবী, বীর এবং সমকালীন লোকজনদের মূর্তি গ্রীক ভাস্করগণ এমনভাবে তৈরি করতেন যাতে দেহ সুঠাম ও মুখশ্রী সুন্দর দেখায়। কোনো ব্যক্তি সত্যি সত্যিই যে রকম দেখতে অবিকল সেই রকম চেহারার কাঠামো বা মুখের ধাঁচ রেখে

৩
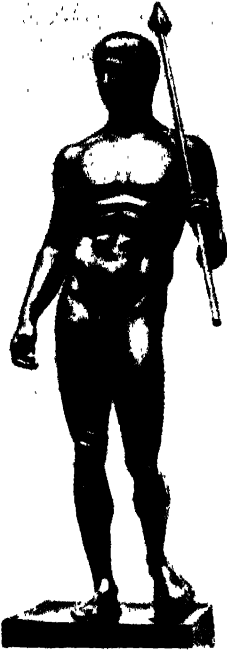
মূর্তি নির্মাণের কোনো চেষ্টা তাঁরা করতেন না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মনুষ্যদেহ কত সুন্দর হতে পারে তা দেখানো। দেহসৌন্দর্যকে অত্যন্ত মূল্য দেবার জন্য তাঁরা তাঁদের মূর্তি সম্পূর্ণ নগ্ন বা অর্ধনগ্নভাবে নির্মাণ করতেন।

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে ভাস্করেরা কীভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কর্মরত মানুষের মূর্তি গড়া যায়, তা জেনে গিয়েছিলেন। লোকে দৌড়াচ্ছে, যুদ্ধ করছে, চাকতি বা বর্শা নিক্ষেপ করছে — ইত্যাদি নানান ভঙ্গির মূর্তি তাঁরা গড়তে পারতেন। মিরনের তৈরি **'দিস্কোবোলোস্'** (চাকতি নিক্ষেপকারী) মূর্তি দেখলে তোমার মনে হবে যে, ক্রীড়াবিদ যেন এইমাত্র চাকতি নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে আর তার পেশল হাত বহুদূরে চাকতিটা ছুঁড়ে ফেলবে। (দ্র. ২১৭ পৃষ্ঠায় ১ নং ছবি)

নির্মিত মূর্তিতে শুধু মানুষের দেহসৌষ্ঠবই নয়, তৎসঙ্গে তার সাহস, ধৈর্য ও কর্মোদ্যোগও তাঁরা প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন। হোমর বর্ণিত সংগ্রামরত বীরদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রামী সমকালীন ব্যক্তিদের মহিমান্বিত করেছেন। জিউস ও পোসেইদোনের বিশাল মূর্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের নাগরিক ও রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রতিবিম্বিত করেছেন তাঁরা। (দ্র. ১৬০ পৃষ্ঠায় ১ নং চিত্রে মন্দিরের ফ্রোন্তোনেতে অবস্থিত মূর্তিদল)

মর্মর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল বলে ঘরবাড়ি সাজানোর জন্য পোড়ামাটির তৈরি কমদামী মূর্তি ও ফুলদানী তৈরি করা হতো। (দ্র. রঙিন আলোকচিত্র: একাদশ)

৩. পুষ্পাধারে অঙ্কিত চিত্রকলা। ফুলদানী নানান রকম আকারের হতো এবং সবই মসৃণ ও ঝকমকে দেখাতো। বহু ফুলদানীই সমকালীন শিল্পকলার প্রকাশ ধারণ করে আছে। সমকালীন জীবনের ছবি এবং পুরাণ ও হোমারের মহাকাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্পীগণ ফুলদানীতে বা পুষ্পাধারে ছবি আঁকতেন। খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে ফুলদানীর লালচে মাটির পটভূমির উপরে কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষা দিয়ে ছবি আঁকার প্রচলন হয়। এ জাতীয় ফুলদানীকে **কৃষ্ণমূর্তি** পুষ্পাধার বলা হতো। খ্রী. পূ. ৫ম শতকে ফুলদানী কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হতো আর তার পটভূমিতে মূর্তিগুলো ফুলদানীর আসল লালচে রং নিয়ে ফুটে বেরুতো। এধরনের ফুলদানীকে **লোহিতমূর্তি** পুষ্পাধার বলা হতো। (দ্র. রঙিন আলোকচিত্র: ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ)

খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে হেল্লেনীয় শিল্পকলা চরম বিকাশ লাভ করেছিল। হেল্লাসে এবং বহু গ্রীক উপনিবেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অভূতপূর্ব নিদর্শন সৃষ্টি করা হয়েছিল।

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল আথেন্স। আত্তিকায় নির্মিত পুষ্পাধার গ্রীসে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতো। আথেন্সে বহু প্রখ্যাত স্থপতি ও ভাস্কর কাজ করতেন। আথেনীয় আক্রোপোলিস নির্মিত হয়েছিল ফিদিয়াসের তত্ত্বাবধানে। আক্রোপোলিসে স্থাপিত ভবন ও মূর্তিসমূহের জন্য গ্রীক শিল্পকলার তুঙ্গস্পর্শী প্রতিভারূপে তাঁকে গণ্য করা হয়।

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে আথেনীয় আক্রোপোলিস

(পুনঃকল্পিত)

আক্রোপোলিস অবস্থিত ছিল শহরের সর্বাপেক্ষা উঁচু স্থানে। তার চারপাশ ছিল পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; আক্রোপোলিস যে কালে দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তখন থেকেই এ প্রাচীর রয়ে গেছে। তার প্রবেশদ্বারের সামনে, ডানদিকে, পাহাড়ের উপরে জয়দাত্রী দেবীর ছোটোখাটো মন্দির। (মন্দিরে কী ধরনের স্তম্ভ তা লক্ষ্য করো।) বামদিকের ভবনে চিত্রকলা সংরক্ষণ করা হয়। সারবদ্ধ বহু মর্মরস্তম্ভ সম্বলিত বিশাল পোর্টিকোর ভিতর দিয়ে আক্রোপোলিসের প্রবেশদ্বার। আক্রোপোলিসে প্রবেশদ্বারের ঠিক বিপরীতে — দেবী আথেনার

বিশাল মূর্তি, ভাস্কর ফিদিয়াস এটা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। দেবীর স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ ও তীক্ষ্ণ বল্লম পিরেউস্‌গামী নাবিকরাও দেখতে পেত। ম্যারাথন যুদ্ধে দখলকৃত ঐশ্বর্যরাশি দ্বারা এই মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। আরো ডাইনে — নগররক্ষী দেবী আথেনার সম্মানে স্থাপিত সুবিশাল মন্দির পার্থেনন।

স্বর্ণাভ শ্বেত মর্মর দিয়ে পার্থেনন গড়া হয়েছিল। এর চতুর্দিকে পোর্টিকো ঘিরে আছে। (কী ধরনের স্তম্ভগুলো, তা মনোযোগ দিয়ে দেখ।) ভবনের বাইরের দেয়ালগাত্রে রিলীফ অংকিত — তার বিষয়বস্তু আথেন্সবাসীদের উৎসব-শোভাযাত্রা। পার্থেননের পশ্চিম ফ্রোন্তোনের উপরে আথেনা ও পোসেইদোনের তর্কযুদ্ধের চিত্র খচিত। পুরাণ অনুযায়ী — যে দেবতা আথেন্সকে সবচেয়ে ভালো উপহার প্রদান করবেন তিনিই নগররক্ষার ভার পাবেন। পোসেইদোন তাঁর ত্রিশূল দিয়ে পর্বতশৃঙ্গ বিদ্ধ করে জলের ঝর্ণা এনে দিলেন। আর আথেনা বর্শা ছুঁড়লেন মাটিতে, সে জায়গা থেকে জলপাই গাছ গজিয়ে উঠলো। আথেনা দেবীই নগররক্ষী হলেন। পুরাণের এই গল্পে আথেন্সে জলপাইয়ের চাষ লোকে যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভাবতো, তা দেখানো হয়েছে।

পার্থেনন ভবনে মোট কক্ষ — দুটি। তার একটিতে ফিদিয়াস নির্মিত এগারো মিটার উঁচু আথেনা মূর্তি। মূর্তির মুখ, হাত এবং পা গজদন্ত খচিত, এবং পরিধেয় বস্ত্র স্বর্ণের। (এই মূর্তির অনুকরণে নির্মিত প্রাচীন গ্রীক মর্মরমূর্তি অদ্যাবধি সংরক্ষিত; তা দেখলে মূল মূর্তিটি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। দ্র. ১৭০ পৃষ্ঠায় ২ নং ছবি।) অন্য কক্ষটিতে আথেনীয় রাষ্ট্র ও নৌ-জোটের কোষাগার ছিল। উৎসবের সময় পার্থেননের নিকটে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণী বলি দেয়া হতো।

পার্থেননের বামদিকে আথেনা ও পোসেইদোনের সম্মানে নির্মিত অনতিবৃহৎ উজ্জ্বল এক মন্দির। এই মন্দিরভবনের একটি পোর্টিকোয় ছাদ ধরে রাখার জন্য স্তম্ভের বদলে রমণীমূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে (দ্র. ২৩১ পৃষ্ঠার ছবি।) মন্দিরের পাশেই জলপাই বৃক্ষ, লোকের বিশ্বাস — তাকে আথেনাই লাগিয়েছিলেন।

গ্রীসবাসীগণ আথেন্সকে দেশের সুন্দরতম শহর হিসেবে বিবেচনা করতো। জনৈক প্রাচীন লেখক বলেছিলেন: 'আথেন্স যদি তুমি না দেখে থাকো, তো তুমি মাথামোটা বলতে হবে। আর দেখেও যদি আলোড়িত না হও, তা হলে তুমি গর্দভ, আর স্বেচ্ছায় যদি তা তুমি ছেড়ে আসো, তবে তো তুমি নির্ঘাৎ উট!'

আথেনীয় আক্রোপোলিস ভয়ানকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। চিত্রাবলী, ফিদিয়াস নির্মিত সমস্ত মূর্তি এবং অন্যান্য ভাস্কর্যনিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়, পার্থেনন ও অন্যান্য ভবন অর্ধভগ্ন অবস্থায় টিকে থাকে। যে সব মূর্তি ভাঙে নি সেগুলো যাদুঘরে সংরক্ষিত হচ্ছে।

এখনো আক্রোপোলিস দেখে লোকে যে আনন্দ উপভোগ করে তা তাদের সারা জীবনের অবিস্মরণীয় সঞ্চয় হয়ে থাকে।

? ১. তোমার পঠিত বিষয় ও তন্মধ্যে প্রদত্ত চিত্রাবলীর সাহায্যে খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর গ্রীক মন্দিরের বর্ণনা লেখ। ২. গ্রীসে মূর্তি স্থাপন কাদের উদ্দেশ্যে করা হতো? দেব-দেবী ও পুরাণ বর্ণিত চরিত্রাদির মূর্তিনির্মাণের ভিতর দিয়ে ভাস্করগণ কাদের মহিমান্বিত করতেন? *৩. গ্রীক মন্দির ও মূর্তি দর্শকদের মনে কী অনুভূতি জাগাতো? ৪. পুষ্পাধারে অঙ্কিত চিত্রাবলীর সাহায্যে আমরা কী জানতে পারি? বর্তমান গ্রন্থে এধরনের ফুলদানীর উপর অঙ্কিত কোন্ ছবিগুলো খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের আর কোন্‌গুলোই বা খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর, ভেবে বলো। *৫. ধরো —
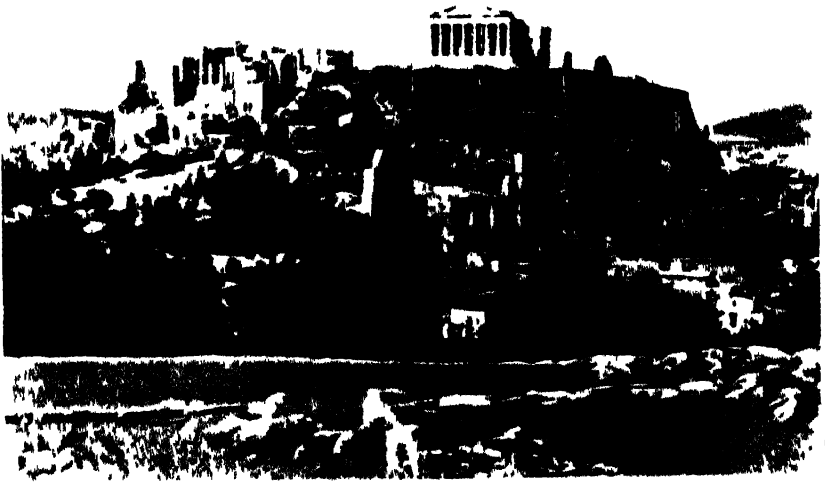
১. বর্তমান কালে আথেন্সের আক্রোপোলিস। (আলোকচিত্র।) ২. খ্রী. পূ. ৫ম শতকে আথেনীয় আক্রোপোলিস। (পুনঃকল্পিত রূপ।) বইয়ের মধ্যে আক্রোপোলিস সম্বন্ধীয় বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ এই আলোকচিত্র ও ছবির মধ্যে সনাক্ত করো।

আথেনীয় আক্রোপোলিসে মন্দিরের পোর্টিকো।

খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে তুমি আথেন্স নগরে ভ্রমণ করতে গেছ। পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গীতে নগর প্রদক্ষিণ করে সে সম্বন্ধে তোমার মনোভাব ব্যক্ত করো। মিশর ও গ্রীসে ভাস্করগণ তাঁদের নির্মিত মূর্তিতে কাদের গৌরবমহিমা প্রকাশ করতেন? তোমার মতে উভয়ের মনোভাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কি?

§ ৪১. প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনা

মনে করতে চেষ্টা করো—সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানসাধনার বিকাশ।

১. 'ইতিহাসের জনক'। মহাপরাক্রমশালী পারস্যের সাথে সংগ্রামে বিজয়লাভের গৌরব গ্রীক জনগণের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। গর্বের সাথে হেল্লেনীয়গণ নিজেদের সমসাময়িকদের সাহস স্মরণ করতো।

২
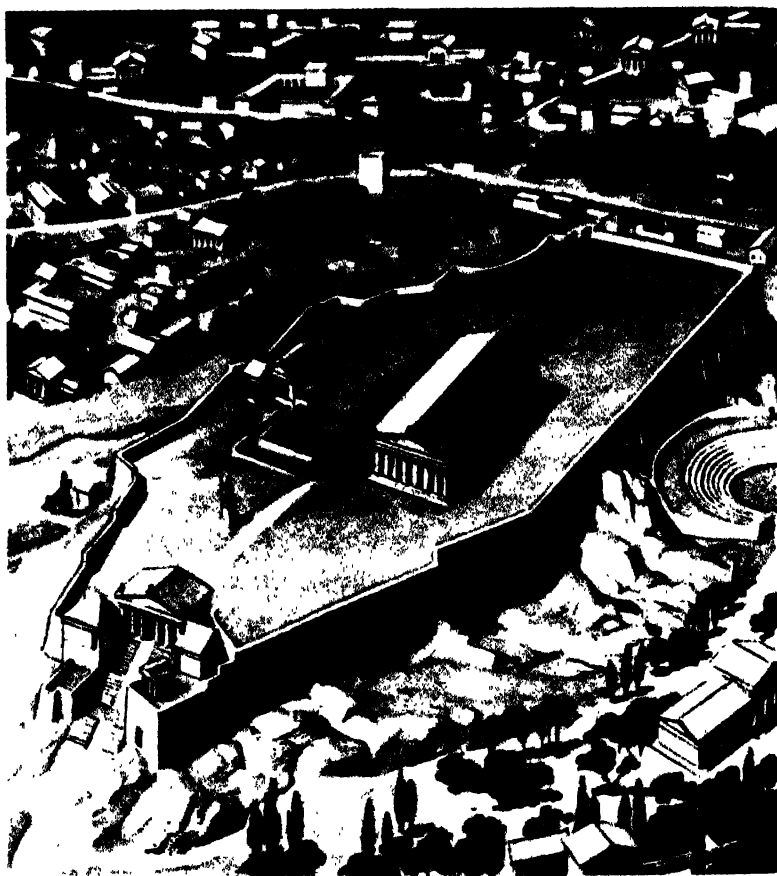
খ্রী. পূ. ৫ম শতকের মধ্যভাগে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতোস 'গ্রীস-পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করেন, সেখানে প্লাতেয়ার নিকটবর্তী স্থানের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি বর্ণনা করে গেছেন। ইতিহাস রচনার জন্য তিনি মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, কৃষ্ণ সাগরীয় উপকূলভূমি এবং বলকান উপদ্বীপ পর্যটন করেছিলেন। স্বচক্ষে দেখা এবং স্থানীয় লোকজনদের মুখ থেকে শোনা ঘটনাবলী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। যে সমস্ত জনগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সম্বন্ধে বহু বিবরণ দিয়েছেন হেরোদোতোস্, উপরন্তু শুধু খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীর জীবনযাত্রাই নয়, আরো বহু প্রাচীন কালের জনজীবনও তাঁর গ্রন্থে বিধৃত। গ্রীস ও প্রাচ্যের বহু দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থাদির অন্যতম প্রধান একটি গ্রন্থ তাঁর এই ইতিহাস।

হেরোদোতোসের ইতিহাস প্রাচীন কালেই এত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল যে, তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হতো। (হেরোদোতোস বর্ণিত মিশরীয় ইতিহাসের কোন্ কাহিনীর সাথে তোমরা পরিচিত হয়েছো?)

২. গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনার বিকাশ। গ্রীক বণিক ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করার ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন স্থানের মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে গ্রীকদের জ্ঞান প্রসারিত হয়েছিল। বিভিন্ন জনগণের মধ্যে জ্ঞানবিনিময় ও বিজ্ঞানবিকাশে সাহায্য করতো এই যাতায়াত।

খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেতুস্ নগর এবং ইওনিয়া (এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকা) অঞ্চলের বিভিন্ন শহর বিজ্ঞানবিকাশের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হতো। ইওনীয় পণ্ডিতবর্গ মিশর ও ব্যাবিলনের বিজ্ঞানসাধনার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং সেই ধারাকে আরো বহুদূর পর্যন্ত বিকশিত করতে তাঁরা সমর্থ হন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তথ্যাদি সংগ্রহ ও তার বর্ণনা লিখে রাখায় গ্রীক পণ্ডিতদের কোনো কার্পণ্য ছিল না এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ অনুসন্ধান ও পৃথিবীর জন্মরহস্য জানার জন্য তাঁরা ক্লান্তিহীনভাবে চেষ্টা করে গেছেন। তৎকালীন বিজ্ঞানীদের একদলের স্থির ধারণা ছিল যে, পৃথিবী আদিতে ছিল জল, আরেক দল ভাবতেন — মৃত্তিকা থেকেই পৃথিবীর উদ্ভব, তৃতীয় দল ভাবতেন — বাতাসই পৃথিবীর আদি উপাদান, আবার অন্য এক দল মনে করতেন — অগ্নি হতেই পৃথিবীর উৎপত্তি। (পৃথিবীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে গ্রীক বিজ্ঞানী ও গ্রীক ধর্ম যে ব্যাখ্যা দান করেছিল, তার মধ্যে পার্থক্য কী — ভেবে বলো।)

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে বিজ্ঞানসাধনার কেন্দ্র ছিল আথেন্স। আথেনীয় মহাবিজ্ঞানী
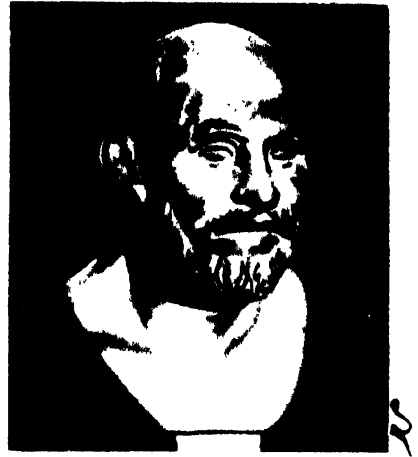
১. হেরোদোতোস ২. দেমোক্রিতোস
(প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মূর্তি।)

দেমোক্রিতোস্* প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেন। সমগ্র বিশ্ব যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুপুঞ্জ — **অণু** — দ্বারা গঠিত, এই ধারণা তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন।

বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে দেব-দেবীর অস্তিত্বহীনতার প্রশ্ন লোকের মনে আসে। দেমোক্রিতোস দেখিয়েছিলেন, মানুষের আত্মা বলে কোনো ব্যাপার নেই এবং মানুষ যে দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে তার কারণ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের সামনে তার অসহায়ত্ব ও ত্রাস।

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত আরিস্তোতেলেস নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সমকালীন বিজ্ঞানীদের সমস্ত রচনা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন তো বটেই, উপরন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন অসংলগ্ন বিষয়কে সুসংবদ্ধ করে বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার নামকরণ তিনি করেছিলেন, যেমন: গ্রীক শব্দ 'ফিসিস্' (অর্থাৎ প্রকৃতি) থেকে **ফিসিকা**; 'বোতানে' (অর্থাৎ উদ্ভিদ) থেকে **বোতানিকা**; 'পোলিস্' (অর্থাৎ রাষ্ট্র) শব্দ থেকে **পোলিতিকা**।** খ্রী পূ. ৪র্থ শতকের অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ন্যায় আরিস্তোতেলেস্ মনে করতেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং তা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, আর সূর্য ও অন্যান্য গ্রহতারাপুঞ্জ তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

* গ্রীক বিজ্ঞানী **দেমোক্রিতোস্** খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৪৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর নাম ইংরেজির (Democritus) অনুকরণে বাংলায় সাধারণত ডেমোক্রিটাস্ লিখে থাকেন অনেকে। — অনু.

** ইংরেজিতে এই শব্দগুলি যথাক্রমে Physics (পদার্থবিজ্ঞান), Botany (উদ্ভিদবিজ্ঞান), Political Science (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) রূপে পরিচিত। — অনু.

৩. প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীদের উপরে অত্যাচার। যে সমস্ত পণ্ডিত দেব-দেবী বিশ্বাস করতেন না, বহু গ্রীক তাঁদের শত্রু জ্ঞান করতো। সূর্য এক গোলাকার পাথুরে অগ্নিপিণ্ড মনে করায় আথেন্সে জনৈক বিজ্ঞানীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাঁর সমুদয় রচনা ভস্মীভূত করা হয় এবং শুধুমাত্র পেরিক্লেসের সহায়তায় আত্তিকা থেকে পলায়ন করতে পারায় তাঁর প্রাণ বাঁচে।

দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের আত্মার অবিনশ্বরতায় বিরুদ্ধে দেমোক্রিতোসের শিক্ষা বহু গ্রীক দাসমালিককে তাঁর শত্রু করে তুলেছিল। তাদের একজন দেমোক্রিতোসের রচনাবলী নিশ্চিহ্ন করার আহ্বান জানায় এবং আবেদন করে যে, তাঁর অনুসরণকারীদের 'এক দলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক, আরেক দলকে বেত্রাঘাত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক, আর তৃতীয় দলকে নাগরিক অধিকারবঞ্চিত করা হোক'।

৪. গ্রীসে সংস্কৃতি বিকাশের মূল কারণ। খ্রী. পূ. ৫ম-৪র্থ শতকে গ্রীক সংস্কৃতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। গ্রীক জনগণ ছিল সেই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীসে দাসমালিকদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন সে দেশের স্বাধীন নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গ্রীক সংস্কৃতি নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিল। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে আথেন্স যে গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হতে পেরেছিল, তা বিনাকারণে নয়। অন্যান্য নগর-রাষ্ট্র অপেক্ষা এখানে দাসমালিকভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক পূর্বে এবং তা পূর্ণবিকাশের সুযোগ পেয়েছিল। **তবে এই সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছিল দাসদের উপর অকথ্য অত্যাচারের বিনিময়ে, সর্বাপেক্ষা কঠিন পরিশ্রমের ভার তাদেরই বহন করতে হয়েছে।** দাসদের জন্য সমগ্র গ্রীস ছিল কারাগার, তারা শুধু সহ্যাতীত পরিশ্রম, প্রহার আর অপমানই ভোগ করতো।

৫. প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির তাৎপর্য। গ্রীক বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে বহু লিপিমালা উদ্ভূত হয়েছে। (দ্র. মানচিত্র ১২।)

গ্রীস বিজ্ঞানসাধনায় বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

গ্রীক শব্দোদ্ভূত প্রচুর শব্দ আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন: arithmetic, history, chronology ইত্যাদি।

রঙ্গমঞ্চের জন্মভূমি গ্রীস। হোমার ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিকের রচনা পৃথিবীর আধুনিক প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্যনির্মাণ ও ভাস্কর্যকর্ম দৃষ্টান্তস্থলরূপে গণ্য হতো, যা দেখে পরবর্তীকালে স্থপতি ও ভাস্করগণ শিক্ষা লাভ করেছেন।

প্রতি চার বৎসর পর পর যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার নামকরণ হয়েছে অলিম্পিক খেলা নামে। ক্রীড়ার সময়ে সর্বক্ষণ বিশাল একটি

মশাল জ্বলতে থাকে। এই মশালে আগুন ধরানো হয় সূর্য্যের রশ্মিতে এবং তার পর মহাসাগর, মহাদেশ অতিক্রম করে সেই মশাল পৌঁছে দেয়া হয় প্রতিযোগিতার স্থানে।

হেল্লাসবাসীদের সংস্কৃতি সারা বিশ্বের সংস্কৃতিবিকাশে বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

? ১. প্রাচীন গ্রীসে সংস্কৃতির বিকাশসাধনে কী কী অবস্থা সহায়ক হয়েছিল? ২. গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনা কী কী অবদান রেখে গেছে? জ্ঞানবিকাশের সাথে সাথে দেবতায় বিশ্বাস খর্ব হচ্ছিল কেন? ৩. খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল আথেন্স — প্রমাণ করো। ৪. প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির তাৎপর্য আমাদের জন্য কতখানি তা বোঝাবার জন্য কতিপয় দৃষ্টান্ত দাও। *৫. হেল্লেনীয় সংস্কৃতি নির্মাণে জনগণের অংশগ্রহণ কী দ্বারা বোঝা যায়? তাদের অংশগ্রহণের কিছু দৃষ্টান্ত দেখাও।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে গ্রীক-মাকিদোনীয় রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ

§ ৪২. খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রীসের পতন ও মাকিদোনিয়ার বশ্যতা স্বীকার

(দ্র. মানচিত্র ৪)

মনে করতে চেষ্টা করো — স্পার্তায় রাষ্ট্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল, কোথায় তা অবস্থিত (§ ৩২:২); নৌ-জোট গঠিত হয়েছিল কীভাবে (§ ৩৪:৫; ৩৬:১)।

১. গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ। গ্রীসকে শুধু আথেনীয়রাই নয়, স্পার্তানরাও শাসন করতে চেয়েছিল। পেরিক্লেসের জীবদ্দশাতেই আথেন্স ও স্পার্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষাবধি যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে যুদ্ধ শুরু হয় গ্রীসের প্রায় সমস্ত নগর-রাষ্ট্রই তাতে যোগ দেয়: এক পক্ষ আথেন্সের দিকে, অন্য পক্ষ স্পার্তার দিকে। ৩০ বৎসর ধরে যুদ্ধ চলার পর আথেন্সের পরাজয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। নৌ-জোট ভেঙে যায়। পিরেউস পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রাচীর ধ্বংস করে দেয়া হয়।

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকেও গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। একে অন্যের অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে উদ্যান ও আঙুর বাগান তছনছ করেছে, শস্যক্ষেত্র দলিতমথিত করেছে, নগর ও গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে, যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করেছে।

যুদ্ধ গ্রীসকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, জলপাই বাগানের স্থানে শুধু ছিল দগ্ধ গুঁড়ি, আর ফসলের ক্ষেত ভরে গিয়েছিল আগাছায়।

২. চাষী ও কারিগরদের সর্বনাশ। শুধু ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহই নয়, দাসের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধিও কৃষক ও কারিগরদের সর্বনাশ ডেকে আনে। অতি অল্প খরচেই দাসদাসী রাখা যেত। হস্তশিল্পের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান ও জায়গা-জমির মালিকরা,
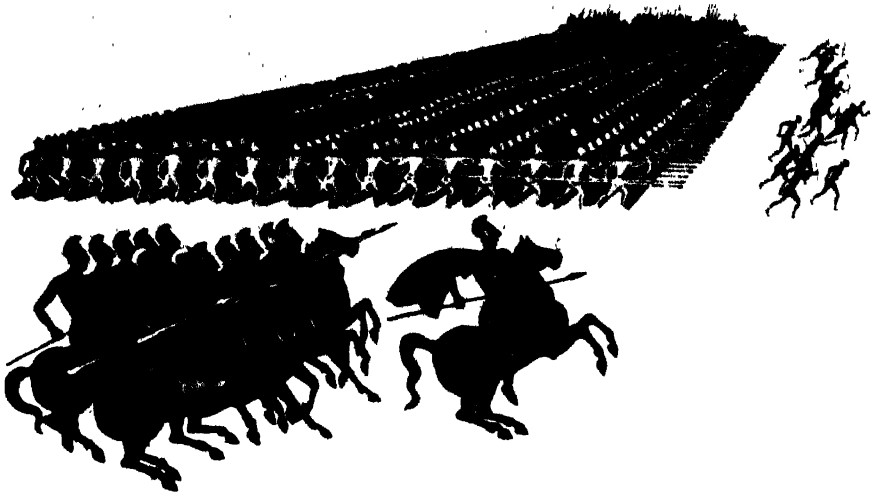
মাকিদোনীয় 'ফালাঙ্গোস' — পদাতিক। (বর্তমান কালের শিল্পীর আঁকা ছবি।) যোদ্ধাদের মোট ১৬টি সারিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম সারির সৈনিকদের বর্শা লম্বায় দু'মিটার করে, আর ষষ্ঠ সারির সেনাদলে বর্শা লম্বায় প্রায় ছ'মিটার। যুদ্ধের সময়ে একসঙ্গে একই সময়ে ছ'টি সারিই বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতো। ফালাঙ্গোসের সামনে থাকতো হালকা অস্ত্রধারী সৈনিকদের দল, আর পার্শ্বদেশে অশ্বারোহী যোদ্ধা। মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারতো, কিন্তু তা শুধু একমাত্র সমতলভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে।

যারা দাস রেখে কাজ করতো তারা চাষী ও কারিগরদের চেয়ে অনেক শস্তায় জিনিসপত্র বেচতে পারতো। ফলে কৃষক-কারিগররা তাদের জিনিসের বাজার পেত না। ছোটো ছোটো কর্মশালার সংখ্যা গ্রীসে কমে যেতে থাকে, আর বড়ো বড়ো কর্মশালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। কৃষকরা ধ্বংসমুখে পতিত হয়, ধনীরা তাদের জমিজমা কিনে নিতে থাকে।

প্রচুর গরিব লোক সৈন্যবাহিনীতে চাকরি নিতে বাধ্য হয়। কর্মান্বেষী লোকদের বাজার গড়ে ওঠে, যেখানে সৈন্য হিসেবে একজন লোক কিংবা পরিচালকসহ সমগ্র একটি যোদ্ধাদল চাকরিতে বহাল হবার জন্য তৈরি থাকতো। এমন কি পারস্য সম্রাটের সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত বহু ভাড়াটে গ্রীক ছিল।

৩. শ্রেণীসংগ্রাম চরম অবস্থায় উন্নীত। ধনীর বিরুদ্ধে বুভুক্ষু দরিদ্র জনগণের ঘৃণা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। কোরিন্থে দরিদ্রেরা বিদ্রোহ করে। তারা ধনীদের রাস্তায় টেনে এনে হত্যা করে, তাদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠন করে তছনছ করে দেয়। বড়ো লোকেরা মন্দিরে গিয়ে আত্মগোপন করে, কিন্তু নিঃস্বের দল সেখানে গিয়েও হানা দেয় এবং কয়েক শ' লোক হত্যা করে।

ধনী ব্যক্তিরাও দারিদ্র্য ঘৃণা করতো। আরিস্তোতেলেস্ লিখেছেন যে, তারা শপথ করেছিল: 'শপথ করে বলছি, চিরকাল জনগণের শত্রুতা করে যাবো, তাদের যতদূর ক্ষতি করা সম্ভব তা করবো।'

তাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা পাবে এবং দাস ও দরিদ্রদের উপরে তারা প্রভুত্ব করতে পারবে এরকম আশ্বাস পেলে দাসমালিকরা যে কোনো রাষ্ট্রের পরাধীনতা স্বীকারের জন্য তৈরি ছিল। তাদের এই সমস্ত আশা-ভরসা তারা ন্যস্ত করেছিল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠা মাকিদোনীয় সাম্রাজ্যের উপরে।

৪. মাকিদোনিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি। গ্রীসের উত্তর-পূর্ব দিকে বলকান উপদ্বীপে অবস্থিত ছিল **মাকিদোনিয়া।** মাকিদোনিয়ার অধিকাংশ জনগণ ছিল **কৃষিজীবী।** তাদের উপর প্রভুত্ব করে বেড়াতো অভিজাতবর্গ, যারা মাকিদোনীয় সম্রাটের বশ্যতা প্রায় স্বীকারই করতো না।

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের মধ্যভাগে রাজা **২য় ফিলিপ্পোস** মাকিদোনিয়ায় নিজ ক্ষমতা আরো শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়ে তিনি **মাকিদোনীয় রাজতন্ত্র*** প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস্ অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। কৃষকদের ভিতর থেকে লোক বেছে নিয়ে তিনি তাঁর পদাতিক বাহিনী গড়েছিলেন। যুদ্ধে পদাতিকদের নিয়েই ফালাঙ্গোস তৈরি করা হতো। অভিজাত মাকিদোনীয়রা হতো অশ্বারোহী যোদ্ধা।

মাকিদোনীয় সম্রাট একের পর এক দুর্বল গ্রীক শহর দখল করতে শুরু করেন। গ্রীক দাসমালিকদের একাংশ স্বেচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। জন্মভূমির স্বাধীনতার চেয়ে তারা বেশি মূল্য দিত নিজেদের ধনসম্পত্তিকে। এরকম প্রায়ই হতো যে, দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস্ কোনো স্থানের কিছু লোকজনকে উৎকোচ দিয়েছিলেন এবং তারা পরে দুর্গের প্রবেশদ্বার তাঁর জন্য খুলে দিচ্ছে। ব্যঙ্গ করে তিনি বলতেন যে, সোনাভরা গর্দভ যে কোনো শহর নিয়ে নিতে পারে।

৫. গ্রীসের উপর মাকিদোনিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠা। মাকিদোনীয় সম্রাটের বিরুদ্ধে আথেনীয় দেমোস উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য আথেন্সবাসীদের সংগ্রামে পৌরোহিত্য দান করেছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী **দেমোস্থেনেস্।** জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসকে পরস্বাপহারী রূপে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করেন

* রাজতন্ত্র কথাটি ইংরেজি monarchy শব্দের ভাষান্তর, ইংরেজি শব্দটি আবার এসেছে গ্রীক 'মোনার্খেস্' শব্দ থেকে। — অনু.

'মোনার্খেস্' কথার অর্থ 'একের শাসন'। যে রাষ্ট্র একক ব্যক্তি ('মোনোস্') দ্বারা শাসিত হয় তাকে আরিস্তোতেলেস্ এই নামে অভিহিত করেছেন। একক শাসক ('মোনার্খ্') পরিচালিত রাষ্ট্রে রাজার সন্তানসন্ততি বংশানুক্রমে সিংহাসন লাভ করেন।
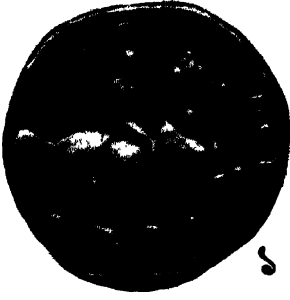
১. মাকিদোনীয় সম্রাট ২য় ফিলিপ্পোসের মুদ্রা। ২. দেমোস্থেনেস। (খ্রী. পূ. ৩য় শতকে নির্মিত গ্রীক মূর্তি।) **'বল্লমধারী' মূর্তির সাথে এই মূর্তির প্রধান প্রধান পার্থক্য কি?** ৩. খেরোনিয়া যুদ্ধের জায়গায় সিংহমূর্তি।

এবং গ্রীকদেরকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য আহ্বান জানান। মধ্য গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহের একাংশ মাকিদোনিয়ার সাথে সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।

খ্রী. পূ. ৩৩৮ অব্দে খেরোনিয়া শহরের নিকটে গ্রীক ও মাকিদোনীয়দের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। আথেনীয়দের সাথে এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধ করেছিলেন দেমোস্থেনেস্। দীর্ঘ দিন ধরে এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলে। প্রথম দিকে দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বাহিনীকে আথেনীয়রা পিছু হটিয়ে দেয়। অবশ্য উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং অধিক নিয়মশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত মাকিদোনীয় সেনাবাহিনী জয়লাভ করেছিল।

খেরোনিয়ায় যুদ্ধের পর প্রায় সমগ্র গ্রীস মাকিদোনিয়ার পদানত হয়। সমকালীন জনৈক ভদ্রলোক বলে গেছেন, 'গ্রীকদের স্বাধীনতা খেরোনিয়াতেই ভূলুণ্ঠিত দেহগুলোর সাথে কবরস্থ হয়েছিল।'

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অন্তর্ঘাতী যুদ্ধবিগ্রহ এবং দাসমালিকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই গ্রীস তার স্বাধীনতা হারায়।

দেমোস্থেনেসের জীবনী থেকে

(প্রাচীন লেখকের রচনা অবলম্বনে)

দেমোস্থেনেস্ ছোটোবেলায় এত হীনস্বাস্থ্য ও রুগ্ণ ছিলেন যে স্কুলেও পড়াশোনা করতে পারেন নি। পরিণত বয়সেও তিনি নারীসুলভ এমন পেলব ধরনের ছিলেন যে, লোকে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতো।

বক্তৃতা দেবার প্রতি দেমোস্থেনেসের এক অদম্য ও প্রচণ্ড প্রবণতা ছিল। প্রকৃতিগতভাবেই তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ঘ্যাড়ঘেড়ে এবং বেশিক্ষণ দম রাখতে পারতেন না। এই সব ত্রুটি যা তাঁকে বাধা দিত, সবই তিনি একব্রতী নিষ্ঠায় অতিক্রম করেছিলেন। দেমোস্থেনেস প্রথম দিকে বরং তাঁর লজ্জা-সংকোচের জন্য বিখ্যাত ছিলেন; জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে তাদের হৈ-হট্টগোলে তিনি এত হতচকিত ও ভয় পেয়ে যেতেন যে, তিনি আর একটা কথাও বলতে পারতেন না। এই অক্ষমতাকে জয় করার জন্য তিনি সমুদ্রতীরে গিয়ে প্রচণ্ড কল্লোলধ্বনি ও বাতাসের গর্জনের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতে লাগলেন; সমুদ্রগর্জনের শব্দে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় জনতার চেঁচামেচি আর তাঁর কানে অসহ্য ঠেকে নি।

দেমোস্থেনেস্ রাত্রে ঘুমাতেন না, আলো জ্বেলে বক্তৃতার ভাষণ তৈরি করতেন। তিনি কেবল জল পান করতেন, কেন না তাতে কর্মক্ষমতা ও প্রফুল্লতা বজায় রাখা যায়। বক্তৃতার সময়ে বিশ্রীভাবে কাঁধ ঝাঁকানো তাঁর এক বদভ্যাস ছিল। দেমোস্থেনেস্ ঘরের ছাদ থেকে একটা তরবারি ঝুলিয়ে রেখে ঠিক তার নিচে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে কাঁধ ঝাঁকালেই যাতে তরবারির খোঁচা লাগে, তার পর বক্তৃতা অভ্যাস করতেন; কাঁধের ঝাঁকুনি লেগে তরবারি পড়ে গিয়ে আহত হবার ভয় থাকায় কাঁধ ঝাঁকানোর অভ্যাসও তাঁর চলে গেল।

? ১. গ্রীসে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় ধ্বংসমুখে পতিত হয়েছিল কেন? ২. খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ কী? ৩. গ্রীসে রাজতন্ত্র বলা হতো কাকে? প্রাচীন যুগে তোমার জানা কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্রীয় বলা যাবে, আর কোন্গুলোতে বলা যাবে না? ৪. গ্রীসকে পদানত করা মাকিদোনিয়ার পক্ষে কেন সম্ভব হয়েছিল? ৫. খেরোনিয়ার যুদ্ধ কত বৎসর পূর্বে হয়েছিল? সালামিস যুদ্ধের কত বৎসর পরে খেরোনিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়? *৬. দেমোস্থেনেস চরিত্রে তোমার কী ভাল লেগেছে?

§ ৪৩. মাকিদোনিয়ার আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের রাষ্ট্রের বিকাশ ও অবক্ষয়

(দ্র. মানচিত্র ৬ ও ৭)

মনে করতে চেষ্টা করো — গ্রীসের সাথে যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্য পরাজয় বরণ করেছিল কেন (§ ৩৪)।

১. প্রাচ্য অভিযানের প্রস্তুতি। সমগ্র গ্রীস নিজের অধিকারে নিয়ে আসার পর রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস পারস্য অভিযানের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

মাকিদোনীয় ও গ্রীক দাসমালিকরা সেখানকার উর্বর ভূমি, অসংখ্য দাসদাসী দখল করে নেয়া এবং পারস্য সম্রাটের কিংবদন্তীয় ধন-ঐশ্বর্য হরণ করার জন্য স্বপ্ন দেখতে লাগলো। দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বাহিনীতে দরিদ্র গ্রীকরাও অংশগ্রহণ নিয়েছিল। সেনাবাহিনীতে চাকরি করে সেই বেতনে সংসার চালানো ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না তাদের।

দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস তাঁর এই অভিযান-প্রস্তুতির সময়ে **চক্রান্তকারীদের** হস্তে নিহত হন; **সম্ভবত** এই **চক্রান্ত** পারসীকদের **দ্বারা** পরিকল্পিত হয়েছিল। অতঃপর **সিংহাসনে** উপবেশন করলেন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র — আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ও সাহসী হলেও নিষ্ঠুর ও বদরাগী ব্যক্তি ছিলেন। অকল্পনীয়রূপে কর্মদক্ষ পুরুষ ছিলেন তিনি এবং চমৎকার শিক্ষাদীক্ষাও লাভ করেছিলেন; তাঁর শিক্ষক ছিলেন — আরিস্তোতেলেস্।

২. পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জয়। খ্রী. পূ. ৩৩৪ সালে **আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের** সেনাপত্যে মাকিদোনীয় বাহিনী এশিয়া মাইনর আক্রমণ করলো। দুটি যুদ্ধে পারসীকদের পরাভূত করে ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে দক্ষিণ দিকে আলেকজাণ্ডারের বাহিনী এগিয়ে যায়। (এই যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি প্রাচীন চিত্র পঞ্চদশসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্রে বিধৃত হয়েছে, দেখ।)

তাঁর বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছে সে সব জনগোষ্ঠীকে আলেকজাণ্ডার হয় নির্মমভাবে ধ্বংস করেছেন, নয়তো তাদের দাসে পরিণত করেছেন। তির শহর দখল করার পর তাঁর আদেশক্রমে ৮ হাজার লোককে হত্যা এবং ৩০ হাজার লোককে দাসরূপে বাজারে বিক্রয় করে দেয়া হয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও ফিনিসীয় শহরগুলোর বেশির ভাগই পারস্যের অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভ করতে চেয়েছিল, ফলে তারা আলেকজাণ্ডারের শাসন মেনে নেয়। বিনাযুদ্ধে মিশর তাঁর অধীনে চলে আসে এবং মিশরী পুরোহিতরা ঘোষণা করে যে, তিনি দেবতা।

৩. পারস্য সাম্রাজ্যের পতন। মিশর থেকে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট তাঁর বাহিনী নিয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়ে হাজির হন। পারস্য **সম্রাট তৃতীয় দারিউস্** বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেন। তাঁর বাহিনীতে রণহস্তী ও রথ ছিল। রথের সাথে কাস্তে জাতীয় অস্ত্র বাঁধবার ব্যবস্থা ছিল যাতে করে যুদ্ধের সময় বিপক্ষেরা তার আঘাতে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু পারসীক বাহিনীতে পারস্য অধিকৃত বিভিন্ন দেশের লোক ছিল, তারা পারস্য সম্রাটের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিল।

তাইগ্রিস নদের ধারে (দ্র. ২৪৩ পৃষ্ঠায় ২ নং চিত্র) গাউগামেলা নামক একটি ছোটো বসতির নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় শত্রুবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হলো। তৃতীয় দারিউস্ আক্রমণের জন্য রথীদের পাঠালে মাকিদোনীয়রা শর নিক্ষেপ করে তাদের অধিকাংশকেই নিহত করে এবং নিজেরা দুপাশে সরে যাওয়ামাত্র শত্রুপক্ষের ক্ষিপ্তপ্রায় ধাবন্ত যুদ্ধাশ্বগুলো তীব্রবেগে ভিতরে অগ্রসর হয়ে যায়। এদিকে তাদের পাশ কাটিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীসহ আলেকজাণ্ডার পারসীক সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে যেখানে সম্রাট দারিউস্ দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফালাঙ্গোসও পারসীকদের আক্রমণ করে হটিয়ে দেয়। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় ভীতচকিত দারিউস্ সর্বাগ্রে পালাতে শুরু করেন। তাঁর পিছন পিছন তাঁর সমগ্র বাহিনীও দৌড়ে পালাতে থাকে। অল্পকাল পরে দারিউস্ তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারাই নিহত হন।

বিশাল পরাক্রমী পারস্য সাম্রাজ্যকে মনে করা হতো মৃন্ময় চরণধারী দৈত্যদের দেশ। শত্রুর প্রথম আঘাতেই কিন্তু তার পতন ঘটলো।

৪. মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিযান। পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত কোন কোন এলাকা বিচ্ছিন্নভাবে মাকিদোনীয়দের প্রতিরোধ করতে থাকে। বিশেষভাবে প্রতিরোধ করে মধ্য এশিয়ার জনগণ। তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে, হাজার হাজার লোককে নিহত করে শেষপর্যন্ত আলেকজাণ্ডার মধ্য এশিয়ার মাত্র সামান্য কিছু অংশ দখল করতে সমর্থ হন।

এখান থেকে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দীর্ঘ ও কষ্টকর অভিযানে তাঁর বাহিনী নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, উপরন্তু ভারতীয়রা এই পররাজ্যলিপ্সুদের সাথে প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। সারা পৃথিবী জয়ের স্বপ্নে মশগুল আলেকজাণ্ডার বৃথাই তাঁর বাহিনীকে আরো অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। তাঁর বাহিনী আর এগোতে চাইছিল না, এবং ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো আলেকজাণ্ডারের পক্ষে।

৫. আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ও তার পতন। মাকিদোনিয়ার বিজয়াভিযানের ফলে বলকান উপদ্বীপ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট আর মাকিদোনিয়ায় ফিরে যান নি, তিনি ব্যাবিলনে থেকে গেলেন এবং তাকে নিজের রাজধানী করলেন। পারস্য সম্রাটের অনুকরণে তিনি নিজ রাজদরবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছিলেন তো বটেই এমন কি অমাত্যবর্গকে তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণত হবার নিয়ম চালু করেছিলেন।
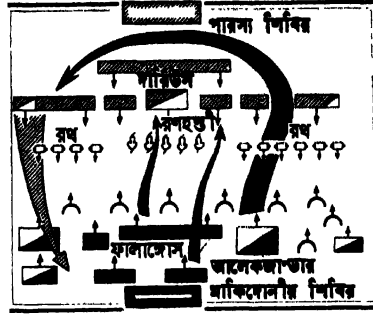
১. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের মূর্তি। ২. গাউগামেলার যুদ্ধ। ৩. পারসীকদের সাথে গ্রীকদের যুদ্ধ। (মর্মর প্রস্তর নির্মিত শবাধারের উপরে খোদিত রিলীফ।)

৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার জ্বরে অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করার পূর্বেই তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল তিনটি রাজ্য: **মাকিদোনীয়, মিশরীয় এবং সিরীয়**। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা এ রাজ্যগুলোর রাজা হয়ে বসে।

মিশর ও মধ্য প্রাচ্যের জনগণ অবশেষে মাকিদোনীয় ও গ্রীক দাসমালিকদের শিকারে পরিণত হলো।

আলেজাণ্ডার দি গ্রেটের জীবনী থেকে

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকে নিয়ে বহু প্রচলিত আছে। তার সবচেয়ে বেশির ভাগ প্লুতার্খের রচনায় সংগৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বিজয়াভিযানের শুনে তরুণ আলেকজাণ্ডার দুঃখিত মনে

বলেছিলেন: 'আমার পিতাই সব অধিকার করে নেবেন দেখছি, বিরাট ও গৌরবময় কোনো কিছু করার সুযোগ আর আমার কপালে নেই।'

গোর্দিউস নগরে একটি রথের উপরে 'গোর্দিউস গিঁট' নামে অত্যন্ত জটিলভাবে জটপাকানো গিঁট রাখা হয়েছিল। কথিত ছিল যে, যিনি ঐ গিঁট খুলতে পারবেন তিনি সমগ্র এশিয়ার অধিপতি হবেন। অনেকেই গিঁট খোলার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কেউ পারে নি। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটও চেষ্টা করেন। যখন ব্যর্থ হন, তখন তিনি তরবারি দ্বারা গিঁটটা কেটে ফেলেন। এ থেকেই পাশ্চাত্যে 'to cut the Gordian knot' বাগ্বিধি প্রচলিত হয়েছে; এই কথার সাদামাঠা অর্থ—জটিল গোলমেলে কোনো সমস্যার দ্রুত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা।

মরুভূমির উপর দিয়ে যাবার সময় মাকিদোনীয় বাহিনী তৃষ্ণায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিল। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জন্য সামান্য জল জোগাড় করে আনা হলে তিনি তা পান করতে অসম্মতি জানান এবং বলেছিলেন: 'যদি আমি একা জল পান করি তা হলে আমার লোকজন সকলেই তাদের মনোবল হারাবে।'

পারস্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে মহামূল্যবান একটি বাক্স ছিল। আলেকজাণ্ডারের বন্ধুবর্গ তাঁকে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কোনো বস্তু রাখার পরামর্শ দান করেন। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তা হলে তার মধ্যে তিনি 'ইলিয়াদ' মহাকাব্য রেখে দেবেন।

নিজের ঘনিষ্ঠতম পার্শ্বচরদের মধ্যে দুজনকে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে আলেকজাণ্ডার হুকুম দেন যে, তাদের মধ্যে একজনকে যেন অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। অত্যাচার করার সময়ে সম্রাট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আদেশে সন্দেহভাজন অপর ব্যক্তিটিকেও হত্যা করা হয়, যদি সে লোকটি এমন কি দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসেরও বন্ধু ও পার্শ্বচর ছিল।

? ১. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের পারস্য অভিযানে গ্রীসবাসীগণ কেন অংশ নিয়েছিল? ২. মাকিদোনীয় সৈন্যবাহিনী তোমার পরিচিত কোন্ কোন্ দেশ অতিক্রম করে অভিযান করেছিল ৬ নং মানচিত্রে তা খুঁজে বের করো। ৩. পারস্য সাম্রাজ্য মাকিদোনীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয় নি কেন? ৪. খ্রী. পূ. ৪র্থ-৩য় শতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল? খ্রী. পূ. ৫ম শতকীয় গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের সাথে তাদের পার্থক্য কী ছিল? ৫. মাকিদোনীয় বাহিনীর অভিযান মোট কত বৎসর ধরে চলেছিল? খেরোনিয়া যুদ্ধের কত বৎসর পর প্রাচ্যে মাকিদোনীয় বাহিনীর যুদ্ধাভিযান শুরু হয়েছিল? *৬. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের চরিত্র বর্ণনা করো। তাঁর চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক তোমার পছন্দ ও অপছন্দ, বলো।

§ ৪৪. খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের শেষ পাদ থেকে খ্রী. পূ. ২য় শতকের মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

(দ্র. মানচিত্র ৭)

মনে করতে চেষ্টা করো—খ্রী. পূ. ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশে গ্রীক পণ্ডিতবর্গের অবদান কীরকম ছিল (§ ৪১:১, ২)।

১. মাকিদোনীয় বিজয়াভিযানের পর মধ্য প্রাচ্য ও মিশরে দাসমালিকভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ। মাকিদোনীয় ও গ্রীক সেনারা প্রাচ্যের উর্বর ভূমি দখল করে

ভোগ করেছিল এবং চাষী ও দাসদের শোষণ করেছিল। যোদ্ধাদের পিছু পিছু অনুসরণ করে গ্রীক ও ম্যাকিদোনীয় কারিগর ও বণিকরাও মধ্য প্রাচ্য ও মিশরে গিয়ে পৌঁছেছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সবকিছু কব্জা করে নিয়েছিল এবং হস্তশিল্পের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলোর মালিক হয়ে বসেছিল।

প্রাচ্যভূমির বহু প্রাচীন শহর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নতুন নতুন শহরও দেখা দিয়েছিল। বিশেষত তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে যেখানে মহাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রসারিত স্থলপথ এসে মিশেছিল সমুদ্রপথের সাথে, সেখানে অনেক শহর গড়ে উঠেছিল এবং প্রচুর ব্যবসাবাণিজ্য চলতো। গ্রীকরা বিশালাকার জাহাজাদি নির্মাণ করেছিল; সেগুলো খোলা সাগরে চলাচল করতো এবং শত শত টন মালপত্র বহন করতে পারতো; এরকম জাহাজ চালাতে কয়েক শ'দাস দাঁড় টানতে কাজে নিযুক্ত থাকতো।

প্রায় প্রত্যেক শহরে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার ছিল। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দাসের সংখ্যা লক্ষ্যযোগ্যভাবে বর্ধিত হয়েছিল। গ্রীক ও ম্যাকিদোনীয়দের নিয়েই মূলত দাসমালিক শ্রেণী গঠিত ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা দাসমালিক ছিল, তারা গ্রীকদের ভাষা শিখে, তাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে সর্বতোভাবে তাদের অনুসরণ করতো। **হেল্লেন** এবং **দাসমালিক** শব্দদ্বয় এখানে সমার্থক ছিল।

২. মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া। নীল নদের অববাহিকায় আলেকজান্ডার দি গ্রেট স্থাপিত **আলেকজান্দ্রিয়া** শহর খ্রী. পূ. ৩য় শতকে পৃথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ নগরী ও মিশর সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে খ্যাতি লাভ করে। মিশর থেকে এখানে নীল নদের জলপথ ধরে খাদ্যশস্য ও প্যাপিরস এসে পৌঁছাতো, নুবিয়া থেকে আসতো স্বর্ণ ও গজদন্ত। খাল খনন করে নীল নদ ও লোহিত সাগরের সংযোগ সাধন করা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পারস্য উপসাগর ও আরো দূরবর্তী ভারতবর্ষ পর্যন্ত বাণিজ্যযাত্রার স্থলপথ চলে গিয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে সব সময়ে বহু ভাষায় লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যেত।

নগরের সম্মুখবর্তী দ্বীপের উপরে ১২০ মিটার উঁচু **আলোকস্তম্ভ** নির্মাণ করা হয়েছিল। বন্দরগামী জাহাজকে রাত্রে আলোকসংকেত দেয়া হতো এখান থেকে। আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তাঘাট ছিল পাকা এবং সরল; সেখানে ছায়াঘন উদ্যান, রঙ্গমঞ্চ, জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, গিমনাসিওন ও বিখ্যাত মুসেইওন্ (অর্থাৎ 'কলাদেবীদের* পবিত্র গৃহ') ছিল। (মনে করে দেখ, গ্রীসে 'মুজা' বলা হতো

* গ্রীক পুরাণে নয় জন কলাদেবী (গ্রীক শব্দ 'মুজা', ইংরেজিতে বলা হয় Muse — 'মিউজ') কল্পনা করা হয়েছে। ইংরেজি Museum শব্দটি 'মুসেইওন্' শব্দ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। — অনু.
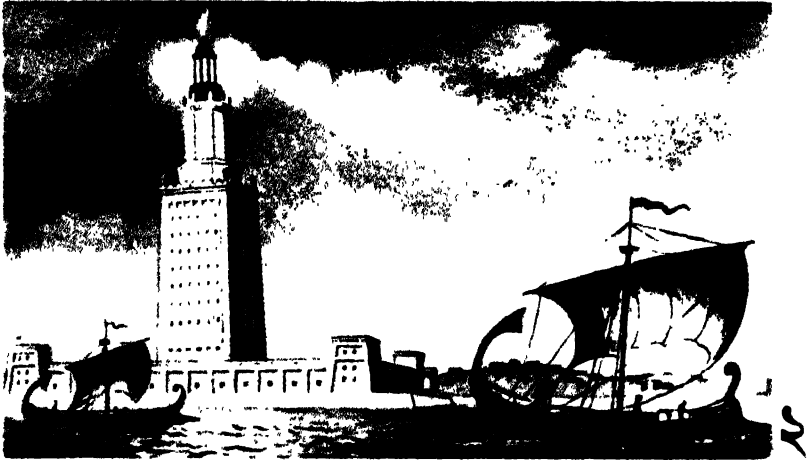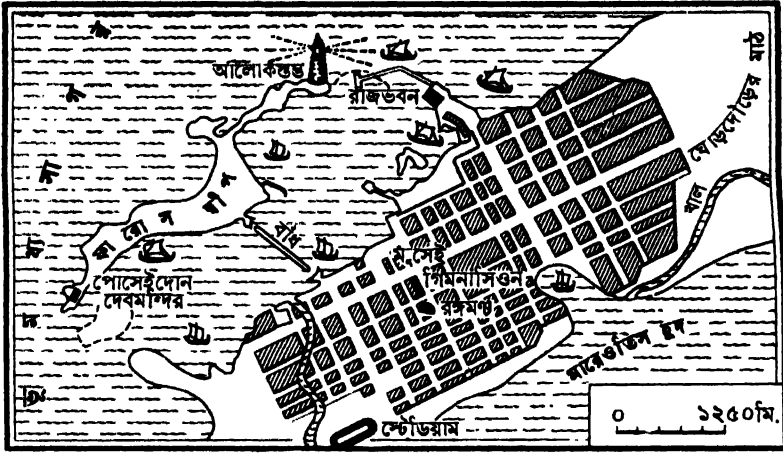
কাদের; § ২৯:২)। মুসেইওনের মধ্যে এক বিশালায়তন পাঠাগার এবং জ্যোতির্মণ্ডল নিরীক্ষণের জন্য একটি মানমন্দির ছিল।

৩. খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য নগরের বিভিন্ন পাঠাগারে গ্রীক ও প্রাচ্যের বহু দেশ থেকে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক রচনাবলী সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারে পাপিরস ও পের্গামেনোসের উপরে লিখিত প্রায় ৭ লক্ষ পাণ্ডুলিপি

৩

৪
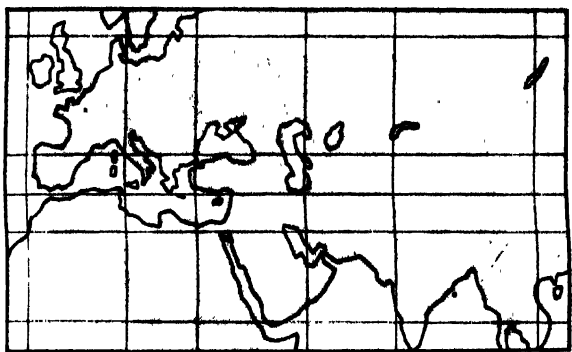
১. মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের নক্সা। **আলেকজান্দ্রিয়া এবং আথেন্সের মধ্যে তুমি মৌলিক পার্থক্য কী দেখতে পাচ্ছ?** ২. আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ। (পুনঃকল্পিত রূপ।) 'পৃথিবীর পরমাশ্চর্য' বস্তুসমূহের মধ্যে একটি এটি গণ্য হতো। স্তম্ভের উপরে আলোকবর্তিকারূপে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হতো তা ১০০ কিলোমিটার দূর থেকেও দেখা যেত। ভূমিকম্পে আলোকস্তম্ভটি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীন চিত্রের অনুকরণে বর্তমান ছবিটি অঙ্কন করা হয়েছে। **নক্সার মধ্যে কোথায় আলোকস্তম্ভ রয়েছে. এবং তোমার পঠিত বিষয়ে সে সম্বন্ধে কোথায় বর্ণনা আছে, খুঁজে বের করো।** ৩. খ্রী. পূ. ৩য় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় এই মানচিত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। গ্রীকরা যেভাবে আমাদের মহাদেশগুলো দেখেছিল সেই অনুযায়ী এখানে মহাদেশ বোঝানো হয়েছে কৃষ্ণাভ বর্ণলেপন করে। স্থলভূমি ও সাগরের মধ্যে পার্থক্য রেখার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। **গ্রীকগণ কোন্ কোন্ দেশ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানতো এবং কোন্‌গুলো একেবারেই জানতো না, সে সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত বলো।** .৪ কোরিন্থীয় স্তম্ভের উপরিভাগ। দেখতে যেন বড়ো বড়ো পাতার একগুচ্ছ স্তবক। **দোরীয় এবং ইয়োনীয় স্তম্ভের মধ্যে প্রতিতুলনা করো।** (দ্র. ২২৬ পৃষ্ঠায় ২য় ছবি।)

ছিল। গো ও মেষ শাবকের চামড়া খুব ভালোভাবে প্রসেসিং করে লেখার উপযোগী বস্তুতে পরিণত করার পরে সেই জিনিসটিকে বলা হতো **পের্গামেনোস্***। এশিয়া মাইনরের **পের্গামোন্** শহর এজাতীয় চর্মকাগজ তৈরির কেন্দ্রস্থল ছিল; বস্তুটির নামকরণও তাই শহরের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পের্গামেনোস্ বেশ টেকসই ও সুবিধাজনক হলেও অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। এ উপায়ে বড়োসড়ো একটা বই লেখার জন্য গো শাবকের সম্পূর্ণ একটা পাল বধ করার প্রয়োজন পড়তো।

নিস্তব্ধ পাঠাগারের বিভিন্ন কক্ষে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতেন প্রচুর

* ইংরেজিতে বলে parchment — পার্চমেন্ট। — অনু.

১. খ্রী. পূ. ৩য় শতকে নির্মিত দেবীমূর্তি নিকে। এই দেবী সম্বন্ধে তোমার বইয়ে কোথায় লেখা আছে, খুঁজে বের করো। ২. বৃদ্ধ ব্যক্তি। (খ্রী. পূ. ১ম শতাব্দীতে নির্মিত মূর্তি।) ৩. পের্গামোনে রিলীফের একাংশে সুরাসুরের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। দেবতা জিউস অসুরপীড়রূপে চিত্রিত হয়েছেন।

পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী। এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচীর বিজ্ঞানসাধনার সম্মিলন, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতি, বিশেষত গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ ঘটাবার সুযোগ দান করেছিল। খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল প্রাচীন বিশ্বের বিজ্ঞানোন্নতির শীর্ষদেশ স্পর্শ করে আছে।

৩য় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত গণিতবিদ এউক্লেদেস্* আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করতেন। জ্যামিতিতে তাঁর অবদান অদ্যাবধি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞান পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছিল। জনৈক গ্রীক বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, সূর্যের ও নিজের কক্ষপথের চারদিকে পৃথিবী পরিক্রমণ করছে। অবশ্য তিনি তা প্রমাণ

* ইংরেজিতে বলা হয় ইউক্লিড (Euclid)। — অনু.

৩

করে দেখাতে পারেন নি। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে তাঁকে পরিহাস করতেন, ফলে এই মহা আবিষ্কার দীর্ঘকাল বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে গেল।

৪. খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকে গ্রীক ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় শিল্পকলা। মাকিদোনীয়রা মধ্য প্রাচ্য ও মিশর জয় করার পর গ্রীক স্থপতিগণ সেখানে অলিম্পীয় দেব-দেবীদের মন্দির, রঙ্গমঞ্চ ও প্রাসাদাদি নির্মাণ করে। জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদের জন্য সাদামাঠা দোরীয় শৈলীর স্তম্ভ অনুপযোগী বিবেচিত হলো। খ্রী. পূ. ৪র্থ-৩য় শতাব্দীতে যে ধরনের স্তম্ভ বহুল ব্যবহৃত হয়েছে তার নাম **কোরিন্থীয় স্তম্ভ**। (দ্র. ২৪৭ পৃষ্ঠার ছবি)

খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকে গ্রীক ভাস্করগণ ভাস্কর্যশিল্পের বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন রচনা করে গেছেন। তাঁদের ভাস্কর্যনির্মাণের অন্যতম প্রধান এক শিল্পরচনা — জাহাজের অগ্রভাগে স্থাপিত জয়দাত্রী দেবী নিকে-র মূর্তি। বায়ু সন্নিধানে দেবীর উড়ন্ত বসন ও তাঁর ডানার ছন্দোভঙ্গিমা শিল্পী অপূর্বভাবে তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভাস্কর্যমূর্তিতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক জীবন্ত ভঙ্গি এবং তার মানসিক অবস্থার প্রতিফলন গ্রীক ভাস্কর্যশিল্পে এক নতুন সংযোজন। দেমোস্থেনেসের মূর্তি তো মহান বাগ্মীর এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সেখানে তাঁকে প্রবীণ ও রুগ্ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়া হয়েছে। তাঁর উদ্বেগক্লিষ্ট মুখাবয়বে মাতৃভূমির জন্য দুশ্চিন্তা স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত। (দ্র. ২৩৯ পৃষ্ঠার ছবি)

গ্রীক শিল্পকলার নবোত্থিত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল পের্গামোন্ শহর। অসুরদের সাথে অলিম্পীয় দেবকুলের যুদ্ধ সেখানে এক বিখ্যাত রিলীফে খোদিত হয়েছে। রিলীফটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩০ মিটার এবং সেখানে খোদিত মূর্তিসমূহ প্রায় ৩ মিটার দীর্ঘ। রিলীফটি যদিও ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে গেলেও ভয়াবহ যুদ্ধের চিত্র অসাধারণ স্পষ্টভাবে তা এখনো দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। পরাজিতদের মুখের যন্ত্রণাদায়ক ভাবব্যঞ্জনা, সংগ্রামরত বিপক্ষদের সুবিশাল দেহের যুধ্যমান ভঙ্গিমা — সব সেখানে অপূর্বরূপে বিধৃত।

মাকিদোনিয়া কর্তৃক বিজিত হবার পর পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশের উন্নতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মেহনতী জনগণের কাছে এই গ্রীক ও মাকিদোনীয় বিজয়ী ছিল বিদেশী এবং ঘৃণ্য। বিজয়ের ফলে উদ্ভূত রাষ্ট্র মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজেদের মধ্যে ঘনঘন যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রটিকে হীনবল করে দেয় সেজন্যই পশ্চিম দিক থেকে পরাক্রমশীল রোম যখন আক্রমণ করে বসলো তখন তা প্রতিহত করা এই রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১. মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতিতে কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল? ২. এই বইয়ে তোমার পঠিত বিষয়, নগর পরিকল্পনা ও চিত্রাদি অবলম্বন করে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর একটি বর্ণনাত্মক কাহিনী রচনা করো। আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন নগরসমূহের কী সাদৃশ্য ছিল, এবং তার বাইরে নতুন কী তুমি দেখতে পেয়েছো আলেকজান্দ্রিয়ার? ৩. সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমিতে বিখ্যাত কোন্ পাঠাগারের কথা তুমি জানো? তার সাথে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারের তুলনা করো (§ ১৭:৩)। উভয়ের মধ্যে প্রতিতুলনায় সেখানকার সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্বন্ধে তোমার কী সিদ্ধান্ত, বলো। ৪. খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গ্রীসের শিল্পকলার সাথে খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকের গ্রীক শিল্পকলার পার্থক্য কোথায়? উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি তোমার ভালো লাগে? এবং কেন ভালো লাগে?

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস মনে আছে কিনা দেখে নাও

গ্রীসে সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ জনবসতি স্থাপন করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দের শেষদিকে গ্রীকরা বিপুল সংখ্যায় নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষদিকে বিভিন্ন গ্রীক উপজাতি কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল? খ্রী. পূ. ১ম সহস্রাব্দের শুরুতে গ্রীক বসতি যে সব জায়গায় হয়েছিল, তা ৫ নং মানচিত্রে দেখাও। সে সময়ে গ্রীক সংস্কৃতির অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল কেন এবং সেই অবক্ষয়ের প্রমাণ কীসে মেলে?

খ্রী. পূ. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকরা আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উন্নীত হয়েছিল।

আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের লক্ষণাবলী গ্রীকদের মধ্যে হোমারীয় যুগে তখনও কী কী টিকে ছিল? এবং দাসতান্ত্রিক সমাজ যে উদ্ভূত হচ্ছিল তার প্রমাণ কী? প্রমাণাদিসহ নিজের উত্তর বিশদভাবে বলো। গ্রীকদের দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের মৌলিক কারণ কী? এই উত্তরণ মিশর ও মেসোপটেমিয়ার চেয়ে গ্রীসে যে অনেক পরে হয়েছিল, তার কারণ তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের পত্তন ঘটে।

গ্রীসে খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে কী কী রাষ্ট্র ছিল? তাদের রাষ্ট্রসীমা মানচিত্রে নির্দেশ করো। ঐ সব রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ কী? অভিজাতবর্গের সাথে সংগ্রামে খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দেমোস কী কী সাফল্য অর্জন করেছিল?

খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বহু গ্রীক নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে অনেক নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করে।

খ্রী. পূ. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকের গ্রীক উপনিবেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলো এবং মানচিত্রে দেখাও। উপনিবেশ পত্তনের অন্ততঃপক্ষে তিনটি কারণ দর্শাও। গ্রীসের জন্য এবং যে সব দেশে উপনিবেশ গড়া হয়েছিল তাদের জন্যও এর তাৎপর্য কী ছিল?

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজ আরো প্রভূতরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজের উন্নতির প্রমাণ কীসে দেখা যায়? গ্রীস-পারস্য যুদ্ধে এই দাসতান্ত্রিক সমাজবিকাশের তাৎপর্য কী ছিল? দাসমালিকদের সাথে দাসদের সংগ্রামের স্বরূপ কী ছিল?

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে দাসমালিকদের গণতন্ত্র উন্নততর মান অর্জন করেছিল।

দেমোস কীভাবে আথেন্স শাসনের ভার লাভ করে? প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্রকে কেন দাসমালিকভিত্তিক গণতন্ত্র বলা হয়, বলো।

খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে হেল্লেনীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

খ্রী. পূ. ৫ম শতকে গ্রীক শিল্পকলার উন্নতির পরিচয়বাহী ৩-৪টি চিত্র উপস্থাপন করো। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিতে গ্রীকদের নতুন অবদান কী? দাসতন্ত্র ও দাসমালিকভিত্তিক গণতন্ত্রের সাথে গ্রীক সংস্কৃতির বিকাশ কীভাবে সম্পর্কিত ছিল? খ্রী. পূ. ৫ম শতকে আথেন্স কেন হেল্লেনীয় সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গণ্য হতো?

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং তারা তাদের স্বাধীনতা হারায়।

গ্রীকরা পারস্য জয় করতে সক্ষম হয়েছিল, অথচ মাকিদোনিয়ার কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হলো — এর কারণ কী? এ সম্বন্ধে তুমি কী মনে করো, বলো। এ প্রশ্নের উত্তর দান কঠিন মনে হলে মনে করতে চেষ্টা করো — খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকের শেষ দিক থেকে খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের মধ্যে কী কী কারণে গ্রীস হীনবল হয়ে পড়েছিল।

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের শেষে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে গ্রীক-মাকিদোনীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকে সংঘটিত কোন্ দুটি যুদ্ধ এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে? তাদের প্রত্যেকটির তাৎপর্য বর্ণনা করো। খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকের শেষ থেকে খ্রী. পূ. ৩য় শতকের শুরু পর্যন্ত সময়ে উদ্ভূত বৃহত্তম গ্রীক-মাকিদোনীয় সাম্রাজ্য মানচিত্রে নির্দেশ করো।

গ্রীক সংস্কৃতি বহুদূরে প্রাচ্য দেশগুলো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল।

প্রাচ্য দেশসমূহে গ্রীক সংস্কৃতির প্রসারের নিদর্শন কী? পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকে সংস্কৃতি বিকাশের বিভিন্ন বিখ্যাত কেন্দ্র যা তুমি জানো তা মানচিত্রে দেখাও। পূর্ববর্তীকালের সংস্কৃতির তুলনায় এ সময়ে বিকশিত সংস্কৃতিতে নবতর উপাদান কী কী ছিল?

এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো: আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণে কি মানুষের অগ্রগতি প্রমাণিত হয়? তোমার ধারণা যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

'খ্রী. পূ. ১১শ-৩য় শতাব্দীতে গ্রীক ইতিহাসের মূল যুগবিভাগ' সারণীটি পূরণ করো।

খ্রী. পূ. ১১শ-৩য় শতাব্দীতে গ্রীক ইতিহাসের মূল যুগবিভাগ

গ্রীক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ (শতাব্দী)	বিভিন্ন সময়ে গ্রীকরা বিভিন্ন স্থানে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল?	গ্রীকদের অর্থনীতিতে মূল পরিবর্তন কী কী ঘটেছিল?	গ্রীকদের সমাজব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল?	গ্রীকদের শাসনব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল?
খৃ. পূ. ১১শ-৯ম শতক	দোরীয়দের বলকানস্থিত গ্রীস অভিযান, ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে ও বিভিন্ন দ্বীপে গ্রীক-দের বসতিস্থাপন	লৌহনির্মিত শ্রম-হাতিয়ার ব্যবহার শুরু	আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে ধীরে ধীরে দাসমালিক-ভিত্তিক সমাজে উত্তরণ	উপজাতিগুলির উপরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত লোকজনদের শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি

*প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে কোন্ ব্যক্তিকে তুমি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনে করো? তোমার ধারণা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো।

খ্রী. পূ. ১৩শ — ২য় শতকে প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের কালপঞ্জী

গ্রীক ইতিহাসের প্রধান প্রধান যুগ	খ্রী. পূ.	প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার সন-তারিখ
	১৩শ	
	১২শ	খ্রী. পূ. আনু. ১২০০ সাল। ট্রয় যুদ্ধ
গোত্রব্যবস্থার পতন ও শ্রেণীর উদ্ভব	১১শ	খ্রী. পূ. ২য় সহস্রাব্দের শেষ। দোরীয় উপজাতিদের অভিযান
	১০ম	
	৯ম	
দাসমালিকভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ও নগর-রাষ্ট্র গঠন	৮ম	৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অলিম্পিক খেলা শুরু
	৭ম	
	৬ষ্ঠ	৫৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। আথেন্সে সোলোনের সংস্কার
গ্রীসে দাসতন্ত্রের বিকাশ ও আথেন্সের প্রাধান্য	৫ম	৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। মারাথন যুদ্ধ ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। জের্ক্সেসের অভিযান ৪৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। পেরিক্লেস শাসনের শুরু
নগর-রাষ্ট্রের পতন ও আথেন্সের প্রাধান্য রাজতন্ত্রের উদ্ভব	৪র্থ	৩৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। খেরোনিয়া যুদ্ধ ৩৩৪-৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। মাকিদোনীয় বাহিনীর প্রাচ্য অভিযান
	৩য়	
	২য়	খ্রী. পূ. ২য় শতকের মাঝামাঝি। রোম কর্তৃক মাকিদোনিয়া ও গ্রীস জয়
	১ম	

প্রাচীন রোম

রোমক প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার ইতালি জয়

§ ৪৫. সুপ্রাচীন কালে রোম ও সেখানে প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব

(দ্র. মানচিত্র ৮)

মনে করতে চেষ্টা করো—গ্রীসের পশ্চিম দিকে গ্রীক উপনিবেশ কোন্ কোন্ স্থানে এবং শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল (§ ৩৩, মানচিত্র ৫)।

১. আপেনাইন উপদ্বীপের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু। বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমে আরেকটি বিশাল উপদ্বীপ অবস্থিত, — তার নাম **আপেনাইন উপদ্বীপ।**

সারা উপদ্বীপ জুড়ে দেশের উপরে শিরদাঁড়ার মতো একটি গিরিশৃঙ্খমালা প্রসারিত হয়ে আছে **আপেনাইন পর্বতমালা।** গ্রীসের খাড়া পাথুরে পর্বতের চেয়ে এ পাহাড় বেশ ঢালু। পাহাড় ও সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে সাগরতীরবর্তী বিস্তীর্ণ সমভূমি।

গগনচুম্বী **আল্প্স পর্বতমালা** উত্তুরে কনকনে বাতাস থেকে দেশটিকে রক্ষা করেছে। ফলে আবহাওয়া এখানে উষ্ণ, এবং বৃষ্টিপাত গ্রীস অপেক্ষা পরিমাণে বেশি। সাগর-উপকূলের এবং পার্বত্য উপত্যকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। পাহাড়ে ঢালু অংশে প্রচুর পরিমাণে ঘন লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায় বলে তা চমৎকার পশুচারণক্ষেত্রের কাজ দেয়। গ্রীসের হতশ্রী শীর্ণ চারণক্ষেত্র দেখে দেখে অভ্যস্ত প্রাচীন গ্রীকরা এই উপদ্বীপের সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ এবং গবাদি পশুর প্রাচুর্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। উপদ্বীপের দক্ষিণাংশকে তারা ডাকতো **ইতালিয়া** বলে, যার অর্থ হচ্ছে 'গো-শাবকের দেশ'। তাদের দেওয়া এ নামটিই পরে ক্রমশঃ সমগ্র উপদ্বীপ জুড়ে চালু হয়ে যায়।

দেশটির সাগর-উপকূলবর্তী দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় স্থলবেষ্টিত উপসাগর (gulf) থাকায় পোতাশ্রয় হিসেবে তার উপযোগিতা ছিল। এ দুই অঞ্চলে দ্বীপের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম।

উপর থেকে বিহঙ্গদৃষ্টিতে দেখলে প্রাচীন রোমের দৃশ্য। (পুনঃকল্পিত রূপ।) ৮ম সংখ্যক রঙিন মানচিত্রস্থ নক্সার সাথে এই নক্সাটি তুলনা করো এবং ২৫৯-২৬২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থান বর্তমান নক্সার মধ্যে খুঁজে বের করো।

আরো দক্ষিণে উপদ্বীপটির প্রায় গা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে **সিসিলি দ্বীপ**। আপেনাইন উপদ্বীপ অপেক্ষা এই দ্বীপটি জলবায়ুর দিক থেকে অধিকতর উষ্ণ ও অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধতর।

২. রোম নগর পত্তন। পাত্রিৎসিউস্‌। আপেনাইন উপদ্বীপের মধ্যভাগে প্রবাহিত হয়েছে **তিবের্‌ (টাইবার)** নদী — পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করে সমতলভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। সমতলভূমির উপরে অনেক উঁচু উঁচু টিলা রয়েছে। প্রাচীন কালে এই সমভূমি ছিল জলাভূমি, আর টিলাগুলো ঘন বনজঙ্গলে আবৃত ছিল।

সমতলভূমিতে বসবাস করতো **লাতিন** উপজাতি। তিবের্‌ নদীর বামপার্শ্ববর্তী টিলাগুলোর উপরে, নদীমোহানা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে, একটি ছোটোখাটো শহর ছিল **রোম**। কিংবদন্তী অনুযায়ী, শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রী. পূ. ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে।

রোমের আদি অধিবাসীদের বংশধরগণ নিজেদের পরিচয় দিত প্যাত্রিৎসিউস্ (Patricius)* — **পিতৃবংশীয়**** — **বলে।** তারা চাষাবাদের জমি ও পশুচারণক্ষেত্র সহ নিজেরা নিজেদের গোষ্ঠী স্থাপন করে। পাত্রিৎসিউসদের প্রতিটি পরিবার (লাতিনে বলে familia — ফামিলিয়া) গোষ্ঠীর ব্যবহার্য সাধারণ শস্যক্ষেত্রে নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে চাষ করতো এবং গোষ্ঠীর সার্বজনীন পশুচারণক্ষেত্রে পশু চরাতো।

পাত্রিৎসিউসরা সাধারণত নিজেরাই মাঠে বা বাড়িতে নিজেদের কাজকর্ম করতো। মনিবদের সাথে দাসরাও — এদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম ছিল — কাজ করতো। দাসেরা 'ফামিলিয়ার' অন্তর্ভুক্ত লোক হিসেবে পরিগণিত হতো; নিজেদের মনিবদের সাথে এক পংক্তিভোজ্য হয়ে আহার পর্যন্ত তারা করতে পারতো।

পাত্রিৎসিউসদের ঘরবাড়ি ছিল সাদামাঠা এবং সাধারণ ধরনের। একটিমাত্র বিশেষ কামরার মাঝখানে জলাধার রেখে দেওয়া হতো। ঐ কামরার ছাদে একটু চার কোণা জায়গা অনাচ্ছাদিত ফাঁকা থাকতো, এবং ঐ ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে জলাধারে জমা হতো। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে আলোও আসতো ছাদের ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে।

পাত্রিৎসিউসদের মধ্যে বয়োপ্রবীণরা মিলে গঠন করতো 'বুড়োদের পরামর্শসভা' — লাতিন ভাষায় senatus (সেনাতুস), অর্থাৎ **সিনেট।** রোমের শাসন পরিচালনা করতেন রোমের রাজা এবং সিনেট।

৩. রোম নগর পত্তনের প্রথম কয়েক শতকে তার বৃদ্ধি। প্লেবেইউস্। রোম নগরীর অবস্থান নানান দিক থেকে সুবিধাজনক ছিল। নগরের চতুষ্পার্শ্বে ছিল উর্বর শস্যক্ষেত্র। তিবের নদীর মোহানায় ছিল বন্দর; সেখান থেকে রোমের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছিল ইতালির গভীরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সওদাগর ও কারিগরের দল ধীরে ধীরে বসত করলো রোমে এসে। রোমবাসীরা পার্শ্ববর্তী আরো ছোটো ছোটো কিছু শহর অধিকার করে তাদের কিছুসংখ্যক অধিবাসী চালান করে দিলো রোমে। দেখতে দেখতে রোমের জনসংখ্যা বেড়ে উঠলো। রোমবাসীরা কথা বলতো লাতিন ভাষায়।

রোম নগরী মোট সাতটি পার্বত্য টিলার উপর ছড়িয়ে ছিল। **কাপিতোলিউম** (capitolium) নামক **টিলার** উপরে ছিল তাদের দুর্গ। এই দুর্গপ্রাকারের আড়ালে স্থানীয় অধিবাসীরা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতো। বিভিন্ন

* লাতিন 'পাতের্' (অর্থাৎ পিতা) শব্দ থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। পাত্রিৎসিউস্‌দের গর্ব ছিল যে, তাদেরই কোনো সুদূর পূর্বপুরুষ ঐ নগর পত্তন করেছিল।

** এই কথাটি ('পাত্রিৎসিউস্', ইংরেজিতে Patrician রূপে বহুল পরিচিত) মূল অর্থে পিতৃবংশীয় বোঝালেও পরে 'সম্ভ্রান্তবংশীয়' অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। — অনু.
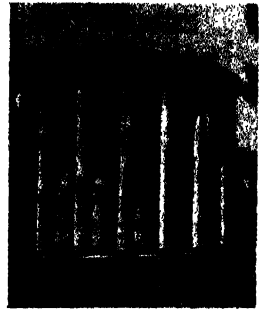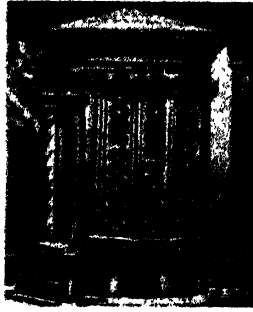
১. রোমে প্রচলিত কুঁড়েঘর। (কুঁড়েঘরের আদলে তৈরি শবভস্ম রাখার জন্য ছোট্টো কৌটো।) ২. ফোরুমে অবস্থিত মন্দিরের ছবি। ২৫৮ পৃষ্ঠার নক্সাটিতে মন্দির কোন্‌খানে রয়েছে খুঁজে বের করো। ৩. বর্তমান কালে বিদ্যমান রোমের মন্দির। (আলোকচিত্র।) ৪. কাপিতোলিউম্‌স্থিত নেকড়েমাতা। (মূর্তিটি খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের।)

টিলার মধ্যবর্তী উপত্যকার নিচু আর্দ্র ভূমিকে শুকিয়ে ফেলে সেখানে রোমকগণ ব্যবসাদির জন্য হাটবাজারের জায়গা করে নিয়েছিল; সেই জায়গাকে তারা বলতো **ফোরুম** (forum)। ফোরুম-স্থান থেকে বিভিন্ন আঁকাবাঁকা, কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে যেত চতুর্দিকে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি মাটির ও কাঠের বাড়ি গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর উপরে খড়ের চাল ছিল, কখনো-বা টালির ছাউনি। ফোরুমের চত্বরে এবং রাস্তার দুপাশে বসে কাজ করতো কর্মকার, মুচি এবং আরো নানান ধরনের কারিগরের দল।

যারা অন্য জায়গা থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করেছিল তাদের এবং তাদের বংশধরদের বলা হতো **প্লেবেইউস্‌** (Plebeius)*। এদের বেশির ভাগ ছিল গরিব লোক, অবশ্য বিত্তশালী যে একেবারে কেউই ছিল না এমন নয়। এদের কর দিতে হতো, যোগ দিতে হতো সৈন্যবাহিনীতে, অথচ সার্বজনীন শস্যক্ষেত্রে চাষবাসের জন্য এরা একটুকরো জমিও পেতো না। নির্দিষ্ট সময়ে কর দিতে না পারলে এরা দাস হিসেবে গণ্য হতো।

৪. **প্রজাতন্ত্র গঠন।** কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে এক নিষ্ঠুর রাজা রোম শাসন করতো। খ্রী. পূ. ৫০৯ সালে রোমবাসী সকলে মিলে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটায়।

এর পর থেকে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় পাত্রিৎসিউসদের মধ্য

* অর্থের দিক থেকে প্লেবেইউস (ইংরেজিতে plebeian রূপে বহুল প্রচলিত) ও পাত্রিৎসিউস শব্দদ্বয় বিপরীতার্থক। প্লেবেইউস মানে ভিড়, সাধারণ লোকজন, অনভিজাত ব্যক্তি। — অনু.

৪

থেকে দুজন শাসক — এঁদের বলা হতো **কোন্সুল** (consul) — নির্বাচন করা হতো। এক বৎসরের জন্য এই কন্সুলদ্বয় রোমের শাসনভার পরিচালনা করতেন, বিচারকার্য চালনার ভারও ছিল তাঁদের উপরে এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে তাঁরাই সেনাপতি হতেন। অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিরা অবশ্য এসব কাজে তাঁদের সাহায্য করতো, এই লোকজনও আবার প্রতি বৎসর অনুরূপ এক জনসভায় পাত্রিৎসিউসদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতো এক বৎসর মেয়াদী কাজ করার জন্য। এই এক বৎসর সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রূপে গণ্য হতেন সিনেটের সভ্যগণ যাঁদের তারা ডাকতো **সেনাতোর** (senator) বলে।

সিনেটের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। যুদ্ধবিগ্রহ যখন নেই সেরকম শান্তির সময়ে সমস্ত প্রকার কাজকর্মে কোন্সুলেরা সিনেটের পরামর্শ নিতে বাধ্য থাকতো। কোষাগার, যুদ্ধ ও দেশের শান্তিরক্ষা ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব সিনেটেই বহন করতো। কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে জনসভা আহ্বান করে নাগরিকদের তা জানিয়ে দেয়া হতো এবং জনগণও প্রায় সর্বদাই তা মান্য করতো।

পাত্রিৎসিউসগণ নিজেদের এই শাসনপরিচালনার নাম দিয়েছিল **রেস্‌পুব্লিকা** (res publica)*, অর্থাৎ — সমস্ত জনগণের রাজ। কিন্তু প্লেবেইউসগণ পূর্বের মতোই অধিকারহীন রয়ে গেল এবং প্রজাতন্ত্র গঠনের পরেও। তারা সবসময়েই তাদের অবস্থার উন্নতির দাবিতে চিৎকার করে গেছে।

* রেস্‌পুব্লিকা শব্দের অর্থ — নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র। Res publica শব্দ থেকেই ইংরেজি republic শব্দের উদ্ভব, বাংলায় আমরা যার অনুবাদ করি 'প্রজাতন্ত্র' বলে। — অনু.

রোম পত্তনের কিংবদন্তী

কিংবদন্তী অনুযায়ী, লাতিন ভাষাভাষী শহরগুলোর কোনো একটির রাজা নিজের এক আত্মীয়ার দুই শিশু পুত্রসন্তান রোমুলুস্ ও রেমুস্‌কে তিবের্ নদীর গর্ভে বিসর্জন দেবার হুকুম জারি করেন। তাঁর ভয় ছিল এরা বড়ো হয়ে তাঁর সিংহাসন কেড়ে নেবে। বিসর্জন দেবার পরে তিবের্ নদীতে বন্যা আসায় যে ঝুড়িতে শিশুদুটিকে রেখে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয় সেই ঝুড়িটি বন্যায় ভেসে গিয়ে একটা গাছের ডালে আটকে যায়। এভাবে শিশুদুটির প্রাণ বাঁচে। তার পর তারা একটি নেকড়ে বাঘের হাতে পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের দুধ খেয়েই তারা বড়ো হচ্ছিল। পরে এক রাখাল তাদের দেখতে পেয়ে স্বগৃহে নিয়ে এসে দু-ভাইকে মানুষ করতে থাকে। ভ্রাতৃদ্বয় যথারীতি প্রচণ্ড বীর ও যোদ্ধা রূপে বড়ো হয়ে ওঠে। ঐ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করে তারা রাজাকে হত্যা করে। এর পরে তারা উভয়েই নগর পত্তন করতে চায়, কিন্তু কোথায় নগর গড়া হবে এবং কে তার পরিচালনা ভার নেবে তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। কলহ চলাকালে রোমুলুস্ রেমুস্‌কে হত্যা করে বসে। যে স্থানে দুই শিশুভ্রাতাকে রাখাল খুঁজে পেয়েছিল তার নিকটে পত্তন হয় রোম (লাতিন ভাষায় যাকে বলা হয় 'রোমা' — Roma) নগরীর।

এই নগর পত্তনের কিংবদন্তীর তারিখ (খ্রী. পূ. ৭৫৩ সাল) থেকে রোমকগণ বৎসরগণনা শুরু করেছিল। রোমের কাপিতোলিউম্ টিলার উপরে নেকড়ে-জননীর মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছিল, এখন সেটি যাদুঘরে সংরক্ষিত হচ্ছে।

রোমে গল্ উপজাতির আগমন

(রোম ঐতিহাসিকদের রচনা অনুযায়ী)

উত্তর ইতালিতে বসবাসকারী যুদ্ধপ্রিয় গল্ উপজাতি খ্রী. পূ. ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে রোম আক্রমণ করে। লম্বা, ঝাঁকড়া চুলো এবং প্রকাণ্ড তরবারি ও বিরাটাকার ঢাল দ্বারা সুসজ্জিত বিশাল দেহের অধিকারী গল্‌রা দেখতে ছিল ভয়ালদর্শন। তাদের ক্ষিপ্রবেগ প্রচণ্ড আক্রমণে রোমক সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রোম দখল করে তারা নগর লুণ্ঠন করে এবং আগুনে পুড়িয়ে নগর ধ্বংস করে দেয়।

রোমবাসীদের সামান্য কিছু লোক দুর্ভেদ্য কাপিতোলিউম্ দুর্গে আশ্রয় নিয়ে গল্ আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রে পূর্ণ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গল্‌রা পাহাড়ের গা বেয়ে কাপিতোলিউম্ টিলায় গিয়ে উঠতে থাকে। দুর্গরক্ষীরা, এমন কি পাহারারত কুকুরগুলো পর্যন্ত তা টের পায় নি। শুধুমাত্র টের পেয়েছিল দুর্গস্থিত হাঁসগুলো, তারা প্রচণ্ডবেগে ডাকাডাকি করে রোমকদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। রোমকরা তখন দৌড়ে এসে শত্রুদের পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিতে শুরু করে। এই ঘটনা থেকেই পরে এ প্রবাদবাক্যের উদ্ভব হয়েছে: 'হাঁসেরাই রোম বাঁচিয়েছিল'।

গল্‌রা বলেছিল, ৩০০ কিলোগ্রামের চেয়ে বেশি সোনা যদি মুক্তিপণ হিসেবে তাদের দেয়া হয় তা হলে তারা নগর ছেড়ে চলে যাবে। যখন সোনা ওজন করা হচ্ছে সে সময়ে গল্‌দের নেতা পাশুরি সমেত পাল্লার উপরে নিজের ভারি তরবারিটি চাপিয়ে দেয়। রোমবাসীরা এর প্রতিবাদ করে উঠলে সে উত্তর দিয়েছিল: 'পরাজিতদের কপালে দুঃখই থাকে।'

অতঃপর রোমের অধিবাসীগণ দ্রুত নগর নির্মাণ শেষ করে তার চারদিকে দুর্গপ্রাচীর তুলে দিলো; সেই প্রাচীরের ভগ্নাংশ অদ্যাবধি বিদ্যমান।

১. প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইতালি ও গ্রীসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রাচীন কালে ইতালির প্রকৃতি অধিবাসীদের কোন্ কোন্ কাজকর্মের জন্য সুবিধাজনক ছিল? ২. রোমবাসীদের মধ্যে পাত্রিৎসিউস্ ও প্লেবেইউস্ নামে দুটি শ্রেণী কীভাবে উদ্ভূত হয়েছিল? প্লেবেইউসদের অবস্থা পাত্রিৎসিউস্‌দের চেয়ে কোন্ দিক থেকে ভিন্নরকম ছিল? ৩. কোন্ ধরনের রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়? রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? পৃথিবীতে প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্য কোন্ রাষ্ট্রকে তুমি প্রজাতন্ত্র হিসেবে জানো? কেনই-বা তাকে প্রজাতন্ত্র বলবে, যুক্তিসহকারে প্রমাণ করো। ৪. রোমে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোন্ শতাব্দীতে, এবং তার প্রথমার্ধে না শেষার্ধে, হয়েছিল? গ্রীসে সোলোনের সংস্কার ও রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা — এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি আগে ঘটেছিল? এবং কত আগে? *৫. ছবি ও পঠিত বিষয়বস্তুর সাহায্যে রোম নগরী প্রতিষ্ঠার পরবর্তী শতকে রোমের অবস্থা বর্ণনা করো।

§ ৪৬. খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকের মধ্যভাগে অভিজাত রোমক প্রজাতন্ত্র

(দ্র. মানচিত্র ৮)

মনে করতে চেষ্টা করো — গ্রীসে অভিজাত বলা হতো কাদের (§ ৩০-৩১:৫)।

১. প্লেবেইউস্ — পাত্রিৎসিউস্ সংঘাত। খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে প্লেবেইউসগণ শেষপর্যন্ত নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য **ম্যাজিস্ট্রেট বা ত্রিবুনুস*** নির্বাচনের (প্রতি বৎসরে একবার) দাবি আদায় করতে পেরেছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল — কোন্সুল ও সিনেট প্রদত্ত প্লেবেইউস সংক্রান্ত কোনো আদেশে **ভেটো** বা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার। লাতিনে veto শব্দের অর্থ 'নিষেধ করছি'। ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা দিনরাত্র প্লেবেইউস্‌দের জন্য খোলা থাকতো যাতে তারা প্রয়োজন পড়লেই তাঁর কাছে স্বাধিকার রক্ষার জন্য ছুটে যেতে পারে। ত্রিবুনুস্‌কে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো।

জনগণ নির্বাচিত এই ম্যাজিস্ট্রেটরাই প্লেবেইউস্‌দের অবস্থা উন্নয়নের সংগ্রামে তাদের নেতারূপে পরিগণিত হতে থাকেন। প্লেবেইউস্‌দের স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করেছিলেন এঁরা। এইসব আইন যাতে পাত্রিৎসিউস্‌গণ মেনে নিতে বাধ্য হয় তার জন্য প্লেবেইউস্‌গণ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ও খাজনা দিতে অস্বীকার করে, রোম ছেড়ে একেবারে চলে যাবে বলে ভয় প্রদর্শন করে। ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। সৈন্যবাহিনী ও রাজস্বভাণ্ডার দুর্বল হয়ে যাবার ভয়ে, অভ্যুত্থান দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় পাত্রিৎসিউস্‌রা তাদের আইন একের পর এক শিথিল করতে থাকে। প্লেবেইউস্‌গণও পাত্রিৎসিউস্‌দের মতোই রোমের সম্মানীয়

---

* লাতিন ভাষায় 'ত্রিবুনুস্' (tribunus) শব্দটি ইংরেজি অনুবাদে tribune রূপে প্রচলিত। — অনু.

১. পূর্বপুরুষদের আবক্ষ মূর্তি নিয়ে দণ্ডায়মান জনৈক রোমকের মূর্তি। রোমক মূর্তির পরিধানে 'তোগা' · বড়ো একটি চাদর। এক কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এ দিয়ে সারা শরীর আবৃত করতো। তোগা ছিল রোমকদের আনুষ্ঠানিক পোষাক। পূর্বপুরুষদের নিয়ে নিজের মূর্তি তৈরি করাতে এই রোমক ভদ্রলোক কেন চেয়েছিলেন ভেবে বলো। ২. যুদ্ধক্ষেত্রে সারবদ্ধ লেগিও। (বর্তমান কালের শিল্পীর আঁকা ছবি।) লেগিওর সৈনিকের সমর সজ্জার বর্ণনা দাও। (দ্র. ২৬৫ পৃষ্ঠা।)

নাগরিকত্ব অর্জন করে। ঋণ অপরিশোধের দায়ে রোমবাসীকে দাসরূপে গণ্য করার নিয়ম বাতিল করা হয়। কোন্সুল ও অন্যান্য উচ্চপদ লাভ এবং সার্বজনীন ক্ষেত্রে চাষাবাদের জমি পাওয়ার অধিকার প্লেবেইউস্গণ শেষপর্যন্ত অর্জন করে।

পাত্রিৎসিউস্দের বিরুদ্ধে ২০০ বৎসরেরও বেশি সংগ্রাম করার পর প্লেবেইউস্গণ জয়ী হয়; খ্রী. পূ. ৩য় শতকের প্রারম্ভে রোমের নাগরিকরূপে সর্বৈব অধিকার লাভ করে।

২. রোমে অভিজাতদের প্রভুত্ব। প্লেবেইউস্দের বিজয়ের পর মনে করা গিয়েছিল যে, যে কোনো রোমক যে কোনো রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করতে পারে এবং 'সেনাতোর'ও হতে পারে। অবশ্য এই সমস্ত পদ ছিল অবৈতনিক। ফলে দরিদ্র ব্যক্তিরা যারা সারা দিন পরিশ্রম না করলে সংসার চলে না, তারা ঐ সব পদের জন্য আকর্ষণ বোধ করতো না।

'কোন্সুল' পদসহ অন্যান্য পদ গ্রহণ করতো ধনী পাত্রিৎসিউস্ ও প্লেবেইউস্গণ যাদের জমিজমা ও দাস সবই ছিল। খ্রী. পূ. ৩য় শতকে কোনো ধনী রোমক

আর নিজের জমি নিজে চাষাবাদ করতো না। তাদের জমিতে কাজ করতো হয় দিনমজুরেরা নয় তো অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসা দাসরা।

রোমবাসীদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সমৃদ্ধ পাত্রিৎসিউস্ ও প্লেবেইউস্ পরিবার অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পরিবারগুলোরই কেউ না কেউ প্রতি বৎসরই কোনো না কোনো নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত থাকতো। 'সেনাতুস' (সিনেট) গঠিত হতো ওদের নিয়েই। এভাবেই রোমে গড়ে উঠেছিল অভিজাতসম্প্রদায়, যাদের জমিজমা ছিল, দাসদাসী ছিল এবং যারা রাষ্ট্রও পরিচালনা করতো। রোমের অন্য সাধারণ নাগরিকদের কোনো উপায়ই ছিল না 'কোন্সুল' বা 'সেনাতোর' হওয়ার।

রোম প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল কতিপয় অভিজাত দাসমালিক পরিবারের হাতে। রোম প্রজাতন্ত্র ছিল দাসমালিক ও অভিজাতভিত্তিক।

৩. খ্রী. পূ. ৩য় শতকে রোমের সেনাবাহিনী। রোম প্রজাতন্ত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সেনাবাহিনী ছিল। রোমক সেনাবাহিনী প্রধানত কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, কেন না সামরিক বাহিনীতে সে সব লোকজনদেরই নেয়া হতো যাদের নিজেদের চাষের জমি আছে।

খ্রী. পূ. ৩য় শতকে রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনপদ্ধতি

গণ-সম্মেলন	কোন্সুল	সিনেট
রোমের নাগরিকদের নিয়ে।	অভিজাতদের ভিতর থেকে নেয়া হতো।	প্রাক্তন কোন্সুল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত।
এখানে এক বৎসরের জন্য কোন্সুল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হতো। সিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বাতিল করতো।	যুদ্ধাদি পরিচালনা ও বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল এদের উপরে।	রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মের তত্ত্বাবধায়ক।

সেনাবাহিনীকে কয়েকটি লেগিওতে* বিভক্ত করা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে ৪৫০০ করে সৈন্য থাকতো। লেগিওকে আবার আরো ছোটো ছোটো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। রোমক সৈন্যেরা শুধু সমভূমিতেই নয়, বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে বা শহরের রাস্তাঘাটে সর্বত্রই যুদ্ধ করার দক্ষতা অর্জন করেছিল।

যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের প্রথম সারিতে থাকতো হালকা অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারা। সম্মুখবর্তী শত্রুবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা ধনুর্বাণ, পাথর এবং ছোটো আকারের বল্লম ছুঁড়ে মারতো। তার পরেই তারা পিছনে হটে গিয়ে সামনে যাওয়ার জন্য জায়গা করে দিত ভারি অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিকদের; এই পদাতিক বাহিনীই ছিল প্রত্যেক লেগিও-র সর্বাপেক্ষা প্রধান ও শক্তিশালী অংশ। বিপক্ষীয়দের উপর বল্লম নিক্ষেপ করে লেগিও-র সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত তরবারি হাতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। শত্রুসেনা মল্লযুদ্ধ হওয়ার মতো কাছাকাছি এসে গেলে তখন সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর অস্ত্র — ছোটো তরবারি — ব্যবহার করতো রোমক সৈন্যেরা। যুদ্ধের সময় অশ্বারোহী দল পদাতিকদের রক্ষা করতো উভয় পার্শ্বে — ডান ও বাম দিকে; যুদ্ধজয় হয়ে গেলে এরা পরাজিত শত্রুবাহিনীর পিছন পিছন তাড়া করে ছুটে যেত।

রোমক সৈন্যবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ছিল অত্যন্ত কড়া। অস্ত্র হারিয়ে ফেললে কিংবা প্রহরারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে তার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির হুকুম তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে বিনাপ্রশ্নে পালন করতেই হতো।

* লাতিনে legio, যা থেকে পরবর্তীকালে ফ্রান্সে ও বিলেতে সমরসংক্রান্ত শব্দ হিসেবে legion কথাটির উদ্ভব ঘটে। — অনু.

১. যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তী। (প্রাচীন চিত্র।) হাতির পিঠে যোদ্ধার জন্য তৈরি হাওদা, হাতির স্কন্ধদেশে বসে আছে মাহুত।) ২. সম্রাট পিরুস। (প্রাচীন আবক্ষ মূর্তি।)

৪. রোমের ইতালি জয়। জমি দখল করার উদ্দেশ্যে রোমবাসীরা প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। আপেনাইন উপদ্বীপে কমপক্ষে অন্তত ১২টি জাতি বসবাস করতো, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই শত্রুতা লেগে ছিল। তাদের সাথে রোমের সংগ্রাম চলেছিল দু'শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে। রোমের লেগিও বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকে শত্রু অপেক্ষা উন্নততর ছিল; প্রতিবেশী উপজাতিগুলোর বাহিনী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়ায় রোমের যুদ্ধাভিযান তারা প্রতিহত করতে পারে নি। ইতালির বিভিন্ন জাতিকে একের পর এক ক্রমান্বয়ে পদানত করেছিল রোম। বিজিতদের দুই-তৃতীয়াংশ শস্যক্ষেত্র ও পশুচারণভূমি রোমবাসীরা দখল করে নেয়। দখলকৃত এইসব জমির বেশির ভাগ আবার চলে যায় অভিজাতদের হাতে। আর বাকি যা থাকে তার উপরে সিনেট যাদের জমিজমা কম সেরকম রোমবাসী কৃষকদের বসিয়ে দিয়ে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। বিজিত অঞ্চলগুলোয় গড়ে তোলা উপনিবেশগুলো রোমের আধিপত্যের খুঁটি হিসেবে কাজ করতো। বিজিত জাতিগুলোর মধ্যে একেকে অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ঝগড়াবিবাদ জীইয়ে রাখতো সিনেট; উদ্দেশ্য — যাতে সকল সুসংহত হয়ে সম্মিলিতভাবে রোমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে। সিনেটের নীতি ছিল: 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল'*।

খ্রী. পূ. ৩য় শতকের প্রথমার্ধে ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত গ্রীক শহরগুলো রোম জয় করে নেয় এবং তার পর ধীরে ধীরে সমগ্র আপেনাইন উপদ্বীপ জয় করে।

* Divide and rule — লাতিনে 'দিভিদে এৎ ইম্পেরা' (divide et impera)। বাংলায় চালু এই ইংরেজি প্রবচনটি সরাসরি লাতিন প্রবচনের অনুবাদ। — অনু.

রোমের আধিপত্য সিসিলি দ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে এখানে তাদের সাথে আরেক শক্তিশালী পররাজ্যলোভী প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজ নগরীর সংঘর্ষ বাধে।

'পিররুসের বিজয়'

(প্লুতার্ক অবলম্বনে)

পিররুসের (Pyrrhus) সাথে যুদ্ধে রোমের জয়লাভের মূল কারণ কী ছিল?

রোম যখন ইতালির দক্ষিণে গ্রীক শহরগুলোর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখন বলকান উপদ্বীপের ছোটো একটি রাজ্যের রাজা পিররুস্ গ্রীকদের সাহায্য করার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। পিররুসের সৈন্যবাহিনীতে ২২ হাজার পদাতিক, ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনা এবং ২০টি হাতি ছিল।

যুদ্ধে হস্তীযূথ রোম সেনাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং পায়ের তলায় পিষে তাদের বহু সৈন্য মেরে ফেলে। হাতির পিঠে চড়ে সৈন্যেরা শত্রুপক্ষীয় রোমক সেনাদের উপর শর ও বল্লম নিক্ষেপ করতে থাকে। পিররুসের বাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয় ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধে যে পরিমাণ বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তাতে পিররুস আর্তনাদ করে উঠেছিলেন: 'আর একটিমাত্র যুদ্ধজয়ের পরেই তো দেখছি আমার আর কোনো বাহিনীই থাকবে না!' তাঁর এই আক্ষেপোক্তি থেকেই 'Pyrrhic victory' — অর্থাৎ পিররুসের বিজয় — প্রবচনটি এসেছে, যার অন্তর্নিহিত মর্মকথা হলো: বিপুল ক্ষতির বিনিময়ে অর্জিত জয়, যখন জয়ের কোনো আনন্দ বা অর্থ থাকে না।

রোমকরা নতুন করে আরো সৈন্য সমাবেশ করে নিজেদের বাহিনী পুনর্গঠন তো করেছিল, নিজেদের সেনাবাহিনীর আয়তনও তারা বাড়িয়েছিল। রোমের সাথে লোকে তুলনা করতো হিদ্রার*, যার মাথা কেটে ফেলামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি নতুন মাথা গজিয়ে উঠতো।

সর্বশেষ যুদ্ধে রোমবাসীরা হাতির পায়ের নিচে বড়ো বড়ো পেরেক-পোঁতা তক্তা ফেলে দিয়ে, বিশালাকার কাঠের গুঁড়ি ও জ্বলন্ত ফেঁসো বাঁধা তীর নিয়ে হাতিগুলোকে এমন তাড়া করে যে, ভয় পেয়ে ঐ দৈত্যাকার জন্তুগুলো নিজের সৈন্যদের পদতলে ছিন্নভিন্ন করে দৌড়ে পালাতে থাকে। পিররুসের বাহিনী এভাবে তছনছ হয়ে যায়। কিছু গ্রীক শহর বিনাযুদ্ধে রোমক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর অন্যগুলো প্রচণ্ড আক্রমণে দখল করে নেয় রোমের সৈন্যদল।

? ১. খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ থেকে খ্রী. পূ. ৩য় শতাব্দীর মধ্যে রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন এসেছিল? ২. খ্রী. পূ. ৩য় শতকে রোমে এবং খ্রী. পূ. ৫ম শতকে আথেন্সে রাজ্যশাসন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল কোথায়? তফাৎই-বা ছিল কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে? 'অভিজাত প্রজাতন্ত্র' কথাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। ৩. খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ও খ্রী. পূ. ৩য় শতকের মধ্যভাগে রোমের রাষ্ট্রসীমা মানচিত্রে দেখাও। রোমের জয়লাভের পিছনে কী কী কারণ সক্রিয় ছিল? ৪. ইতালির বিজিত জাতিগুলোর উপর নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব কীভাবে রোম বজায় রেখেছিল?

* হিদ্রা (Hydra): গ্রীক পুরাণে বর্ণিত মহানাগ। কোনো কাহিনী মতে সর্পটির মাথা ছিল সাতটি, কোনো মতে পঞ্চাশটি। একটি মাথা কেটে ফেলামাত্রই সে স্থানে সঙ্গে সঙ্গে দুটি মাথা গজিয়ে উঠতো। মহাবীর হেরাক্লেস এই সর্প সংহার করেন। — অনু.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরীয় পরাক্রমশালী দাসরাষ্ট্রে রোমক প্রজাতন্ত্রের পরিণতি লাভ

§ ৪৭. পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য লাভের জন্য রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ

(দ্র. মানচিত্র ৯ এবং ২৭১ পৃষ্ঠার মানচিত্র)

মনে করতে চেষ্টা করো—গ্রীক শহরগুলো ছাড়া আর কোন্ কোন্ শহর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল (§ ১৬:৩)।

১. কার্থেজ নগরী ও তার অধীনস্থ এলাকা। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাংশে সমুদ্রোপকূলে ফিনিসীয়রা **কার্থেজ** নগরী পত্তন করেছিল। সমুদ্রের ভিতরে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত প্রস্তরময় অন্তরীপে এই নগর অবস্থিত ছিল।

সমুদ্রপথে বাণিজ্যের জন্য কার্থেজের খ্যাতি ছিল। গভীর সমুদ্রের উপর নির্মিত তার বন্দরে সর্বদা জাহাজের ভিড় লেগে থাকতো, আর সমুদ্রতীরের দোকান পসারীতে জিনিসপত্রের পাচুর্য ছিল দেখবার মতো। জাহাজের মাঝিমাল্লা এবং বন্দরের খালাসীরা ছিল দাস।

কার্থেজ নগরীর চারপাশের অত্যন্ত উর্বর জমি ধনী দাসমালিকরা ভোগ করতো। তাদের জমিজমা চাষ, আঙুরক্ষেত দেখাশোনা করতো দাসেরা; কয়েকজন করে দাস একত্রিত করে তাদের কোমরে শিকল বেঁধে দেওয়া হতো।

অত্যন্ত শক্তিশালী নৌবাহিনী ও বিশাল সৈন্যদল ছিল কার্থেজের। সৈন্যেরা প্রধানত ছিল ভাড়াটে যোদ্ধা। উঁচু উঁচু মিনার সমেত পাথরের তৈরি দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার শহরটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতো। **কার্থেজবাসীরা** সমুদ্রোপকূলবর্তী বহু এলাকা ও দ্বীপ নিজেদের অধিকারে এনেছিল। সমগ্র পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিল তারা।
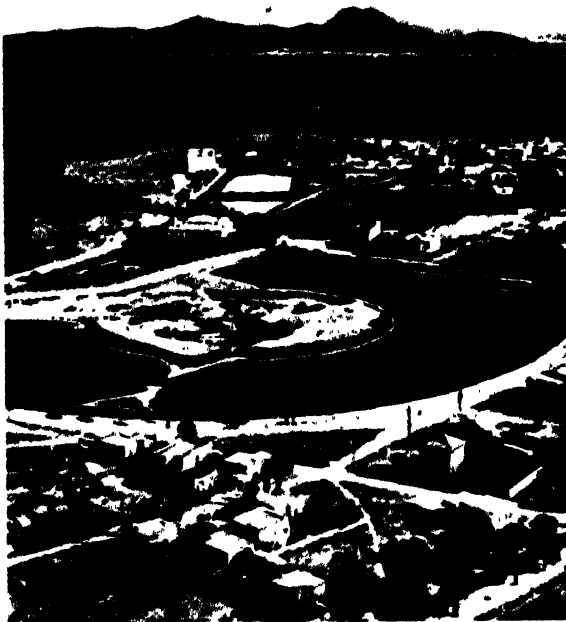
প্রাচীন কালে যেখানে কার্থেজ নগরী অবস্থিত ছিল সেই অন্তরীপ। লক্ষ্য করে দেখ, উপসাগরটি কীভাবে স্থলভূমির বহু গভীরে প্রসারিত হয়ে গেছে।

২. যুদ্ধের শুরু। সিসিলি দ্বীপ দখলের জন্য রোম ও কার্থেজ উভয় নগরীই চেষ্টা শুরু করলে, শেষপর্যন্ত খ্রী. পূ. ২৬৪ অব্দে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধকে বলা হয় **পুনিক যুদ্ধ**, কেন না কার্থেজবাসীদের বলা হতো **পুনিকুস্***। এ যুদ্ধ চলেছিল ২০ বছরেরও বেশি এবং পরিশেষে রোম জয়লাভ করে। সিসিলি, সার্দিনিয়া ও কোর্সিকা দ্বীপগুলো রোমের অধীনে চলে আসে।

এতদ্সত্ত্বেও কার্থেজের শক্তি যে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়েছিল, তা নয়। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার জন্য উভয় পক্ষই নতুন করে প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

স্পেনের উপরে কার্থেজ ভালভাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে কার্থেজবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন তরুণ সেনাপতি **হানিবল**। তাঁর সৈন্যপরিচালনা কৌশল এবং অসাধারণ শৌর্যবীর্য শত্রুরা পর্যন্ত স্বীকার করতো।

* রোমকগণ কার্থেজবাসীদের ডাকতো punicus বলে, তাই এ যুদ্ধের নামকরণ রোমকদের তরফ থেকে এভাবে করা হয়েছিল যার সাদামাঠা অর্থ দাঁড়ায় — পুনিকুস্দের সাথে লড়াই। ইংরেজিতে এই যুদ্ধকে Punic War বলা হয়। — অনু.
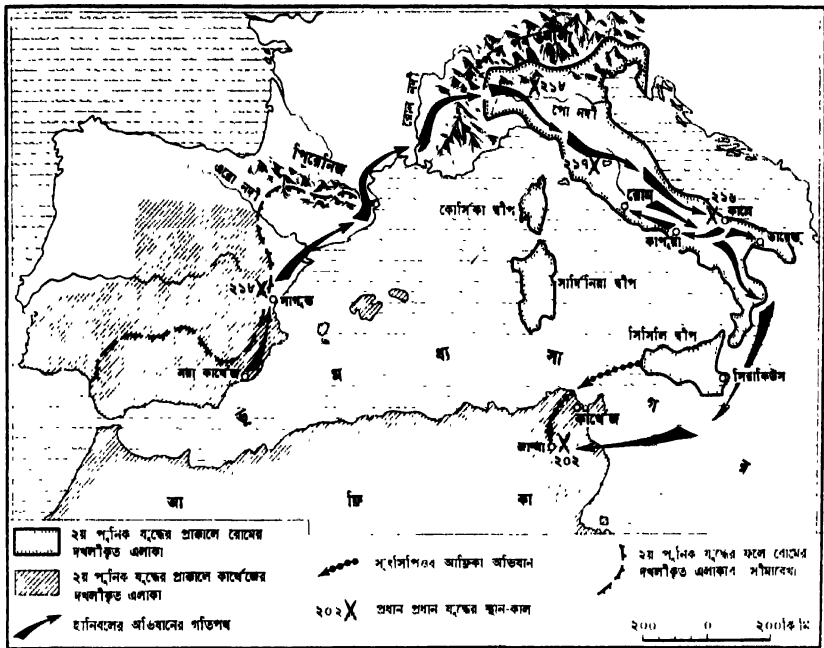
দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ।

৩. হানিবলের ইতালি অভিযান। খ্রী. পূ. ২১৮ সালে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কার্থেজ স্পেনের ভূমি দখল করায় এই যুদ্ধ বাধে। **দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ শুরু হলো।** তুষারাবৃত পার্বত্যপথ দিয়ে আল্প্স পর্বত অতিক্রম করে হানিবল তাঁর বাহিনী নিয়ে ইতালিতে গিয়ে পৌঁছুলেন; রোমকদের জন্য এ ছিল একেবারে কল্পনার বাইরে। হানিবলের কার্থেজী সৈন্যদলের অর্ধেক পর্বত অতিক্রম করার পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সৈন্যদলে যারা সুস্থ ছিল তাদের নিয়ে হানিবল উত্তর ইতালির **পো** নদীর অববাহিকা অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। উত্তর ইতালির অধিবাসী **গল্ উপজাতি** হানিবলের দলে যোগ দেওয়ায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা রীতিমতো বেড়ে গেল।

কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ের পরে কার্থেজ-বাহিনী রোমের লেগিওকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। রোম কর্তৃক বিজিত জাতিগুলোকে নিজের পক্ষে টেনে আনার সদিচ্ছায় হানিবল নিজের বাহিনী নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সমগ্র ইতালি অতিক্রম করলেন।

৪. কান্নে-র যুদ্ধ। খ্রী. পূ. ২১৬ অব্দে **কান্নে** (Cannae) নামক এক স্থানে রোম ও কার্থেজ বাহিনী পুনর্বার মুখোমুখি হলো। রোমের বাহিনীতে ছিল ৮০

হাজার পদাতিক ও ৬ হাজার অশ্বারোহী সেনা; অন্যপক্ষে কার্থেজীদের ছিল ৪০ হাজার পদাতিক ও প্রায় ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

রোমের কোন্সুলেরা চেয়েছিল তাদের বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে শত্রুসেনার উপর প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুবাহিনী ছিন্নভিন্ন করে দিতে। তারা নিজেদের বাহিনী চতুর্ভুজ আকারে সারবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছিল। আর অশ্বারোহী সেনা পদাতিক বাহিনীর দুপাশে পার্শ্ববাহিনী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল (দ্র. মানচিত্র ৯)।

হানিবল জানতেন যে, শত্রুবাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁর সৈন্যদল বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি নিজেদের বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ ও পার্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য শত্রুপক্ষকে দৌড় করানো যায়, তা হলে তারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে। এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করলেন — রোমের বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। নিজের বাহিনীকে অর্ধচন্দ্রাকারে এমনভাবে সাজালেন যে পিঠের দিকটা থাকে শত্রুর মুখোমুখি, আর দুপাশে রাখলেন শ্রেষ্ঠ কিছু পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী।

রোমের পদাতিক বাহিনী সামনে এসে আঘাত করলো। কার্থেজ-বাহিনীর মধ্যভাগে আঘাত করে রোম-বাহিনী অগ্রসর হয়ে ঢুকে পড়ার ফলে তাদের উভয় পার্শ্ব অরক্ষিত হয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হানিবলের পার্শ্ববাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনারা দুপাশ থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কার্থেজের অশ্বারোহী বাহিনী রোমের অশ্বারোহী বাহিনীকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলো। রোমের পদাতিক বাহিনীর বিন্যাস এতে ভেঙে গিয়ে সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগলো, ওদিকে ততক্ষণে হানিবলের সেনাদল চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলেছে। চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে অসহায়ভাবে মার খাওয়া ছাড়া রোম-বাহিনীর আর গত্যন্তর রইলো না। কার্থেজ-বাহিনী শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ৭০ হাজারের মতো যোদ্ধাকে বন্দী করলো।

৫. যুদ্ধের শেষ পর্যায়। কান্নের যুদ্ধে কার্থেজীরা জয়লাভের পর রোমের পদানত ইতালির বহু শহর হানিবলের পক্ষে চলে আসে। রোমের অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায়। এতেও কিন্তু সিনেট কার্থেজীয় দূতের সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয় না।

কার্থেজ-বাহিনী রোমের কাছে এসে পৌছুলো। কিন্তু হানিবলের বাহিনীর শক্তি ততদিনে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তার দ্বারা বিশাল দুর্ভেদ্য নগরী রোম আক্রমণ ও দখল করা অসম্ভব। হানিবল পুনরায় ইতালির দক্ষিণ দিকে সরে গেলেন।

এদিকে রোমবাসীরা পুনরায় সংগঠিত হতে লাগলো: যুদ্ধে সক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হলো, সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো আড়াই লক্ষ। রোমক সেনাপতিরা বড়ো ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে শত্রুসৈন্যের ছোটোখাটো

১ ২ ৩
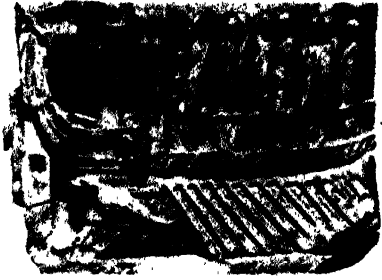
১. হানিবল। ২. স্কিপিও। (প্রাচীন আবক্ষ মূর্তি।) ৩. রোমের যুদ্ধজাহাজ। (রিলীফ।) জাহাজের সম্মুখভাগে চলাফেরার সরু পথ, তারও অগ্রভাগে তীক্ষ্ণধার 'চঞ্চুদেশ' বসানো। এর নাম ছিল 'কাক'। শত্রুপক্ষীয় জাহাজ নিকটবর্তী হলেই রোমক যোদ্ধারা ছুঁড়ে দিত 'কাক' যা তার চঞ্চুদেশ দিয়ে ডেকের উপর ছোঁ মারতো। রিলীফে দেখা যাচ্ছে—শত্রুপক্ষীয় জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত যোদ্ধৃদল।

দল দেখতে পেলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো, যে সব শহর কার্থেজ-বাহিনীর পক্ষে চলে গিয়েছিল সেগুলো পুনরায় দখল করা শুরু করলো। এধরনের খণ্ডযুদ্ধ হানিবলের কাছে সুস্পষ্ট ধ্বংসের লক্ষণ মনে হলো; ওদিকে কার্থেজ থেকে তেমন কোনো সাহায্যও এসে পৌঁছছিল না যাতে তাঁর সমরশক্তি তিনি বাড়াতে পারেন। এভাবে রোমের শক্তি যত বাড়তে লাগলো, তাঁর সৈন্যদলের সামর্থ্য তত কমে যেতে লাগলো।

৬. যুদ্ধ শেষ। কান্নের যুদ্ধ শেষ হবার ১২ বৎসর পর রোম তার বাহিনী নিয়ে আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হলো। এবারের অভিযান অভিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতি স্কিপিও (Scipio) পরিচালনা করলেন। কার্থেজকে রক্ষা করতে হলে ইতালি ছেড়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল হানিবলের পক্ষে।

ফের যুদ্ধ বাধলো কার্থেজের অনতিদূরে জাম্মা (Zamma) শহরের কাছে, খ্রী. পূ. ২০২ সালে। এবারের যুদ্ধে রোমকদের অশ্বারোহী বাহিনী সংখ্যায় শত্রুপক্ষের চেয়ে বেশি ছিল। রোম ও কার্থেজের পদাতিক বাহিনীর মধ্যে সুদীর্ঘ ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে রোমের অশ্বারোহী বাহিনী পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুসৈন্যের উপর। হানিবলের বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ শেষ হয়েছিল খ্রী. পূ. ২০১ অব্দে। রোমের কাছে কার্থেজ তার যুদ্ধজাহাজ সমর্পণ ছাড়াও বিপুল পরিমাণ অঙ্কের যুদ্ধপণ দিতে বাধ্য হলো; কার্থেজের আধিপত্য প্রায় আর কোথাও রইলো না।

হানিবল দেখলেন, কার্থেজ ছেড়ে মধ্য প্রাচ্যের কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। সিনেট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার হুকুম জারি করলো। শত্রুর হাতে তিনি ধরা দিতে চান নি; বাড়ির চতুর্দিক শত্রুসৈন্যবেষ্টিত দেখে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন।

রোমের কার্থেজ জয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ইতালির কৃষকসম্প্রদায়; রোম-বাহিনীতে তাদেরই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং শত্রুসেনার সাথে প্রচণ্ড সাহস ও বিক্রমে তারা যুদ্ধ করেছিল।

হানিবল সম্পর্কে প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিক

হানিবল যতখানি সাহসের সাথে বিপদের ঝুঁকি নিতেন, ঠিক ততখানিই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন সেই বিপদ উপলব্ধি করার জন্য। এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না যার সামনে তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে নতিস্বীকার করেছেন। কি দুর্বিষহ গরমে, কি অসহ্য তুষারহিমে তিনি সর্ব অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকতেন; নরম বিছানায় কখনো শয্যাগ্রহণ করতেন না, যুদ্ধের পোষাক গায়ে জড়িয়ে তিনি প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যেই শুয়ে পড়তেন। যুদ্ধে তিনি নিজে থাকতেন অগ্রভাগে, আর যুদ্ধ শেষের পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতেন সবচেয়ে শেষে। হানিবলের অধীনে সৈন্যবাহিনী যে পরিমাণ আত্মবিশ্বাস ও সাহস অনুভব করতো তেমন আর কখনো আর কারোর সেনাপত্যে তারা বোধ করে নি।

? ১. প্রথম ও দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের কারণ কী? দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘটার পিছনে কোন্ কারণ সক্রিয় ছিল? ২. রোম কার্থেজ জয় করতে পেরেছিল কী কী কারণে? ৩. দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ কোন্ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল এবং পরিণামে রোম কর্তৃক কোন্ কোন্ অঞ্চল অধিকৃত হয়, তা ৯ নং মানচিত্রে দেখাও। ৪. এখন থেকে কত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল? দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ এবং আলেকজান্ডার দি গ্রেটের এশিয়া অভিযান — এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি পূর্বে ঘটেছিল? এবং কত বছর পূর্বে? *৫. হানিবলের সৈন্য পরিচালনদক্ষতার পরিচয় তুমি কীসে দেখতে পাচ্ছ?

§ ৪৮. খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে রোম কর্তৃক বিভিন্ন দেশ দখল

(দ্র. মানচিত্র ৯)

মনে করতে চেষ্টা করো — আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্যের পতন ঘটার ফলে কোন্ রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছিল (§ ৪৩:৫, মানচিত্র ৭)।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধে রোম তার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছিল। এই যুদ্ধজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আরো নতুন নতুন দেশ দখলের পথ তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল।
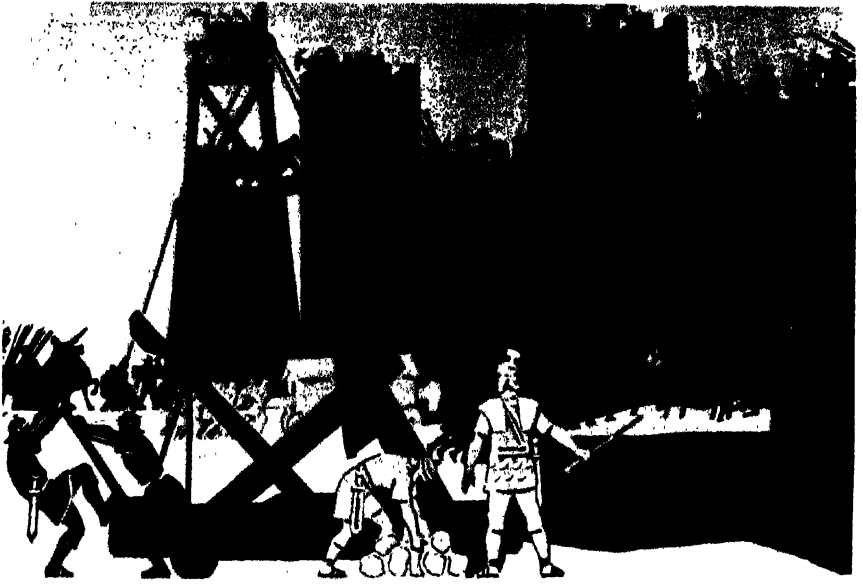
রোম বাহিনীর নগর অবরোধ। (আধ্নিক শিল্পীর আঁকা ছবি।) সম্মুখভাগে—ক্ষেপণাস্ত্র। প্রাচীর ভাঙার যন্ত্র দিয়ে অবরোধকারীরা দুর্গ ভাঙছে। দূরে — রথচক্রের উপরে স্থাপিত কাঠের তৈরি এবং ধাতব পাতে মোড়াই করা মিনার। এই মিনারকে শত্রুপক্ষীয় দুর্গপ্রাচীরের গায়ে লাগিয়ে যোদ্ধারা মিনার থেকে প্রাচীরের উপরে মই তক্তা ফেলে দেয়, তার পর তক্তার উপর দিয়ে দুর্গপ্রাচীরে গিয়ে ওঠে। সৈন্যেরা মইয়ের সাহায্যে পাঁচিল বেয়ে দুর্গের উপরে গিয়ে উঠছে।

১. কার্থেজ ধ্বংস। নৌবাহিনী ও পদাতিক বাহিনী হারাবার পর কার্থেজ আর রোমের কাছে বিপদস্বরূপ ছিল না। অবশ্য কার্থেজ তার নৌবাণিজ্য আগের মতোই চালু রেখেছিল এবং পুনরায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছিল। রোমের অভিজাতসম্প্রদায় ও বণিকের দল তখন চাইলো তাদের ঘৃণ্য এই শহরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে এর ধনসম্পদ দখল করে নিতো। কার্থেজের অনমনীয় শত্রু জনৈক প্রভাবশালী সেনাতোর তো তাঁর সব সব বক্তৃতাই শেষ করতেন এই বলে: 'কার্থেজকে ধ্বংস হতেই হবে।'

খ্রী. পূ. ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমক বাহিনী পুনরায় আফ্রিকার মাটিতে অবতরণ করে কার্থেজ অবরোধ করলো। শুরু হলো **তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ**। যদিও রোমের চেয়ে কার্থেজের শক্তিসামর্থ্য তখন অনেক কম, তবু কার্থেজী জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে, বারংবার বিধ্বস্ত দুর্গকে বারংবার নির্মাণ করে তারা নিজেদের মাতৃভূমি কার্থেজ নগরীকে বীরত্বের সাথে তিন বৎসর পর্যন্ত রক্ষা

১. কার্থেজের যুদ্ধ। (আধুনিক শিল্পীর আঁকা ছবি।) সম্মুখভাগের ছবিতে দেখা যাচ্ছে—ভবনের সামনে কার্থেজী জনগণ প্রবেশ পথ রক্ষা করছে। ভিতরের দিকে—রোম সেনারা এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে কাঠের বীম ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ভবনের প্রহরীরা প্রায় অগ্নিবেষ্টিত হয়ে পড়লেও সমানে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ২. কোরিন্থের ধ্বংসাবশেষ। (আলোকচিত্র।) স্তম্ভগুলো অ্যাপোলো মন্দিরের। রোমকগণ কোরিন্থ ধ্বংস করে দিলে শহরটির মধ্যে এই স্তম্ভগুলো ছাড়া প্রায় আর কিছুই টিকে ছিল না।

করতে পেরেছিল। সমস্ত মেয়ে তাদের লম্বা চুল ছেঁটে ফেলে সেই চুল দিয়ে তারা নিক্ষেপাস্ত্রের জন্য দড়ি তৈরি করেছিল।

একমাত্র কেবল যখন অবরুদ্ধ কার্থেজবাসী অন্নাভাব ও রোগে অশক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়লো, তখনই শুধু রোমক বাহিনী নগর অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। অগ্নিসংযোগের ফলে কার্থেজ দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো। আগুনের ধোঁয়ায় অন্ধকার ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটে কার্থেজী জনগণ নগররক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলো। শহরের মধ্যে এক সপ্তাহ ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এমন কি রাত্রেও যুদ্ধ বন্ধ হয় নি, জলন্ত নগরীর অশুভ আলোয় শত্রুরা যুদ্ধ চালিয়েছিল। (দ্র. উপরের ছবি।) রোমের সিনেটের আদেশে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো কার্থেজকে, রোমের বাহিনী নগরের সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য ও মজবুত ঘরবাড়ি যেগুলো ছিল, সেগুলো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং ৫০ হাজার কার্থেজবাসীকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

২. সিরীয় সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরাজয়। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমোপকূলবর্তী অঞ্চলে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে ক্ষান্ত হয় নি রোমবাসী। তারা বলকান উপদ্বীপ ও এশিয়া মাইনরেও অভিযান চালায়।

প্রাচ্য অভিমুখে রোমের অগ্রসরণের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিশাল সিরীয় সাম্রাজ্যের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধে। সিরিয়া-সম্রাটের ছিল বিরাটায়তন সৈন্য দল, হস্তীবাহিনী, তীক্ষ্ম অস্ত্রযুক্ত রথচক্র এবং উষ্ট্রবাহিনী। সম্রাট কর্তৃক বিজিত বহু জাতির লোক নিয়ে তাঁর এই বিশাল সামরিক বাহিনী সংগঠিত ছিল। এশিয়া মাইনরে রোমক বাহিনীর সাথে সংগ্রামে তা নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর সম্রাট সম্পূর্ণরূপে রোমের কাছে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেন এবং অতঃপর তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়।

৩. গ্রীস ও মাকিদোনিয়া জয়। বলকান উপদ্বীপে রোম তার নীতি হিসেবে দক্ষতার সাথে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসি গ্রহণ করেছিল। মাকিদোনিয়ার সাথে সংগ্রামে রোম গ্রীকদের স্বপক্ষে টেনে এনেছিল এই আশ্বাস দিয়ে যে গ্রীসকে রোম স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার যুদ্ধে মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস আর রোমক লেগিও সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বল্লম সুসজ্জিত ফালাঙ্গোস বাহিনী ছিল অজেয়।

রোমক বাহিনীর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে তারা পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং শত্রুবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু এর ফলে তারা নিজেরা আবার কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, আর সেই সুযোগে রোমের ক্ষিপ্রগতি সৈন্যরা শত্রুব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সুদীর্ঘ বল্লম তখন আর কোনো কাজ দেয় না; মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস বাহিনী পরাজয় বরণ করে। এভাবে রোম মাকিদোনিয়া জয় করে নিল।

মাকিদোনীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরা নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলো। অবিলম্বে রোম তখন তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে খ্রী. পূ. ১৪৬ অব্দে গ্রীসের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করলো। রোমকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করার শাস্তিস্বরূপ রোম গ্রীক সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র কোরিন্থ নগরী একেবারে ধ্বংস করে দেয়। কোরিন্থের সমগ্র অধিবাসী দাসে পরিণত হয়।

৪. বিজিত দেশে রোমের ধ্বংসলীলা। রোম কর্তৃক বিজিত সমস্ত দেশেই চলতো ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। রোমবাসীরা বন্দীদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। কোনো অভিযানে সৈন্যবাহিনীর পিছু পিছু যেত, কেন না সেনাবাহিনীর হাত থেকে তারা যুদ্ধবন্দীদের কিনে নিত পরে বাজারে বিক্রির জন্য। একবার তো এক অভিযানের পরে দেড় লক্ষ লোককে দাসরূপে বিক্রয় করেছিল রোমবাসী।

কোনো শহর অধিকার করার পর সাধারণত সেনাপতি নগর লুণ্ঠনের হুকুম দিত। লুণ্ঠিত বস্তুর একাংশ যেত রোমের রাজকোষে। বাকি যা থাকতো তা ভাগাভাগি হতো যোদ্ধা ও তাদের অধিনায়কদের মধ্যে। সেনাপতিরা যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরতো রীতিমতো ধনী হয়ে।

. বিজয়ী সেনাপতি সম্বর্ধিত হতো **ত্রিউম্ফুস্-য়ের** মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর সেনাপতিরূপে বাহিনীর অগ্রভাগে রথে চড়ে (এই রথ টানতো চারটি সাদা ঘোড়া) আনুষ্ঠানিকভাবে রোম নগরীতে এসে প্রবেশ করতো বিজয়ী সেনাপতি — এই অনুষ্ঠানটিকে তারা বলতো ত্রিউম্ফুস্*। এর অগ্রভাগে সার বদ্ধভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো শৃঙ্খলাবদ্ধ যুদ্ধবন্দীদের এবং লুণ্ঠনের ফলে অর্জিত ধনসম্পদাদি (দ্র. রঙিন ছবি ১৭)।

৫. রোমের অধীনস্থ প্রদেশগুলোর অবস্থা। রোম যে সমস্ত দেশ জয় করতো তাদের বলা হতো — **প্রোভিন্‌ৎসিয়া** (provincia), অর্থাৎ প্রদেশ। সে সব দেশের খনিজ সম্পদ, লবণখনি, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সবচেয়ে ভাল শস্যক্ষেত্র ও পশুচারণভূমি

* **ত্রিউম্ফুস্** (triumphus) শব্দ থেকেই আমাদের পরিচিত ইংরেজি triumph শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। মৌলিক অর্থ: প্রাচীন রোমে বিজয়ী সেনাপতির সম্মানার্থে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা। — অনু.

সবই রোমকদের অধিকারে চলে আসতো। প্রোভিন্‌ৎসিয়ার অধিবাসীদের উপর বিপুল পরিমাণ কর ধার্য করা হতো। যারা কর দিতে অক্ষম হতো তাদেরকে সপরিবারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হতো।

রোম-অধীনস্থ প্রদেশসমূহ শাসন করতো সিনেটপ্রেরিত শাসক। শাসকরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। প্রদেশে ৩-৪ বছর কাটাতে পারলেই তারা বিপুল পরিমাণ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। এরকম একজন শাসক সম্বন্ধে লোকে বলতো: 'ধনী দেশটায় লোকটা এসেছিল গরিব, আর যাচ্ছে বড়োলোক হয়ে দেশটাকে গরিব করে দিয়ে।'

সারা এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়তে লাগলো। এশিয়া মাইনরের ছোটো রাজ্যের রাজা রোমের বশ্যতা স্বীকারের পর বলে দিয়েছিল যে, তার প্রজাদের মধ্যে যত বয়স্ক পুরুষ আছে সকলেই দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে।

খ্রী. পূ. ২য় শতকে বহু আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে রোম এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের বহু জাতি রোমের বশ্যতা স্বীকার করে।

মাকিদোনিয়া জয়ের পর রোমের অনুষ্ঠিত ত্রিউম্ফুস্ সম্বন্ধে প্লুতার্কের বর্ণনা

নিম্নলিখিত প্রামাণ্য আলেখ্যের ভিত্তিতে রোমক বাহিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন্ সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি?

সব রাস্তাতেই যেখান থেকে শোভাযাত্রা দেখা সম্ভব, সেখানেই জনগণ সমবেত হয়েছিল। প্রথম দিন ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতেই লুণ্ঠিত প্রস্তরমূর্তি ও ছবি ভর্তি আড়াই শ'টা গাড়ি আসতে শুরু করলো।

পরের দিন নগরের পথে পথে সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান মাকিদোনীয় অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা গাড়ি দেখা গেল। তামা ও লোহার তৈরি পরিষ্কার অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঝকঝক করছিল। সেগুলোর মাঝখানে তরবারি ও বল্লমের খোঁচাখোঁচা মাথা দেখা যাচ্ছিল। এর পিছুপিছু সাড়ে সাত শ' ঘট ভর্তি রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চারজন করে লোক একেকটা ঘড়া বইছিল। তারও পিছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রৌপ্যনির্মিত বিশালাকার ভারি ভারি পেয়ালা ও পাত্র।

তৃতীয় দিন নিয়ে আসা হলো বলিদানের জন্য ১২০টি মোটাসোটা বৃহদাকার ষাঁড়, তাদের শিং সোনালী রঙে রঞ্জিত। দূরে দেখা গেল, নিয়ে আসছে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি ৭৭টি ঘড়া, আগেরগুলো যেমন ছিল সেরকমই আকারে বৃহৎ। এসবের পিছন পিছন আসছিল লোকজন, তাদের মাথার উপরে মূল্যবান প্রস্তরখচিত খাঁটি সোনার তৈরি বিরাটাকার পাত্র আর থালাগুলো তারা তুলে ধরেছিল। এসবেরও পিছনে আসছিল মাকিদোনীয় সম্রাটের রাজশকট, তাতে রাজার অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি, আর তার উপরে শোভা পাচ্ছিল তাঁর রাজমুকুট।

এই রথের পিছনে নিয়ে আসা হচ্ছিল রাজার সন্তানদের—দুই রাজকুমার ও এক রাজকুমারীকে। তাদের বয়স এত কম যে, কী দুঃখের দিন শুরু হয়েছে তাদের জন্য সেকথা বুঝতে পারার কথা নয়। তাদের পিছুপিছু আসছিলেন কালো পোষাক পরিহিত সম্রাট। এই সর্বনাশে তিনি যেন বোধশক্তিরহিত হয়ে গেছেন।

১

২

৩

অত্যন্ত অলঙ্কৃত জাঁকজমকপূর্ণ শকটে চড়ে চলেছিলেন স্বর্ণখচিত লাল পোষাক পরিহিত সেনাপতি। আর তাঁর পশ্চাতে চলেছিল তাঁর সৈন্যদল, হাতে তাদের তেজপাতা গাছের ডাল*, মুখে গান।

?

১. তৃতীয় পুনিক যুদ্ধের বিবরণ পাঠের সময়ে কোন্ পক্ষের প্রতি তোমার সহানুভূতি জাগে? কেন? প্রথম ও দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সাথে তৃতীয় যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য কোথায়? ২. খ্রী. পূ. ৭৪ সাল নাগাদ রোম কর্তৃক বিজিত এলাকা মানচিত্রে দেখাও। ৩. 'প্রোভিন্‌ৎসিয়া' বলা হত কাকে? প্রোভিন্‌ৎসিয়ার অবস্থা কীরকম ছিল, বর্ণনা করো। ৪. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্যের পতনের পর কোন্ কোন্ রাষ্ট্র খ্রী. পূ. ২য় শতকে রোমের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদের পরিণতি কী হয়েছিল? *৫. ফালাঙ্গোস ও লেগিওর গঠনের মধ্যে প্রতিতুলনা করো। উভয়ের মধ্যে কোন্‌টির সুযোগসুবিধা বেশি ছিল, আর তা কোন্ দিক থেকে?

§ ৪৯. খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতকে রোমে দাসপ্রথা

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন গ্রীসে লোকে কীভাবে দাসত্বে অবনমিত হতো (§ ৩৫:১); গ্রীসে দাসদের কী কী কাজ করতে হতো (§ ৩৫:৩)।

১. রোমে দাসের সংখ্যাবৃদ্ধি। যুদ্ধে বন্দী লক্ষ লক্ষ দাস এবং রোম-অধীনস্থ 'প্রোভিন্‌ৎসিয়া' (প্রদেশ)-গুলোয় নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাবার ফলে রোমে দাসের সংখ্যা অদৃষ্টপূর্বভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, জলদস্যুরা প্রচুর লোক ধরে এনে দাস হিসেবে বিক্রয় করে দিত।

রোমের অধীনে দাসদাসী কেনাবেচার শত শত বাজার ছিল। সর্বাপেক্ষা প্রধান

* প্রাচীন গ্রীস ও রোমে জয়ের প্রতীক ছিল একটি বৃক্ষের পাতা। গাছটির লাতিন নাম 'লাউরুস নোবিলিস' (Laurus nobilis), দেখতে তেজপাতা বা জলপাই পাতার মতো। এই পাতা দিয়ে মালা গেঁথে সেই মালা কারো মাথায় পরানোর অর্থ ছিল বিজয়মুকুট পরানো। এই মূল শব্দ থেকে laureate কথার উৎপত্তি, বিজয়ী অর্থে। — অনু.

১, ২, ৩, ৪. রোমে দাসদের কাজ: যাঁতা টানা; গৃহাদি নির্মাণের সময়ে মালমশলা উপরে টেনে তোলার কাজে ব্যবহৃত বিশালাকার চাকা ঘোরানো; গাঁইতি হস্তে পরিশ্রমরত দাস; বনাত উৎপাদনের কর্মশালায় ধোলাইয়ের কাজ। (প্রাচীন রোমক শিল্পনিদর্শন।) দাসদের এধরনের শ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার সিদ্ধান্ত কী? ৫. শাস্তিভোগরত দাস। (প্রাচীন রোমক মূর্তি।)

বাজার ছিল ঈজিয়ান সাগরের মধ্যে দেলোস্ দ্বীপে; এই বাজারে দৈনিক ১০ হাজার পর্যন্ত নরনারীর ক্রয়-বিক্রয় চলতো।

এখান থেকে দাসরপ্তানি সবচেয়ে বেশি ইতালিতেই হতো।

২. দাসশ্রমের ব্যবহার। প্রাচীন কালের গ্রীস ও প্রাচ্য দেশের তুলনায় ইতালিতে বিপুলসংখ্যক দাস কৃষিকর্মে লাগানো হতো। রোমের অভিজাতবর্গ শুধু যে সার্বজনীন কৃষিক্ষেত্রের বেশির ভাগ নিজেরা দখল করে নিয়েছিল তাই নয়, তারা চাষীদের কাছ থেকেও জমি কিনে নিত। তাদের অধিকারে বড়ো বড়ো জমিজমার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। দাসদের দিয়ে জমিতে লাঙ্গল দেয়া, নিড়ানি আর বেলচা দিয়ে চষাক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙা, যাঁতাকলে শস্য ভাঙা, মাড়াইকলে আঙুর আর জলপাই নিঙড়ানো, পশু চরান ইত্যাদি সমস্ত কঠিন কঠিন কাজ করানো হতো (দ্র. ২৮৪ পৃষ্ঠা ও ১৮ নং রঙিন ছবি)।

রৌপ্যখনিতে কাজ করতো প্রায় ৫০ হাজার দাস। বড়ো বড়ো জাহাজে ১৫০-২০০ জন করে দাস দাঁড় টানতো; বিশাল ও ভারি একেকটা দাঁড় টানতে ৫-৬ জন করে দাস লাগতো। রাস্তাঘাট ও ভবন নির্মাণে দাসদের কাজে লাগানো হতো। নানা প্রকার কর্মশালায় ও জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় শ'য়ে শ'য়ে ও হাজারে হাজারে দাস ব্যবহার করা হতো।

৩. কী অবস্থায় দাসরা কাজ করতো। রোমে দাসমালিকরা বলতো যন্ত্র হয় তিন রকমের, যেমন 'নীরব' যন্ত্র — যথা, গাড়ি, লাঙ্গল; 'সরব' যন্ত্র — যেমন ষাঁড়; আর আছে 'সবাক' যন্ত্র — দাস। দাস হবার পর লোকের নিজের আর কোনো নাম

১. বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত রোমক আম্ফিতেয়াত্রোন। (আলোকচিত্র।) ২. গ্লাদিয়াতোরদের লড়াই। (প্রাচীন রোমক চিত্র।) একজন গ্লাদিয়াতোর প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে জাল ছংড়ে দিয়ে ত্রিশংলের আঘাতে তাকে পরাজিত করতে চেষ্টা করছে। ডাইনে—গ্লাদিয়াতোরদের তাড়া দেওয়ার কাজে নিযংক্ত ব্যক্তি। ৩. দাসের গলায় পরার গোল আংটা।

থাকতো না। তাকে নতুন কোনো ডাকনামে সবাই ডাকতো, প্রায়শঃই সেই নাম হতো অবজ্ঞাপংর্ণ ও লাঞ্ছনাদায়ক; আর তা না হলে সাধারণ একটা কিছং নামে ডাকতো, যেমন: মিশরী, পার্সী।

দাস অত্যন্ত সস্তা ছিল বলে দাসমালিকরা তাদের দিয়ে অসম্ভব কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করাতে কুণ্ঠিত হতো না। গ্রীষ্মকালে দাসদের দৈনিক ১৮ ঘণ্টা করে ক্ষেতে-খামারে চাষবাসের কাজ করতে হতো। শস্য ভাঙার সময়ে যাতে ক্ষংধার্ত দাস কোনোপ্রকারে এক মংঠো ময়দাও মংখে তুলতে না পারে সেজন্য তার ঘাড়ে কাঠের চাকা পরিয়ে দেয়া হতো। সংবৎসরে দাসের জন্য একটিমাত্র জামা বরাদ্দ থাকতো, বছরের শেষে ছিঁড়েখংড়ে একেবারে শতজীর্ণ ন্যাতা হয়ে যেত সেটি। কিন্তু সেই কাপড়ের ফালিটুকুর পর্যন্ত মালিক সে ছিল না, তা দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হতো।

মাত্র কয়েক বৎসর দাসজীবন যাপন করলেই একজন তরংণ শক্তসমর্থ লোক একেবারে পঙ্গং হয়ে যেত। অশক্ত, কাজে অযোগ্য ও অকর্মণ্য দাসদের জনমানবশংন্য কোনো দ্বীপে ফেলে রেখে আসা হতো, সেখানে অনাহারে তারা প্রাণত্যাগ করতো। তাদের জায়গায় মালিক ফের নতুন লোক কিনে আনতো, বাজারে কোনো সময়েই দাসের কোনো অভাব ছিল না।

৪. গ্লাদিয়াতোরংদের যংদ্ধ। দাসদের মধ্যে যারা ক্ষিপ্র, চটপটে ও শক্তিশালী ছিল রোমবাসীগণ তাদের অস্ত্রশিক্ষা দান করতো এবং পরে একজনকে আরেকজনের বিরংদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করতো। এই দাসদের বলা হতো **গ্লাদিয়াতোরং**।

২

৩
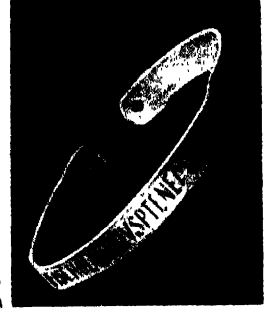
গ্লাদিয়াতোর্‌দের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার জন্য **আম্ফিথেয়াত্রোন্‌** তৈরি করা হয়েছিল, এটি দেখতে ছিল প্রায় অবিকল আধুনিক সার্কাসের মতো।* আম্ফিথেয়াত্রোনের মধ্যে ঠিক কেন্দ্রস্থলে বালুময় উন্মুক্ত স্থান থাকতো, তার নাম **আরেনা**। আরেনার চতুর্দিক ঘিরে ধাপে ধাপে দর্শকদের বসবার জায়গা। ইতালি ও তার অধীনস্থ প্রদেশগুলোর প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো শহরেই আম্ফিথেয়াত্রোন্‌ তৈরি করা হয়েছিল। উৎসবাদির সময়ে অগণিত দর্শকের সামনে আরেনাতে গ্লাদিয়াতোর্‌দের দ্বৈরথ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতো। (গ্লাদিয়াতোর্‌দের সাধারণত কী কী অস্ত্র ছিল তা ২ নং ছবির উপর ভিত্তি করে বলো।)

গ্লাদিয়াতোর্‌দের মধ্যে যারা যথেষ্ট সাহসিকতার সাথে লড়তো না, তাদেরকে চাবুক ও তীক্ষ্মমুখ বল্লম সহযোগে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হতো।

পরাজিত কিন্তু তখনো জীবিত — এধরনের গ্লাদিয়াতোরের ভাগ্য দর্শকদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হতো। দর্শকরা হাত তুললে তার জীবন রক্ষা পেত, আর যদি তারা হাতের বুড়ো আঙুল নিচের দিকে করতো, তা হলে বিজয়ী তাকে হত্যা করতো। ভৃত্যেরা আংটা পরানো লাঠি দিয়ে মৃতদেহগুলোকে আরেনা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে যেত। (দ্র. রঙিন ছবি ১৯।) সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশুদের সাথেও গ্লাদিয়াতোর্‌দের এহেন যুদ্ধ করতে হতো।

৫. দাসমালিকগণ কীভাবে দাসদের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করতো। দাস যাতে পালিয়ে না যায় সেজন্য তাদেরকে রাত্রে জেলখানায় তালাবদ্ধ করে রেখে দেয়া হতো, কয়েদঘরের গরাদে দেয়া জানালা হতো খুবই ছোটো। তাদের অধিকাংশই কাজ করা ও ঘুমানো সবই লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ অবস্থায় সম্পন্ন করতে হতো, শিকলের ঘষা লেগে লেগে গায়ে রক্তাক্ত ঘা হয়ে যেত। দাসদের গলায় আংটা পরানো থাকতো, আংটার উপরে লিখে দেয়া হতো: 'যাতে পালিয়ে না যাই, তাই আমাকে ধরে

* আম্ফিথেয়াত্রোন্‌ (amphitheatron) শব্দটির ইংরেজি ভাষান্তর amphitheatre এ্যাম্ফিথিয়েটার। আমাদের দেশের স্টেডিয়ামের সাথেও এর সাদৃশ্য বর্তমান। — অনু.

খ্রী. পূ. ২য়-১ম শতকে ধনী ব্যক্তির ভূসম্পত্তির পরিমাণ। দূরে—গোলাবাড়ি। সম্মুখভাগে বামপার্শ্বে—দাসদের জন্য ছাউনি-কয়েদখানা। মাঠে পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে কর্মরত দাস। চারপাশের জমিতে আঙুর ও জলপাই বাগান।

রাখো।' তাদের মুখের উপরে প্রায়শঃই ছ্যাঁকা দিয়ে দাসমালিকের পরিচয়-জ্ঞাপক ছাপ মেরে দেয়া হতো।

পরিদর্শকরা দাসদের পিছন পিছন সর্বদা ভয়ঙ্কর খবরদারি করে বেড়াতো। পাছে দাসেরা কোনো চক্রান্ত করে বসে সেই ভয়ে মালিকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল — দাস হয় কাজ করবে, নয় তো ঘুমাবে। দাস-মালিকরা চেষ্টা করতো বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা দাসদাসী কিনতে যাতে তারা একে অন্যের ভাষা না বুঝতে পারে। রোমের দাসমালিকদের ধারণা ছিল, 'নচ্ছার বদমাইশগুলোকে আতঙ্কের মধ্যে না রাখলে শায়েস্তা করা যাবে না।' সর্বদা যাতে ভয়ে ভয়ে থাকে সেজন্য তাদের উপর নির্যাতন করা হতো: চাবুক মারা হতো তাদের, আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া হতো, গাঁটে গাঁটে মেরে হাড় ভেঙে দেয়া হতো। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দাসকে বড়ো ক্রুশ তৈরি করে তার হাতে ও পায়ে পেরেক মেরে তাকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় ফেলে রাখা হতো। প্রচণ্ড রৌদ্রে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

নিজেদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাসদের ঘৃণার অন্ত ছিল না; তারা তাদের বিরুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

প্রাচীন কালে পৃথিবীর আর কোথাও রোমের মতো এত অধিকসংখ্যক দাস ছিল না ও তাদের বিরুদ্ধে এত নিষ্ঠুর শোষণও আর কোথাও হয় নি।

রোমে দাসমালিকভিত্তিক সমাজ প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

? ১. প্রাচীন কালে অর্থনীতিক বিভিন্ন শাখায় দাসদের শ্রম যে বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করা হতো, তার কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন মনে হলে, প্রথমেই মনে করতে চেষ্টা করো দাসদের দিয়ে কী কী কাজ করানো হতো। ২. প্রাচ্যে বা গ্রীসের চেয়েও রোমে দাসমালিকভিত্তিক সমাজ যে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা প্রমাণ করো। এই সমৃদ্ধির পিছনে কী কারণ ছিল? ৩. প্রাচীন যুগে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষজনকে কীভাবে দাসে পরিণত করা হতো? *৪. রোমের কোনো দাসের জবানীতে তার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।

§ ৫০. ইতালিতে কৃষক দারিদ্র্য, জমির জন্য তাদের সংগ্রাম

(দ্র. মানচিত্র ৮)

মনে করতে চেষ্টা করো—ত্রিবুনুসদের ভূমিকা কী ছিল (§ ৪৬:১); খ্রী. পূ. ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীসে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় কেন নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল (§ ৪২:২)।

১. দাসদের দিয়ে জমি চাষ করালে কৃষিকাজ খুবই কম খরচে সম্পন্ন করা যেত। তা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ হতে সস্তায় ইতালিতে অনেক পরিমাণে খাদ্যশস্য আনা হতো। খাদ্যশস্যের দাম কমে গিয়েছিল যে সব চাষী ক্ষেতে খাদ্যশস্যের চাষ করতো তারা নিঃস্ব হয়ে যেতে শুরু করে এবং নামমাত্র মূল্যে দাসমালিকদের নিকট জমি বিক্রি করে দেয়। সমকালীনদের রচনায় জানা যায় যে, এলাকার পর এলাকা খালি হয়ে যায়: অল্প কিছু কাল পূর্বেও যেখানে গ্রাম আর চাষীদের জমিজমা ছিল সেখানে দাসরা লাঙল চষছে আর পশু চরাচ্ছে। **ইতালিতে বিপুল সংখ্যায় দাস আমদানির ফলে এবং রোম কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশ লুণ্ঠিত হওয়ায় দাসমালিকদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কৃষকরা গরিব হয়ে পড়ে।**

সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া চাষীরা কাজ খুঁজতে রোম ও অন্যান্য শহরে যেতে শুরু করলো। **শহরে হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। অথচ এখানেও তাদের কাজ মিললো না, কেন না শহরের প্রায় সব কাজকর্মই তো দাসদের দিয়ে করানো হতো।**

কৃষকেরা ভূসম্পত্তিহীন হয়ে পড়ার পরে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি হওয়ার সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো। রোমের সেনাবাহিনী শক্তিহীন হয়ে পড়লো। সৈন্যেরা অতি কষ্টে খ্রী. পূ. ১৩৮ সালে সিসিলিতে দাসবিদ্রোহ দমন করে। এই অভ্যুত্থান সারা ইতালির দাসমালিকদের মারাত্মকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে দেয়।

২. বিপুল সংখ্যায় দাস আমদানি (দাসরা তাদের অত্যাচারী প্রভুদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই করতো না) আর চাষীদের একেবারে নিঃস্ব করে দেয়া যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যাপার তা কিছু কিছু দাসমালিক বুঝতে পেরেছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয় প্রেবেইউস পরিবারের গ্রাখি ভ্রাতৃদ্বয়: **তিবেরিউস্** এবং **গাইউস্**ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন।*

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ তিবেরিউস্‌কে তাঁর মেধা, ন্যায়নিষ্ঠা ও বীরত্বের জন্য রোমে সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করতো। **১৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে** গণপরিষদ তাঁকে ত্রিবুনুস্‌পদে নিযুক্ত করে।

তিবেরিউস্ এক আইন গণয়নের প্রস্তাব করেন যার ফলে প্রত্যেক পরিবার সার্বজনীন জমিতে ২৫০ হেক্টরের বেশি জমি পেতে পারবে না, অতিরিক্ত জমি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন লোকজনদের বিলি করে দেয়া হবে, তবে জমি বিক্রয়ের কোনো অধিকার অবশ্য তাদের হাতে রাখা হবে না। তিবেরিউস্ তাঁর এই প্রস্তাব জনসমক্ষে পেশ করেন। ফোরুমে বিপুলসংখ্যক জনতার সম্মুখে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বক্তৃতায় তিনি এই আইনের সমস্ত ভালো দিক তুলে ধরেন। জনগণ নিজেদের ত্রিবুনুস্‌কে সমর্থন জানায়। বাড়ির দেয়ালে, থামের গায়ে, এমন কি সমাধিফলকের উপরে পর্যন্ত দরিদ্রেরা এই আইন সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে স্লোগান লিখে রাখতো। তিবেরিউস্ কর্তৃক আয়োজিত বিরাট জনসভায় তাঁর এই **ভূমি-আইন** গৃহীত হয়েছিল।

সিনেট, যার সদস্য ছিল ধনী জমিদাররা, এতে খুবই রেগে যায়; কিন্তু গণবিক্ষোভের ভয়ে তারা প্রকাশ্যে জনসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পায় না। তিবেরিউসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা শুরু করে দেয়।

৩. পরের বৎসর গণসভায় ত্রিবুনুস্ নির্বাচনের সময়ে তিবেরিউসের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ায় যে, তিনি রাজা হয়ে বসতে চান। গণসভায় তারা এমন ভয়ঙ্কর হৈচৈ শুরু করে যে শেষপর্যন্ত তিবেরিউসের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়াই সম্ভব হলো না।

ফোরুমের অনতিদূরেই সিনেটের অধিবেশন বসতো। সেনাতোরগণ তাদের এই ঘৃণ্য ত্রিবুনুস্‌কে দমন করার জন্য তিবেরিউসের দুর্নামের সুযোগ নেয়। সেনাতোরদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি 'প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য' বাদ বাকি সেনাতোরদের প্রতি আহ্বান জানালে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে ফোরুম ময়দানের

* ইংরেজিতে the Gracchi brothers হলেও দুভাইয়ের পদবী গ্রাখি নয়, গ্রাখুস (Gracchus); একবচন Gracchus শব্দটি বহুবচনে Gracchi হয়ে যায়, ফলে বাংলাতে 'গ্রাখুস ভ্রাতৃদ্বয়' বলা চলে। — অনু.

রোমে চাষবাসের জন্য লোহার তৈরি শ্রম-হাতিয়ার: কাস্তে, গাঁইতি, শাবল-কুড়ুল।

দিকে ছুটে যান। জনগণ সামনে সেনাতোরদের দেখে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পথ ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ায়। তখন সেনাতোররা ভাঙা বেঞ্চির তক্তা দিয়ে পিটিয়ে তিবেরিউস্‌কে হত্যা করে; তাঁর ৩০০ জন সমর্থকও প্রাণ হারায়। নিহত ব্যক্তিদের সকলকে তিবের্ নদীতে ফেলে দেয়া হয় — শুধুমাত্র অপরাধীদের মৃতদেহই এভাবে ফেলার নিয়ম ছিল। এর পর জমি বিতরণ করা বন্ধ করে দেয়া হয়।

৪. খ্রী. পূ. ১২৩ সালের জন্য গণপরিষদে ত্রিবুনুস্ নির্বাচিত হয়ে গ্রাখি ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠজন গাইউস্ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনারব্ধ কর্ম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আবার জমি বিতরণের কাজ তিনি শুরু করেন। গ্রাখি ভ্রাতৃদ্বয়ের কার্যকলাপের ফলে প্রায় ৮০ হাজার নিঃস্ব চাষী জমি পেয়েছিল।

রোম শাসন করছে মুষ্ঠিমেয় জনা কয়েক ধনী অভিজাত — এটা যে কী অন্যায় তা গাইউস্ গ্রাখুস বুঝতে পেরেছিলেন। সিনেটের ক্ষমতা সীমিত করে রাষ্ট্রপরিচালনায় দরিদ্রদের টেনে আনার চেষ্টা করেন তিনি। সিনেটের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামের জন্য রোম ও ইতালির স্বাধীন অধিবাসীদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন গাইউস্, কিন্তু জনসাধারণের মাত্র কিছু অংশ তাঁকে সমর্থন করে। সিনেট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, তিনি শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে চান। ত্রিবুনুস্ হিসেবে তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ হলে সশস্ত্র দাসমালিকদের দল ও সৈন্যেরা গাইউস্ ও তাঁর সমর্থকদের আক্রমণ করে বসে। সিনেট ঘোষণা করে যে, গাইউসের মাথার বদলে সে পরিমাণ ওজনের সোনা পুরস্কার দেয়া হবে। রোমের রাস্তায় রাস্তায়

যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সিনেটের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে গাইউস্ ও তাঁর ৩ হাজার সমর্থক মৃত্যুবরণ করেন।

জমি বণ্টন পুনরায় থেমে যায়। অনতিবিলম্বে আইন প্রণয়ন করা হলো যার ফলে সার্বজনীন ক্ষেত্রের জমি বিক্রয় আর নিষিদ্ধ রইলো না। কৃষকরা পুনরায় ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়তে লাগলো আর সেই সব জমি দাসমালিকরা কিনতে শুরু করলো।

৫. সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য রোমে ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যক্তিদের সৈন্যদলে ভর্তি করা শুরু হলো। নিরন্ন দরিদ্র জনগণের মধ্যে বেতনভুক সেনা হতে ইচ্ছুক লোকের কোনো অভাব হলো না।

খ্রী. পূ. ২য় শতকের শেষ থেকে খ্রী. পূ. ১ম শতকের শুরুর মধ্যে রোমক সৈন্যবাহিনী পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তবে তাতে একটা গঠনগত পরিবর্তন ঘটে গেল। যারাই বেশি মাইনে দেবে তাদেরই চাকরি করতে ইচ্ছুক — এরকম ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে উঠলো।

প্রাচীন ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে

কীজন্য তিবেরিউস্ গ্রাখুস্ কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করার দাবি জানিয়েছিলেন?

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিবেরিউস্ বলতেন যে, দাস কখনো সেনাবাহিনীতে কাজ করার যোগ্য নয়, তারা মালিকের সঙ্গে সব সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। তিনি আরো মনে করিয়ে দেন যে, কিছু কাল আগেই সিসিলিতে দাসদের জন্য মালিকেরা কীরকম ক্ষতিস্বীকার করে, দাসদের সাথে রোমবাসীদের কত দীর্ঘ সময় ধরে ও কী দুরূহভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে আর সেই সংগ্রাম কী বিপজ্জনকই না ছিল।

ত্রিবুনুসের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে লক্ষ্য করে গরিবদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যখন তিবেরিউস্ বক্তৃতা দিতে উঠতেন তখন তাঁকে কঠোর ও অপরাজেয় মনে হতো: 'ইতালিতে শিকারান্বেষী বন্য জন্তুদেরও থাকবার গর্ত আছে, রাত কাটাবার জন্য আছে আশ্রয়, অথচ প্রাণ দিয়ে যারা ইতালির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের কিছুটি নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু আলো আর বাতাস। আশ্রয়হীন ভবঘুরের মতো বউ-ছেলেপিলে নিয়ে তারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। অন্যের বিলাসব্যসন ও ধনসম্পদের জন্য সৈন্যেরা যুদ্ধ করছে, প্রাণ হারাচ্ছে; বলা হচ্ছে, ওরা নাকি রণাঙ্গজয়ী—অথচ ওদের একটুকরো নিজের জমি পর্যন্ত নেই।'

? ১. রোমের যুদ্ধাভিযান কীভাবে তার সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে ফেলে? ২. সিনেটের অসম্মতি সত্ত্বেও ভূমি-আইন কেন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল? গ্রাখিদের বিরুদ্ধে সিনেট কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে? ৩. গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের ভিত্তিতে বলো— দাসমালিকভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কীভাবে কৃষক ও কারিগরদের সার্বিক অবস্থার উপর

প্রভাব বিস্তার করেছিল? তোমার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪. খ্রী. পূ. ২য় শতকের শেষ পাদে রোমক সৈন্যবাহিনীতে কী কী পরিবর্তন দেখা দেয়? সে সব পরিবর্তনের কারণ কী? ৫. এই পরিচ্ছেদের (§ ৫০) অন্তর্ভুক্ত উপচ্ছেদসমূহের শিরোনামা দাও। ৬. দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের কত বৎসর পরে তিবেরিউস্ গ্রাখুসের ভূমি-আইন প্রবর্তিত হয়েছিল?

§ ৫১. স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ

(দ্র. মানচিত্র ৯ক)

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন কালে পৃথিবীতে শোষিতদের দ্বারা সংঘটিত কী কী অভ্যুত্থান ঘটেছিল।

১. বিদ্রোহের শুরু। খ্রী. পূ. ১ম শতাব্দীতে ইতালিতে দাসদের সংখ্যা অত্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। তাদের অবস্থা পূর্বের মতোই শোচনীয় ছিল। এতে করে দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় হবার সুযোগ পায়।

কাপুয়া শহরে গ্লাদিয়াতোরদের জন্য একটা বড়ো বিদ্যালয়-কারাগার ছিল। ৭৪ **খ্রীষ্টপূর্বাব্দে** তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে থাকে। গ্লাদিয়াতোরদের বাসস্থান বিদ্যালয়-কারাগারের প্রহরী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু ষড়যন্ত্রকারী পালাতে সক্ষম হয়। তারা **ভিসুভিউস্** পর্বতের চূড়ায় আশ্রয় নেয়।

পলাতকগণ **স্পার্তাকাসকে*** নিজেদের পথপ্রদর্শক নির্বাচিত করে। স্পার্তাকাস তাঁর প্রচণ্ড শক্তি, সাহস ও বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বলকান উপদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন, রোমকগণ তাঁকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসে। পলায়ন করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে যান এবং তাঁকে গ্লাদিয়াতোরদের দলে ফেলা হয়।

প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের অস্ত্র বলতে ছিল সূঁচালো খুঁটি আর রান্নাঘরের ছুরি; আঙুরলতা দিয়ে তারা তাদের ঢাল তৈরি করেছিল। এই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা নির্ভীকভাবে দাসমালিকদের ঘরবাড়ি এবং তাদের গাড়িঘোড়ার উপর আক্রমণ করতো। শত্রুদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়ে তারা নিজেদের অস্ত্রবলে বলীয়ান করে তোলে। নিকটবর্তী এলাকার দাসরাও স্পার্তাকাসের দলে এসে যোগ দিতে আরম্ভ করে।

তিন হাজার রোমক সৈন্য পলাতক দাসদের আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে। পাহাড় থেকে নিচে নামার একমাত্র পায়ে-চলা পথ রোমকগণ অবরোধ করে রাখে। তাদের ধারণা ছিল যে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে। অথচ

* ইংরেজির অনুকরণে Spartacus-কে সাধারণত 'স্পার্টাকাস' লেখা হয়। — অনু.

কামারশালে কামারেরা বর্ম পেটাই করছে। (প্রাচীন রিলীফ।)

বিদ্রোহীরা আঙুরলতা দিয়ে মই বুনে তার সাহায্যে রাত্রিবেলায় পাহাড়ের অত্যন্ত খাড়া দিক দিয়ে নিচে নামলো। রোমক সেনারা ভাবেই নি যে, ওভাবে নিচে নামা সম্ভব, ফলে সেদিকে কোনো পাহারা রাখে নি। বিদ্রোহীরা অকস্মাৎ রোমক বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করে দেয়। (দ্র. রঙিন ছবি ২০)

২. মুক্তির পথে। বিদ্রোহীদের সাফল্যের সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ইতালি হতে দলে দলে দাস এসে স্পার্তাকাসের বাহিনীতে এসে যোগ দেয়, তারা তাদের দুর্ভাগ্যকে আর নিয়তি বলে মেনে নেয় নি।

স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার দাস সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলে নানান ভাষায় কথা বলতো এবং ফলে প্রায়শঃই একে অপরকে বুঝতে পারতো না। স্পার্তাকাস তাদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। রোমক সেনাবাহিনীর অনুকরণে তিনি নিজের পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী ও গুপ্তচর ব্যবস্থা গঠন করেন। দিবারাত্র কর্মকারগণ বিদ্রোহীদের শিবিরে লোহা পিটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানাতে থাকে।

স্পার্তাকাস তাঁর সৈন্যদল উত্তরাভিমুখে চালনা করেন। সম্ভবত তিনি দাসদের ইতালি থেকে বের করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যাতে তারা নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে।

বিদ্রোহী বাহিনী যে কী পরিমাণ শক্তিশালী তা সিনেট বুঝতে পেরেছিল। তাই সিনেট তার বিরুদ্ধে ইতালির উভয় কোন্সুল্‌কেই প্রেরণ করলো। স্পার্তাকাসের বাহিনী বহির্ভূত দাসদের যে সব দল ছিল তাদের মেরে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন কোন্সুলদ্বয়। একইভাবে তাঁরা বিদ্রোহীদের প্রধান বাহিনীকে চারদিক
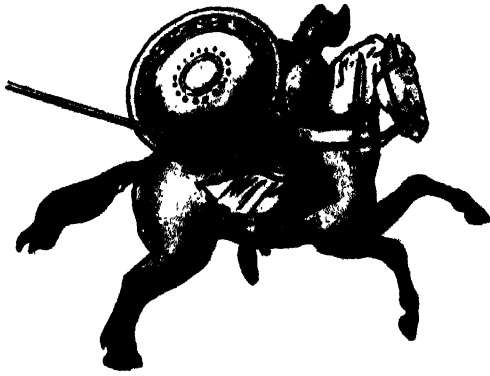
আহত স্পার্তাকাস। (পোম্পেই নগরে প্রাপ্ত দেয়ালে ঝোলানো ছবি অনুকরণে অঙ্কিত।)

থেকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। স্পার্তাকাস কিন্তু কোন্সুলদের পরিকল্পনা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁদের আর পরস্পর মিলিত হবার সুযোগ না দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের এক এক করে ধ্বংস করে ফেলেন।

অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহীর দল সমগ্র ইতালি অতিক্রম করে, যুদ্ধক্ষেত্রে রোমক বাহিনীকে পরাজিত করে তারা পো নদীর উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়। এমন সময়ে স্পার্তাকাস হঠাৎ বিপরীত মুখে তাঁর গতি পরিবর্তন করেন। মনে হয় বেশ কিছুসংখ্যক দাস ইতালি ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছুক ছিল না।

৩. **বিদ্রোহীদের ফাঁদে পড়া।** বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে রোমের দাসমালিকরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। খুবই তাড়াহুড়ো করে তারা বিশাল সৈন্যসমাবেশ করে। দাসমালিকদের অনেকে নিজেরাই দাসদের সাথে যুদ্ধ করতে যায়। এই বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচন করা হয় ক্রাস্সুস্ নামে অত্যন্ত ধনাঢ্য এক ব্যক্তিকে। তা ছাড়া সিনেট স্পেন ও বলকান উপদ্বীপ থেকেও সৈন্যদের ডেকে পাঠায়।

স্পার্তাকাস দেখলেন যে, রোম অবরোধ করার শক্তি তাঁর নেই; তখন তিনি নিজ বাহিনীকে ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে চালিত করলেন। পথে ক্রাস্সুসের বাহিনী বাধা দেয়, কিন্তু দাসরা সেই বাধা ছিন্ন করে বেরিয়ে যায়। রোমক যোদ্ধারা বিদ্রোহীদের এত ভয় পেত যে, বিদ্রোহীরা কাছাকাছি এসে গেলে বিখ্যাত রোমক যোদ্ধারা দল বেঁধে ছুটে পালিয়ে যেত। নিজ বাহিনীর নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পলাতক সেনাদের প্রতি দশ জনের ভিতর থেকে একজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার হুকুম দিতেন ক্রাস্সুস্।

বিদ্রোহী দাসদের মৃত্যুদন্ড। (আধুনিক শিল্পী অংকিত ছবি।)

স্পার্তাকাস অতঃপর তাঁর বাহিনীসহ ইতালির দক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপ অভিমুখে অগ্রসর হন। সিসিলিতে গিয়ে সেখানেও দাসবিদ্রোহ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কেরায়া নিয়ে বিদ্রোহীদের জলপ্রণালী পার করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় জলদস্যুরা, কিন্তু পরে তারা প্রতারণা করে। দাসরা তখন ভেলা তৈরি করে সাগর পাড়ি দিয়ে সিসিলি পৌছুতে চায়, কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠে তাদের সব লন্ডভন্ড করে দেয়। সেখান থেকে সিসিলি মোটেও দূর ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা সেখানে পৌছুতে সক্ষম হয় নি।

স্পার্তাকাসের বাহিনীর উপর আক্রমণ করবেন কিনা মনস্থির করতে না পেরে ক্রাস্সুস্ যার উপর দিয়ে অন্তরীপে আসার একমাত্র পথ ছিল সেই সংকীর্ণ যোজকটি দখল করে বসলেন। যোজকের এক উপকূল হতে অন্য উপকূল পর্যন্ত সমস্ত জায়গা জুড়ে রোমকরা গভীর পরিখা খনন করে ও উঁচু বাঁধ বাঁধে। বিদ্রোহীরা ফাঁদে আটকা পড়ে যায়, তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো।

৪. 'অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে তীরের ঘায়ে মরাও ভালো'। অভ্যুত্থানকারীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় স্পার্তাকাস বলেছিলেন যে, অনাহারে মৃত্যুবরণের চেয়ে তীরের ঘায়ে মরাও ভালো। দুর্বিষহ শীতে এক ঝড়ো হাওয়ার রাত্রে তিনি শত্রুর উপর প্রচন্ড আক্রমণের জন্য সকলকে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁর বাহিনী এক জায়গায় পরিখা ভরে ফেলে ও বাঁধ দখল করে নেয় এবং ফাঁদ হতে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

কিছুসংখ্যক দাস পুনরায় স্পার্তাকাসের বাহিনী থেকে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে

যায়; ক্রাস্সুস্ সে সময়ে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলে।

ওদিকে আবার ঠিক এ সময়েই বলকান উপদ্বীপ হতে সৈন্যদল ইতালি এসে পৌঁছয় এবং স্পেন থেকেও পোম্পাই নামে জনৈক সেনাপতির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী চলে আসে। রোমের বাহিনীসমূহ যাতে পরস্পরে মিলিত হতে না পারে তজ্জন্য ক্রাস্সুস্-বাহিনীর দিকে স্পার্তাকাস-বাহিনী এগিয়ে যায়।

৫. শেষ যুদ্ধ। রোমবাসীদের সাথে বিদ্রোহীদের শেষ যুদ্ধ হয় **৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।** ক্রাস্সুস্‌কে নিহত করার জন্য স্পার্তাকাস চেষ্টা করেন, কেন না তা হলে তাঁর বাহিনী পরিচালকহীন হয়ে পড়বে। স্পার্তাকাসের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শত্রুদের দুজন সেনাপতি নিহত হয়। অবশ্য তিনি নিজেও উরুতে আঘাত পান। আহত স্পার্তাকাস এক পায়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। রোমকরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় ধরতে পারে নি। যুদ্ধের সময় তাঁকে এমন টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল রোমক সেনাদল যে তাঁর শরীর যুদ্ধক্ষেত্রে সনাক্ত করা যায় নি।

রোমকদের সাক্ষ্যেই জানা যায় যে, বিদ্রোহীরা তাদের অন্তিম সংগ্রামেও মহাসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি খুবই বেশি থাকায় বিদ্রোহীবাহিনী একেবারে পরাজিত হয়ে যায় এবং বাদ বাকি কিছু লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে।

যথাসময়ে পোম্পাইয়ের লেগিও এসে পলাতক দাসদের মেরে শেষ করে ফেলে। রোমকগণ যুদ্ধবন্দীদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। কাপুয়া হতে রোম যাবার পথে রাস্তার দু'ধারে ছ'হাজার মৃত্যুপ্রতীক্ষারত দাসসহ ক্রুশের খুঁটি পোঁতা ছিল।

রোমের দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য পূরণ — অর্থাৎ বিদ্রোহ দমন — করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, তবে এই সময়েই রোম খুবই শক্তিশালী ছিল।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এই দাসবিদ্রোহ ও স্পার্তাকাসকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন। তিনি বলেছেন: '...দাসদের সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহের সবচেয়ে খ্যাতনামা বীরদের একজন ছিলেন স্পার্তাকাস।'

প্রাচীন কালে সারা পৃথিবী জুড়ে দাস ও দাসমালিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলেছিল। রোমে যেখানে দাসতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটে সেখানে দাসদের সংগ্রাম বিশেষভাবে নির্মম ও অটল আকার ধারণ করেছিল।

? ১. মানচিত্রে বিদ্রোহীদের অভিযান-পথ ও যুদ্ধক্ষেত্র দেখাও। ২. ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন স্পার্তাকাস সম্বন্ধে কী বলেছিলেন? ৩. বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে

স্পার্তাকাসের দক্ষতা এবং বিদ্রোহীদের সাহসিকতার উদাহরণ দাও। ৪. দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রধান দুটি লক্ষ্য কী কী ছিল তা § ৫১ ও § ৪৮-য়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করো। ৫. স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে দাসদের অভ্যুত্থান কত বৎসর ধরে চলেছিল? স্পার্তাকাসের বিদ্রোহ এবং চীনে 'হলুদ পট্টির' বিদ্রোহ—এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি আগে ঘটেছিল এবং কত আগে? ৬. নিম্নলিখিত ঘটনার কোনো একটি অবলম্বনে এবং নিজেকে তার মধ্যে অংশগ্রহণকারী ভেবে নিয়ে গল্প রচনা করো: (ক) কাপুয়া নগরে গ্লাদিয়াতোরদের চক্রান্ত এবং তাদের পলায়ন; (খ) ভিসুভিউস্‌ পর্বত হতে অবরোহন ও রোমকদের সাথে তাদের যুদ্ধ; (গ) বিদ্রোহীবাহিনী কর্তৃক ক্রাস্সুসের বেষ্টনী ভঙ্গ।

খ্রী. পূ. ৩য় শতকের শুরু থেকে খ্রী. পূ. ১ম শতকের আরম্ভ পর্যন্ত রোমে কী কী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল:

(ক) রোম প্রজাতন্ত্রের সীমা কীরকম পরিবর্তিত হয়েছিল? মানচিত্রে পুনিক যুদ্ধের শুরুতে এবং তার পর ৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে তার রাষ্ট্রসীমা নির্দেশ করো।

(খ) ইতালীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থায় কী কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল? কী কারণে সেই সব পরিবর্তন ঘটেছিল?

(গ) রোমক সেনাবাহিনীতে কীভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল? সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি কেন পাল্টে গিয়েছিল?

চতুর্দশ অধ্যায়

রোমে প্রজাতন্ত্রের পতন। সম্রাজ্ঞির কালে রোমক সাম্রাজ্য

§ ৫২. রোমে সিজারের ক্ষমতা দখল

(দ্র. মানচিত্র ৯)

মনে করতে চেষ্টা করো — রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনভার কাদের উপর ন্যস্ত ছিল (§ ৪৬:২)।

১. রোমে সেনাপতিদের ক্ষমতা সুদৃঢ়ীকরণ। রোমের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধ ও রোমক সেনাবাহিনীর যোদ্ধারা ভাড়াটে সৈনিক ছিল বলে সেনাপতিদের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভিজ্ঞ সেনাপতিরা যুদ্ধ চালানোর জন্য সিনেটের নির্দেশানুযায়ী নিজেরাই নিজেদের বাহিনী গঠন করতো। যোদ্ধারা তাদের কাছ থেকে বেতন এবং লুণ্ঠিত মালের অংশ পেত। সৈন্যেরা শুধুমাত্র সেনাপতির আজ্ঞা পালন করতো এবং সর্বদাই তাদের আদেশমতো যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতো।

দাসমালিকদের অনেকেই মনে করতো যে, শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক উদ্যমী সেনাপতি কোন্সুল ও সিনেটের চেয়ে যোগ্যতর রূপে দাস ও দরিদ্রদের বিরুদ্ধতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। রোমে তাই সেনাপতির শাসন কায়েম হোক এটাই তারা চাইতো। বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী এবং ৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাসবিদ্রোহকে নির্মমভাবে যিনি দমন করেছিলেন সেই পোম্পাই এ কাজের উপযুক্ত বলে তাদের মনে হয়েছিল।

এদিকে একইভাবে রোমের শাসনক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন **জুলিয়াস সিজার।*** তিনি এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত এক পাত্রিৎসিউস পরিবার থেকে। অল্প বয়স

* **গাইউস্ ইউলিউস্ কেজার** (Gajus Julius Caesar) ১০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিহত হন। লাতিনে তাঁর নামের উচ্চারণ ভিন্ন রকম হলেও ইংরেজির অনুকরণে বাংলা ভাষায় সর্বত্র জুলিয়াস সিজার নামে প্রচলিত। তাই ইউলিউস্ কেজার লিখলে বোঝার অসুবিধে হবে বলে এখানে প্রচলিত বানানই রাখা হলো। — অনু.

১ ২ ৩

১. জুলিয়াস সিজার। ২. পোম্পাই (প্রাচীন রোমক আবক্ষ মূর্তি)। ৩. মরণোন্মুখ জনৈক গল্ (প্রাচীন মূর্তি)।

থেকেই তিনি ক্ষমতা ও খ্যাতির স্বপ্ন দেখতেন। দরিদ্র রোমবাসীদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল — তাদের ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। এই কারণে তিনি দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যবিতরণের দাবি জানান এবং তাদের জন্য গ্লাদিয়াতোর লড়াই দেখার আয়োজন করতেন। সিজার কোন্সুল পদে নির্বাচিত হন এবং ৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে গলিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

২. গলিয়া* জয়। গল্ জাতি পো নদীর অববাহিকায় এবং আধুনিক কালের ফ্রান্সে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে অনেক উপজাতিই পরস্পরে পরস্পরের শত্রু ছিল। সিজার যখন গলিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তখন শুধুমাত্র পো নদীর অববাহিকা আর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের কিছু অংশ রোমকদের অধিকারে এসেছিল। তিনি গল্দের সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন তাদের দেশ দখল করবেন বলে।

গলিয়াতে প্রায় ৮ বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। সিজার এই যুদ্ধে নিজেকে এক অক্লান্ত ও প্রতিভাবান সেনাপতিরূপে প্রমাণ করেন। কিছু অভিজাত গল্কে সিজার নিজের পক্ষে টেনে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারাই গুপ্তচরের কাজ করতো এবং অরণ্য ও জলাভূমি অঞ্চলে তাঁর বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। গল্রা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের বিশৃঙ্খল বাহিনী যুদ্ধে অভিজ্ঞ রোমক লেগিওর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি।

* লাতিনে Gallia; ফরাসী ও ইংরেজিতে Gaul লেখা হয়। বর্তমান কালের ফ্রান্স ও বেলজিয়ম পুরো এবং নেডারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির কিছু কিছু অংশ নিয়ে প্রাচীন কালে গলিয়া প্রদেশ গঠিত ছিল। প্রাচীন গল্ জাতির আবাসভূমিই হলো গল্ দেশ বা গলিয়া। — অনু.

রোমক বাহিনী সারা দেশ দখল করে নেয় এবং কয়েক লক্ষ যুদ্ধবন্দীকে দাসরূপে বিক্রয় করে। তারা গলদের পবিত্র স্থান যেখানে দেবতাকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে আনীত স্বর্ণ সঞ্চয় করে রাখা হতো, তা লুঠ করে। সিজার লুঠের মাল দিয়ে সৈন্যদের বেতন বাড়িয়ে দেন। উপরন্তু তিনি যোদ্ধাদের ভূসম্পত্তি বিতরণ করারও প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। রোমে তাঁর নামে আমোদপ্রমোদ প্রদর্শন করা হতো, দরিদ্রকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো।

৩. রোমে শাসনক্ষমতা দখলের লড়াই। গলিয়া জয় করার পর সিজারের হাতে ছিল সম্পূর্ণ এক শক্তিশালী ও আজ্ঞানুবর্তী সেনাবাহিনী, তাদের সৈনাধ্যক্ষ হবার সুনাম আর প্রচুর ধনসম্পদ।

৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সিনেটের সৈন্যবল সিজার অপেক্ষা অনেক বেশি থাকলেও তারা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়ানো ছিল। সিনেট তখন তার বাহিনী পরিচালনার ভার দিলো পোম্পাইয়ের উপর। কিন্তু সিজার এত দ্রুত আক্রমণ করে বসেছিলেন যে রোম প্রতিরক্ষার আয়োজন করার সময় পান নি পোম্পাই এবং তিনি বলকান উপদ্বীপে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। দাসমালিক ও দাসদের এক অংশ সিজারের সাথে হাত মেলায়। রোমের দরিদ্র জনগণ বিশ্বাস করেছিল যে, সিজার তাদের অবস্থা উন্নত করবেন। প্রায় কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই তাঁর সেনাদল রোম ও সমগ্র ইতালি দখল করে নিল।

ওদিকে ততদিনে বলকান উপদ্বীপে গিয়ে পোম্পাই বিরাট এক বাহিনী গঠন করে ফেলেছেন। সিজারের সেনাদল তখন সেখানে গিয়ে পোম্পাইয়ের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়, সব বাকি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পোম্পাই পলায়ন করেন, তবে কিছুকালের মধ্যেই তিনি নিহত হন। এর পর আরো ৩ বৎসর ধরে সিজারকে এশিয়া, আফ্রিকা ও স্পেনে তাঁর বিপক্ষীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

সিজার ও পোম্পাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ তাঁদের পক্ষাবলম্বনকারী রোম-নাগরিকদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। ফলে এই সংগ্রামকে **রোমের গৃহযুদ্ধ** নামে অভিহিত করা হয়।

৪. রোমের একচ্ছত্র অধিপতি — সিজার। গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে সিজার রোমে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হাতে তখন অবাধ ক্ষমতা। সিনেট ও কোন্সুল বাধ্যভাবে তাঁর আদেশ পালন করছে। তিনি নিজেকে **ইম্পেরাতোর** (সম্রাট) রূপে ঘোষণা করলেন, লাতিনে যার অর্থ হলো 'একচ্ছত্র অধিপতি'। যুদ্ধের সময়ে রোমে সেনাপতিদের এই নামেই ডাকা হতো। সিজার অবশ্য এই উপাধি সাময়িকভাবে নয়, স্থায়ীভাবেই গ্রহণ করলেন।
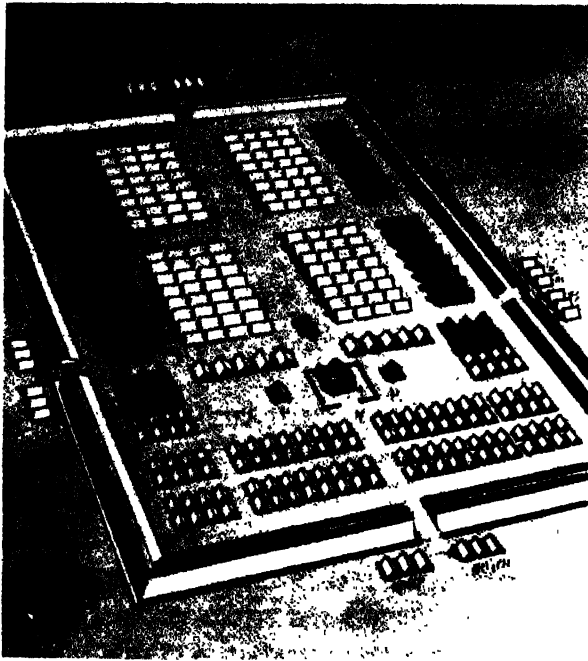
রোমে সৈন্যদের শিবির। মধ্যভাগে — সেনাপতির ছাউনি, অন্যান্য ছোটোখাটো ছাউনি পদস্থ সেনানায়কদের, আর বেদিটি বলিদানের জন্য। সমগ্র শিবির এলাকা ঘিরে পরিখা ও প্রাচীর রয়েছে।

সর্বশক্তিমান ইম্পেরাতোরকে সম্রাটের ন্যায় শ্রদ্ধা করা হতো। মুদ্রার উপরে তাঁর ছবি খোদিত হতো, দেব-দেবীর মূর্তির পাশে তাঁর মূর্তি রাখা হতো। সিনেটে গিয়ে তিনি স্বর্ণ ও গজদন্ত খচিত সিংহাসনে উপবেশন করতেন। মুক্তহস্তে তিনি সৈন্যদের উপহার দিতেন বটে, তবে দরিদ্রদের তিনি প্রতারণা করেছিলেন। তিনি রোমে তাদের বিনামূল্যে খাদ্যবিতরণ দ্বিগুণ কমিয়ে দেন।

৫. সিজারের মৃত্যু। কিছুসংখ্যক সেনাতোর সিজারের একনায়কতন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী শাসনে খুশি ছিল না। তারা রোমে অভিজাতবর্গের প্রজাতন্ত্র কায়েম রাখতে ও শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছিল। এই সেনাতোররাই চক্রান্ত করে। ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দান করেন ব্রুটাস্* নামে জনৈক ধনী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় দাসমালিক; তিনি নিজেকে সিজারের সমকক্ষ বলে ভাবতেন।

* **মার্কুস্ ইউনিউস্ ব্রুতুস** (Marcus Junius Brutus)-এর জন্ম ৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, ৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। বাংলাতে ইংরেজির অনুকরণে সর্বদা ব্রুটাস্ লেখা হয় বলে এখানেও সেই বানানই রক্ষিত হলো। — অনু.

৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিনেটের এক অধিবেশনে চক্রান্তকারীরা সিজারকে ঘিরে ধরে। পোষাকের ভিতরে লুকোনো ছোরা বের করে তারা ২৩ বার সিজারকে আঘাত করে, ফলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রোমে স্থায়ী একনায়কতন্ত্রী শাসন স্থাপনের যে চেষ্টা সিজার করেছিলেন তা বিফল হলেও তাতেই বোঝা যায় যে, রোমে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি কত ভঙ্গুর ছিল।

প্লুতার্ক রচিত সিজার-জীবনী থেকে

৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিজার নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে গলিয়ার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত রুবিকন নদীর কাছে এসে পেঁছিলেন। সেনাবাহিনীসহ এই সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ—প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। সিজারের সম্মুখে তখন দুটি পথ: হয় রোম শাসন করা, নয় কলঙ্কিত মৃত্যুদণ্ড লাভ। 'গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিজার অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলেন, একবার মনে হচ্ছে এটা করাই ঠিক, পরক্ষণেই আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে যেন ভবিতব্যকে মেনে নিতেই হবে এমনভাবে তিনি উচ্চারণ করলেন: 'ইয়াক্তা এস্ত্ আলেয়া'*, তার পর সীমা পার হবার জন্য এগিয়ে গেলেন।'

'To cross the Rubicon' প্রবাদোক্তির অর্থ—যা থেকে পরে আর পিছানো যাবে না এরকম বিপজ্জনক কর্মের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এশিয়া মাইনরে অতি দ্রুত ও সহজে তাঁর একজন বিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর সিজার মাত্র তিনটি শব্দে তাঁর বিজয়সংবাদ পাঠিয়েছিলেন: 'ভেনি, ভিদি, ভিৎসি'**, অর্থাৎ আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। (এভাবে অতি সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশক বাক্যকে কী বলা হয়?)

? ১. খ্রী. পূ. ২য় শতকের শেষ দিক থেকে খ্রী. পূ. ১ম শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত সময়পরিধিতে রোমক সৈন্যবাহিনীতে কোন্ পরিবর্তন ঘটার ফলে সিজার রোম শাসনের অধিকারলাভে সমর্থ হয়েছিলেন? তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো। ২. সিজার কর্তৃক রোমের শাসনক্ষমতা দখল করার পশ্চাতে তাঁর গলিয়া অভিযানের কী তাৎপর্য নিহিত? ৩. রোমের দরিদ্র জনতার প্রতি সিজার ও গ্রাখি ভ্রাতৃদ্বয়ের আচরণের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? *৪. বিপক্ষদলীয়দের উপর জয়লাভ করার পর সিজারের শাসনের সাথে কোন্সুলদের শাসনের প্রতিতুলনা করো। ন্যূনপক্ষে তিনটি পার্থক্য নির্ণয় করো। ৫. স্পার্তাকাস বিদ্রোহের কত বৎসর পরে সিজার রোমের শাসনক্ষমতা দখল করেন?

* Jacta est alea — দান চালা হয়ে গেছে। অর্থাৎ যা ঘটে গেছে তা থেকে আর পিছাবার কোনো উপায় নেই। The die is east ইংরেজি প্রবাদটি লাতিন প্রবাদের অনুবাদ। — অনু.

** Veni, vidi, vici. — অনু.

§ ৫৩. ওক্তাভিয়ান আউগ্‌স্তুস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে রোম সাম্রাজ্য

(দ্র. মানচিত্র ৯)

মনে করতে চেষ্টা করো — কোন ধরনের রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র বলা হয় (§ ৪৫:৪); কোন ধরনের রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্র বলা হয় (§ ৪২:৪)।

১. প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের পরাজয়। সিজারহত্যার ষড়যন্ত্রকারীরা রোমে কোনো গণসমর্থন লাভ করে নি। খুব কম লোকই প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য আগ্রহী ছিল, কেন না শুধুমাত্র গোটা দশেক অভিজাত পরিবার রোম শাসন করতেন। সিজারের বাহিনী ষড়যন্ত্রীদের মেরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, ফলে চক্রান্তকারীরা প্রাচ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণ মাকিদোনিয়ায় এক সৈন্যবাহিনী গঠনে সমর্থ হয় এবং ইতালি অভিমুখে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

সিজারের লেগিওতে নতুন অধিনায়কের আগমন ঘটলো: একজন তাঁর প্রাক্তন সহকারী **এ্যান্টোনি*** ও অন্যজন সিজারের এক অল্পবয়স্ক আত্মীয় **ওক্তাভিয়ান।** বিশালদেহী ও প্রচন্ড শক্তিশালী এ্যান্টোনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। দুর্বল ও রুগ্‌ণ ওক্তাভিয়ানের না ছিল যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা, না ছিল সেনাপতি হবার ক্ষমতা; কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় ধূর্ত ও সতর্ক, এবং দক্ষ সহকারী নির্বাচনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

এ্যান্টোনি এবং ওক্তাভিয়ান উভয়েই উভয়কে ঘৃণা করতেন, কিন্তু তবু যে একত্র মিলেছিলেন তা কেবল প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। তাঁরা তাঁদের সেনাদল নিয়ে রোমে চলে এসে, কয়েক হাজার বিপক্ষীদের নিহত করে তাদের বিষয়-সম্পত্তি দখল করে নেন। পরে ওক্তাভিয়ান ও এ্যান্টোনি সৈন্যবাহিনীসহ মাকিদোনিয়ায় চলে আসেন। যুদ্ধে **ফিলিপ্পি** নামক এক শহরের কাছে এঁদের সৈন্যবাহিনী প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের পরাজিত করে। ব্রুটাস্ তরবারির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

২. এ্যান্টোনি এবং ওক্তাভিয়ানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এ্যান্টোনি এবং ওক্তাভিয়ান রোম রাষ্ট্রের শাসনভার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। এ্যান্টোনি পূর্বাঞ্চলীয়

* **মার্কুস্ আন্তোনিউস্** (খ্রী. পূ. ৮৩-৩০ অব্দ) বাঙালী পাঠকের নিকট চলচ্চিত্র, শেক্সপিয়রের নাটক, ইত্যাদি নানান সূত্রে মার্ক এ্যান্টোনি রূপে এত পরিচিত যে তাঁর প্রকৃত লাতিন নামের বদলে ইংরেজিতে প্রচলিত — এবং তার মাধ্যমে বাংলাতেও — উচ্চারণটিই এখানে রাখা হলো। — অন.

১. মহামহিম আউগস্তুসের মূর্তি। (পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।) উপরে — দেব-দেবী ও আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত আউগস্তুস। তাঁর মাথার উপরে দেবী পুষ্পমাল্য ধরে রেখেছেন। নিচে — রোমের সেনাদল যুদ্ধে বন্দী ধরে আনছে। ২. জনৈক সম্রাটের সম্মানে রোমে স্থাপিত খিলানাকৃতি বিজয়তোরণ। (আলোকচিত্র।)

প্রদেশসমূহ শাসন করতেন। মিশর রাজ্যের রাজকীয় আড়ম্বরবহুল রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি থাকতেন। ওক্তাভিয়ান থাকতেন রোমে এবং দেশের পশ্চিম দিকের অঞ্চলগুলো শাসন করতেন।

উভয়েই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এ্যান্টোনি নিজের সৈন্যদল ও নৌবাহিনীকে গ্রীসের আক্তিউম্ অন্তরীপে সম্মিলিত করেন। ওক্তাভিয়ানের সেনা ও নৌবাহিনীও এখানেই সমবেত হয়। নৌযুদ্ধে ওক্তাভিয়ান জয়ী হন। এ্যান্টোনি নিজ সৈন্যবাহিনী ছেড়ে জাহাজে চেপে আলেকজান্দ্রিয়া পলায়ন করেন। সেনাপতির অভাবে এ্যান্টোনি-বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

খ্রী. পূ. ৩০ সালে ওক্তাভিয়ানের সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে বসে। এ্যান্টোনি তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মিশরকে রোমের একটি

প্রদেশে পরিণত করা হয়। এভাবে সর্বশেষ গ্রীক-মাকিদোনীয় রাজ্যটিরও পতন ঘটলো।

৩. ওক্তাভিয়ানের শাসন। এ্যান্টোনির বিরুদ্ধে জয়লাভের পর ওক্তাভিয়ান সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও ইম্পেরাতোর উপাধি বজায় রাখেন। প্রজাতন্ত্র নামেই রোম পূর্বের মতো পরিগণিত হতে লাগলো। রোমে সিনেট বসতে লাগলো, গণসভার অধিবেশন এবং প্রতি বৎসর কোন্সুল ও অন্যান্য সরকারি পদে লোকজন নির্বাচিত হতে লাগলো ঠিকই, তবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ওক্তাভিয়ান এদের প্রত্যেককে তাঁর ইচ্ছার সাধারণ নির্বাহকে পরিণত করেন।

গণপরিষদ উচ্চপদসমূহের জন্য হয় স্বয়ং ওক্তাভিয়ানকে, নয়তো তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের নির্বাচন করতো। কোন্সুল ও ত্রিবুনুস বিনাবাক্যে ওক্তাভিয়ানের আদেশ পালন করতো। একদা সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনৈক রোমবাসী কোন্সুল পদপ্রার্থী হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটলো। ওক্তাভিয়ান তাঁর বিরুদ্ধে বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সিনেট থেকে সরিয়ে তাঁর স্বপক্ষাবলম্বীদের নিযুক্ত করেন। সিনেটে সর্বপ্রথম মত তিনিই প্রকাশ করতেন, আর সেনাতোরগণ তখন নির্দ্বিধায় সম্রাটের সিদ্ধান্তানুযায়ী নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। সেনাতোরগণ সম্রাটকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করে — **আউগুস্তুস**, যার অর্থ 'পবিত্র'।

৩০ **খ্রীষ্টপূর্বাব্দ** হতে ১৪ **খ্রীষ্টাব্দ** পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি রোম শাসন করেন।

আউগুস্তুসের সময়ে রোমের শাসনব্যবস্থা

ইম্পেরাতোর

াহিনী সেন্যবাাহনা

গণপরিষদ	কোন্সুল	সেনাতুস
রোমের নাগরিকবৃন্দ	দাসমালিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	ইম্পেরাতোব কর্তৃক নিযুক্ত
ইম্পেরাতোরের পছন্দসই কোন্সুল নির্বাচনের হাতিয়ার	ইম্পেরাতোরের আদেশ ও নির্দেশ বাস্তবে রূপায়ণকারী	ইম্পেরাতোরের অনুকূলে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী

১. দক্ষিণ ডানিয়ুব অঞ্চল বিজয়ের পর ট্রাইয়ান স্থাপিত স্তম্ভ। (আলোকচিত্র।) ২. ট্রাইয়ান স্তম্ভে খোদিত রিলীফ।

শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা রোম শাসন স্থাপন করার ফলে ওক্তাভিয়ান ষড়যন্ত্রকে খুব ভয় পেতেন। সিনেটে তিনি সবসময় বিশ্বাসী সঙ্গী পরিবৃত হয়ে থাকতেন এবং পোষাকের নিচে বর্ম পরতেন।

৪. রোম সাম্রাজ্য; তার দাসমালিকভিত্তিক চরিত্র। আউগুস্তুস প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর পরও বজায় থাকে। বংশধর কোনো উত্তরাধিকারী অথবা সৈন্যবল দ্বারা শাসনক্ষমতা দখলকারী কোনো সম্রাট রোম শাসন করতো। 'ইম্পেরাতোর' শব্দটি নতুন অর্থ লাভ করে — রোমের শাসক মাত্রই এই নামের অধিকারী হলেন। যদিও রোমে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নিয়মকানুন বজায় ছিল, তবু **প্রজাতন্ত্র পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল রাজতন্ত্রে। রোমের রাজতন্ত্রকে বলে সাম্রাজ্য।**

সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে দাসমালিকদের প্রভুত্ব রোমে ও তার প্রদেশগুলোয় আরো সুদৃঢ় হয়। ওক্তাভিয়ান অত্যন্ত গর্বভরে লিখেছিলেন যে, দাসমালিকদের

হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া ৩০ হাজার দাস বন্দী করে তিনি প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেন। কোনো দাস তার মালিককে হত্যা করলে আইন অনুযায়ী সে গৃহে যত দাস থাকতো সকলকেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হতো; একবার একসাথে ৪০০ দাসকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় ইম্পেরাতোরগণ উৎপীড়িতদের বিদ্রোহ দমন করতেন।

দাসমালিকেরা শুধু রোমেই নয়, বিভিন্ন প্রোভিন্‌ৎসিয়ায় সম্রাটের শাসন সমর্থন করেছিল।

৫. রোম সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বিজয়াভিযান। ১১৫-১১৬ খ্রীষ্টাব্দে অভিজ্ঞ ও উদ্যমী সেনাপতি ইম্পেরাতোর **ত্রাইয়ান** তাঁর বাহিনী নিয়ে মেসোপটেমিয়া অভিযান করেন। এর আগে কখনো রোমের লেগিও প্রাচ্যের অত দূরাঞ্চল অবধি অগ্রসর হয় নি। কিন্তু রোমের অধীনস্থ প্রদেশগুলোয় বিজিত জনতার বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাওয়ায় ত্রাইয়ান তাঁর অভিযান থামিয়ে বিদ্রোহদমনে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন।

ত্রাইয়ানের এই অভিযান ছিল রোমক সেনাবাহিনীর সর্বশেষ বিজয়াভিযান। বিদ্রোহ দমন ও সীমান্ত রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের প্রচুর সৈন্যবলের প্রয়োজন দেখা দেয়। ত্রাইয়ান এশিয়ায় প্রায় সমস্ত দখলীকৃত অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কেন না সেগুলো বজায় রাখতে বিশাল সেনাবাহিনীর দরকার হতো। **খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথম দিকে আগ্রাসী যুদ্ধাভিযান বন্ধ করে অধিকৃত ভূভাগ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বড়ো হয়ে দেখা দেয়।**

'দেবপ্রতিম আউগুস্তুসের কীর্তি' নামধারী শিলালিপি থেকে

শিলালিপির ভিত্তিতে ১ম শতাব্দীতে রোমের অধিবাসী সম্পর্কে কী জানা যায়? আউগুস্তুসের ধনসম্পদ ও রোম রাষ্ট্রে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে কী বলতে পারি আমরা?

'...দশম বার যখন আমি কোন্সুল হই, তখনো আমি আরেকবার আমার সম্পত্তি থেকে প্রত্যেক লোককে চার শ' সেস্তের্তিউস্ (রোমে প্রচলিত চাঁদির মুদ্রা) করে দান করি; আর একাদশতম কোন্সুলত্বকালে আমি আমার নিজ সামর্থ্যে ক্রীত খাদ্যসামগ্রী মোট বারো বার লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করেছিলাম; এবং যখন আমি দ্বাদশ বারের জন্য ত্রিবুনুস হলাম তখন তৃতীয় বার আমি প্রত্যেককে চার শ' সেস্তের্তিউস্ দান করি। ন্যূনপক্ষে আড়াই লক্ষ লোক আমার দান লাভ করতো। যখন আমি অষ্টাদশতম বার ত্রিবুনুস্ হই এবং দ্বাদশ বারের জন্য কোন্সুল, তখন আমি শহরের তিন শ' কুড়ি হাজার গরিব লোকজনদের প্রত্যেককে দু'শ'

রঙিন ছবি ১॥ আদিম কালে যূথবদ্ধ মানুষের দল। **অঙ্কিত চিত্রে ছবিগুলো যে মানুষেরই তা কীভাবে প্রমাণ করবে? আধুনিক মানুষ ও চিত্রাঙ্কিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই আদিম মানুষদের পক্ষে তুষারহিমযুক্ত আবহাওয়ার এলাকায় বসবাস করা সম্ভব হয়েছিল কি? কেন হয়েছিল? বর্তমান গ্রন্থের মধ্যে কোথায় সেই আকর তথ্যাদি দেওয়া আছে যার ভিত্তিতে আদিম মানুষের চেহারা ও তাদের ব্যবহৃত শ্রম-হাতিয়ারের গড়ন এখানে অঙ্কন করা সম্ভব হয়েছে?**

রঙিন ছবি ২॥ গুহাভ্যন্তরে বসবাসকারী গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী। **গুহাবাসীরা কী কাজে ব্যস্ত রয়েছে? পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রমবিভাগ করে নেয়া হয়েছে কীভাবে? ছবিতে অঙ্কিত মানুষেরা যে সব শব্দ বলতে পারতো, সেরকম অন্তত দশটি শব্দ কল্পনা করে বলো।**

রঙিন ছবি ৩॥ বুনো ঘোড়া শিকারের দৃশ্য। বইয়ের কোন্‌খানে এরকম শিকারের বর্ণনা আছে, খুঁজে বের করো। শিকারীরা একা একা বসবাস করলে তাদের পক্ষে খাওয়া-পরার কোনো কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না কেন?

রঙিন ছবি ৪॥ আদিম শিল্পী। বামদিকে অংকিত ছবির সাথে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই চিত্রের কোথায় সঙ্গতি রয়েছে?

রঙিন ছবি ৫॥ প্রাচীন কালে নীল নদের অববাহিকা। ডাইনে: কৃষকেরা নিজ নিজ জমিটুকরো চাষ করছে। একদল ফসল কাটছে, অন্যদল সেই মরশুমেই জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে এবং বীজ ছড়াচ্ছে। শাদুফের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে। বামে: দাসনির্ভর অর্থনীতি। **কী কী লক্ষণ থাকার ফলে দাসনির্ভর অর্থনীতি ও কৃষকদের অর্থনীতি আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায়?**

রঙিন ছবি ৬॥ প্রাচীন মিশরে খাজনা আদায়। **বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন মিশরী চিত্র ও রচনার আলোকে চিত্র অংকিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও।**
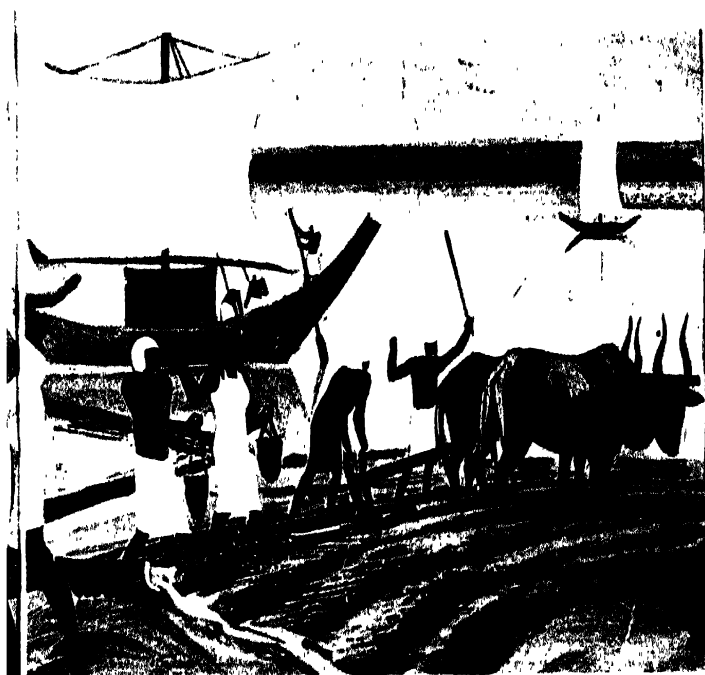
রঙিন ছবি ৭॥ প্রাচীন মিশরে পাহাড় থেকে পাথর ভাঙার কাজ। পাহাড়ের পাথরের মধ্যে তারা প্রথমে ছোটো আকারের ছিদ্র করে তার মধ্যে কাঠের কীলক গ‍ুঁজে দিয়ে তাতে জল ঢালতো। জল পেয়ে কাঠ ফে‍ঁপে উঠতো এবং পাহাড়ের গা থেকে সম্পূর্ণ একটা বড়ো পাথরের চ্যাঙড় ভেঙে বেরিয়ে আসতো। তামার তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই পাথর যত্নসহকারে ঘষামাজা করা হতো। দড়ি দিয়ে তখন প্রস্তরখণ্ডটি বেঁধে বহু লোক একসঙ্গে টানতে টানতে নীল নদের ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলতো যাতে সেখান থেকে নির্মাণক্ষেত্রে পাঠানো যায়। পাথর ভাঙার এই সুকঠিন শ্রম দাস এবং দণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পন্ন করা হতো।

রঙিন ছবি ৮॥ আসিরীয় সৈন্যদলের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। পিছনে আসিরীয় সম্রাটের রাজপ্রাসাদের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। বামে: মন্দিরের চূড়া দৃশ্যমান। আর এসবের সামনে — অশ্ববাহিত রথে সম্রাট, তাঁর পিছনে অনুসরণরত সেনাবাহিনী। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং গাধা ও উট পিঠে লুণ্ঠিত মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।
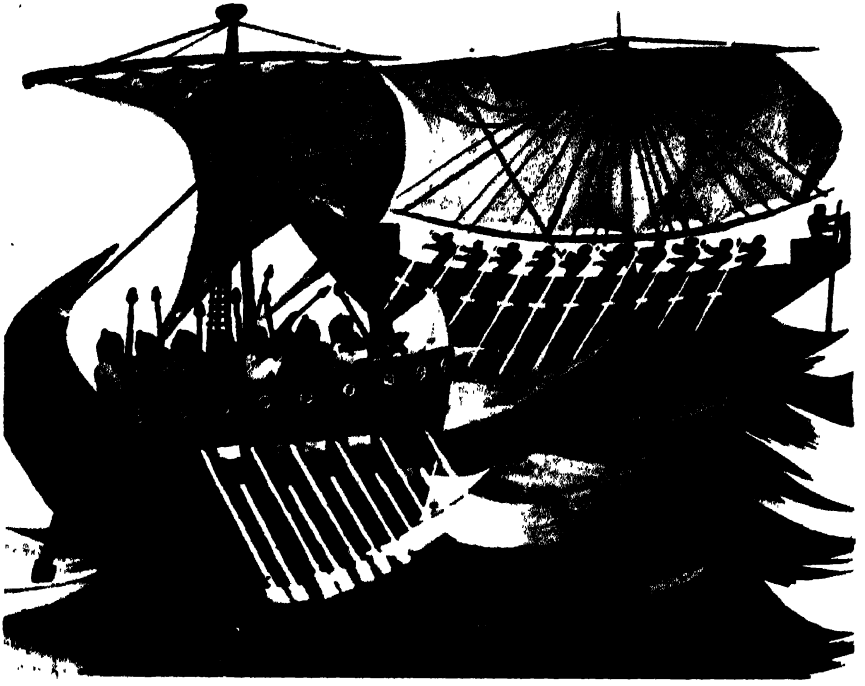
রঙিন ছবি ৯॥ ফিনিসীয় যুদ্ধজাহাজ একটা সওদাগরী জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বর্তমান গ্রন্থের কোথায় এধরনের আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, খুঁজে বের করো।

রঙিন ছবি ১০।। চীনে 'হলুদ পট্টির' বিদ্রোহ। যোদ্ধাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাবার সময় বিদ্রোহীদল আক্রমণ করে বসেছে। সামনে বামদিকে একটি ছইগাড়ি, তার উপরে চিত্রলিপিতে লেখা 'ৎসিয়া-ৎসি' — যার অর্থ 'নব যুগ': বিদ্রোহে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানোর প্রতীক ছিল এই দুটি কথা। ছইগাড়ি ও গাছের আড়ালে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে আছে। ডাইনে দূরে জনবসতি এবং জমিদারের ঘরবাড়ি পুড়তে দেখা যাচ্ছে।
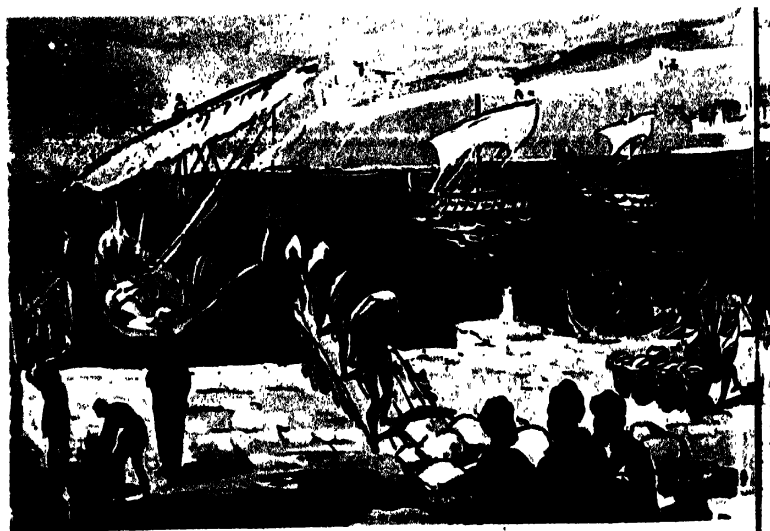
রঙিন ছবি ১১॥ মারাথনের যুদ্ধ। যখন পারসীক বাহিনীর বৃহদাংশ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে আর মাত্র জনা কয়েক যোদ্ধা শত্রুদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে — সেই মুহূর্তটি এই ছবিতে ধরা পড়েছে। দূরে — পারসীকদের জাহাজ। **পারস্য বাহিনী ও গ্রীক যোদ্ধাদের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে তুলনা করো।**

রঙিন ছবি ১২॥ খ্রী. পূ. ৫ম শতকে পিরেউস বন্দর। বামে: দাসরা আথেনীয় মৃৎপাত্রাদি জাহাজে বোঝাই করছে। পাশেই দূরদেশ থেকে নিয়ে আসা গমের বস্তাও তারা জাহাজ থেকে খালাস করছে। ঈষৎ ডাইনে — সদ্য ধরা মাছ নৌকো থেকে নামিয়ে জেলেরা বয়ে আনছে। জাহাজ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদের নিয়ে আসা হচ্ছে বিক্রির জন্য। সামনেই দাস কেনা-বেচার বাজার। ঠিক উল্টোদিকে উপসাগরের উপকূলে দীর্ঘ প্রস্তরপ্রাচীর। **সাগরের বুকে ভাসমান জাহাজের কোন্‌টি সওদাগরী আর কোন্‌টি যুদ্ধজাহাজ, কীভাবে সনাক্ত করবে?**

রঙিন ছবি ১৩॥ আথেন্সের কুম্ভকার। বামে: দাসরা পা দিয়ে মাটি ছানছে। তারপর চাঙ্গাড়িতে করে কুমোরের কাছে বয়ে আনছে। কুমোর তখন সেই মাটি দিয়ে তার জিনিস বানাচ্ছে। কুমোরের চাকা ঘোরাচ্ছে দাস। ডাইনে: শিল্পী মৃৎপাত্রাদির উপর ছবি আঁকছে। পিছনে: কুম্ভকারের বিশাল চুল্লী — তার হাতে তৈরি মাটির জিনিসপত্র পোড়াবার জন্য।

রঙিন ছবি ১৪।। আথেন্সে গণ-সম্মেলন। ভোটদানের মুহূর্ত ছবিতে বিধৃত হয়েছে। সদ্যমাত্র ভাষণ শেষ করে বাগ্মী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সম্মুখভাগে — কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তি; তারা দেমোসদের অধিকাংশের দাবির সমর্থনে ভোটদানে কোনো অংশ নেবে না। নাগরিকদের অধিকারবঞ্চিত ব্যক্তিকে চাবুক হাতে প্রহরী তাড়া করছে। **ছবিটিতে কী লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছো যে আথেন্সে একটি সম্মেলন বসেছে?**
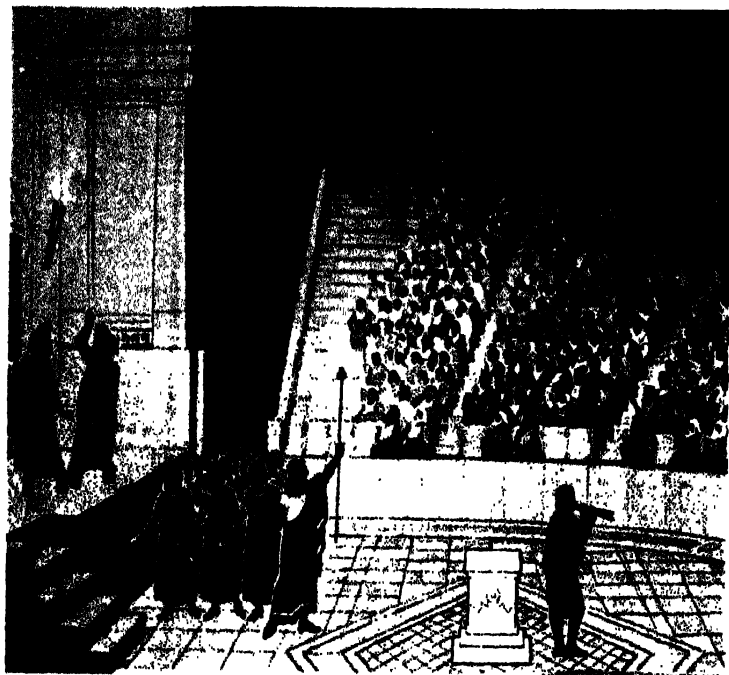
রঙিন ছবি ১৫॥ গ্রীক থিয়েটার। ওর্খেস্ত্রার উপরে ঐকতানসঙ্গীতের গায়কদল দাঁড়িয়ে আছে, আর বেদীর নিকটে — বংশীবাদক। স্কেনে-র সামনে, ওর্খেস্ত্রার পিছনে মঞ্চের উপরে দুই অভিনেতা। দর্শকদের বসার জায়গা পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত হয়েছে; সবচেয়ে সামনের সারিগুলোয় পুরোহিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসীন। খ্রী. পূ. ৪র্থ শতকে গ্রীক থিয়েটার যেমন ছিল, সেভাবেই এ ছবিটি অঙ্কিত হয়েছে। মঞ্চে ট্র্যাজেডি না কমেডি — কী অভিনীত হচ্ছে বলে তোমার ধারণা?

ছবি ১৬॥ প্রাচীন গ্রীসে অশ্ববাহিত রথচালন প্রতিযোগিতা। যে প্রাচীন গ্রীক ছবির ভিত্তিতে এ চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে, সেই ছবিটি এই বইয়ের ভিতরে কোথায় আছে দেখাও।
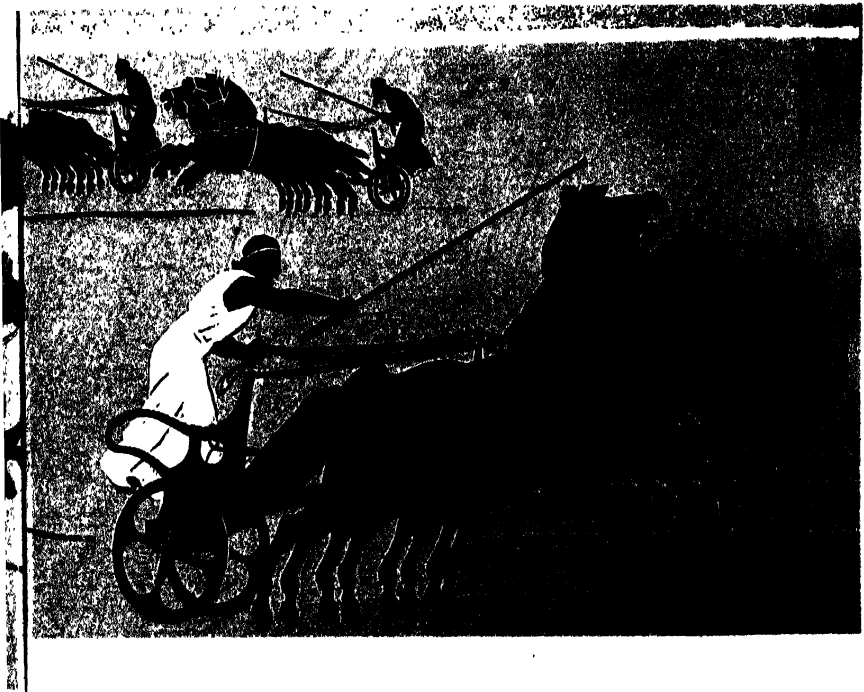
রঙিন ছবি ১৭॥ রোমে বিজয়োৎসব। সম্মুখভাগে শিকলে বাঁধা সম্ভ্রান্তবন্দীদের দল, তাদের মধ্যে শিশু এবং নারীও রয়েছে। সাদা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে সেনাপতিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। পিছনে দাস সোনার তৈরি মালা তাঁর মাথার উপরে ধরে রেখেছে।

রঙিন ছবি ১৮॥ রোমক দাসমালিকের ধনসম্পত্তি। বামে: আঙুরের রস বের করার জন্য মাড়াইকল। ডানদিকে: শস্য ভাঙার যাঁতাকল; এর পিছনে দাসদের জন্য তৈরি ছাউনি-কারাগার। সামনে — দাসকে প্রহাররত পরিদর্শক। মাঝখানে: এসবের মালিক দাঁড়িয়ে আছে।

রঙিন ছবি ১৯॥ রোমের আম্ফিথিয়াটারের দৃশ্য। দুজন গ্লাদিয়াতোরের মধ্যে যুদ্ধ এইমাত্র শেষ হয়েছে। যোদ্ধাদের একজন ভারি অস্ত্রে সুসজ্জিত, আর অন্যজনের আছে জাল এবং ত্রিশূল। দর্শকগণ পরাজিত ব্যক্তির ভাগ্য কী নির্ধারণ করে তা শোনার জন্য জয়ী যোদ্ধা অপেক্ষা করছে।

রঙিন ছবি ২০॥ স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ। **অভ্যুত্থানের কোন্ মুহূর্ত ছবিতে ধরা পড়েছে বলো।**

রঙিন ছবি ২১॥ সাম্রাজ্য পত্তনের পরে রোমের অবস্থা। ছবিতে বহুতল ভবন দেখা যাচ্ছে। বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে সরু অন্ধকার গলি। বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বৃষ্টির সময় রাস্তা পার হবার জন্য রাস্তার উপরে পাথর ফেলে দেয়া হতো। চারজন দাস পাল্কীতে করে জনৈক ধনী রোমক ভদ্রলোককে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছবির মধ্যভাগে — গরিবদের রুটি বিতরণের জন্য ছোট্টো ঝুপড়ি দোকান। গ্লাদিয়াতোরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা সকলকে জানিয়ে দেবার জন্য দেয়ালে প্রচারলিপি লিখছে একজন। ডাইনে — ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসভবন। বাড়ির ভিতরে মালিক আসছে, ক'জন সঙ্গী তাকে ঘিরে রেখেছে — কেউ-বা তার কাছ থেকে দান পাবার অপেক্ষায়, কেউ-বা মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ।

রঙিন ছবি ২২॥ 'বর্বরদের' দ্বারা রোম লুণ্ঠন। কোন্ ধরনের জিনিস তারা লুণ্ঠন করছে, আর কী তারা অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে ফেলে দিচ্ছে বলো।

চল্লিশ সেস্তের্‌তিউস্‌ করে মুদ্রা দান করি এবং যুদ্ধে অর্জিত লুণ্ঠনসামগ্রী থেকে আমি হাজার সেস্তের্‌তিউস্‌ করে মুদ্রা আমার সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করি—এই উপহারটি প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সেনা লাভ করেছিল। ত্রয়োদশতম কোন্‌সুলত্ব লাভের সময়ে আমি দু'লক্ষ লোককে মাথাপিছু দু'শ' চল্লিশ সেস্তের্‌তিউস্‌ করে মুদ্রা দান করি।

সৈন্যদের যে জমি বিতরণ করেছিলাম তার অর্থও আমি ব্যয় করি; সব মিলিয়ে তার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ছিয়াশী কোটি সেস্তের্‌তিউস।'

আউগ্‌বুস্তুসের সমকালীন কবি ভের্গিলিউসের* কাব্য 'এনেঈদ্‌' থেকে

২০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এস্খিলোসের সালামিস যুদ্ধের বর্ণনা ও ভের্গিলিউসের এই কবিতার মধ্যে প্রতিতুলনা করো। গ্রীক ও রোমক কবি কার জয়গাথা গেয়েছেন?

মধ্যভাগে রণতরী শোভিছে দুইটি;
উভয়েরই তাম্রগাত্র রৌদ্রে ঝলসিছে...
দেখ ঐ চলিলেন রণে আউগ্‌বুস্তুস
সাথে লয়ে ইতালির বীরপুত্র সবে,
সেনাতুস্‌ আর যত বীর নাগরিকে...
আরো দেখ — প্রাচ্যজয়ী এ্যাণ্টোনি আসে
লোহিত সাগর হতে জয়মাল্য লয়ে।
সহস্র দাঁড়ের ঘায়ে ফেনিল সাগর,
তীক্ষ্ন দেহে কেটে জল রণতরী ধায়,
ফেনোচ্ছ্বাসে ফোটে যেন ফেনিল জলধি।
ছোটে তীর শন্‌শন্‌, অলাতচক্র
উড়িছে চৌদিকে দেখ...

প্রবেশি রোমের দ্বারে জয়ী আউগ্‌বুস্তুস
দেব-দেবী চরণেতে বন্দি প্রথমেতে
সমগ্র নগরে গড়েন তিনশত বেদী।
পথেঘাটে কোলাহল আনন্দ উল্লাস,
...সারবন্দী চলিয়াছে বন্দী পরাজিত —
অস্ত্র, পোষাক ও ভাষাতে নানান।

? ১. 'ইম্পেরাতোর' শব্দের প্রাথমিক অর্থ কী ছিল এবং আউগ্‌বুস্তুসের সময়ে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে কী দাঁড়ায়? ২. প্রমাণ করো যে ওক্তাভিয়ানের সময়ে রোমে রাজতন্ত্র

* পুব্লিউস্‌ ভের্গিলিউস্‌ মারোনিস্‌ (Publius Vergilius Maronis) ৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মারা যান। 'Aeneid' তাঁর সর্বাধিক খ্যাত কাব্য। ইংরেজির অনুকরণে বাংলায় এই কবি ভার্জিল (Virgil) রূপে এবং তাঁর কাব্য 'ঈনীড' রূপে সাধারণত লিখিত হয়ে থাকে। — অনু.

স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীন কালের প্রাচ্যদেশীয় রাজতন্ত্রের সাথে তার কী পার্থক্য বিদ্যমান ছিল? ৩. রোম সাম্রাজ্য কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতো? তোমার উত্তর যুক্তিসহ প্রমাণ করো। ৪. রোম সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রোম কর্তৃক বিজিত দেশগুলো মানচিত্রে দেখাও। রোম রাষ্ট্রের সীমানা কখন সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়েছিল? সাম্রাজ্য-সীমা প্রসারের চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষায় কেন মনোনিবেশ করতে হয়েছিল? কত শতাব্দী ধরে ইতালির বাইরে রোম তার আগ্রাসী যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিল, হিসাব করে বলো। ৫. ওক্তাভিয়ান কত বৎসর যাবৎ একা রোম শাসন করেছিলেন? এখন হতে কত বৎসর পূর্বে তাঁর শাসনকাল শুরু হয়, এবং কবে তা শেষ হয়েছিল?

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রজাতন্ত্রের শেষ থেকে সাম্রাজ্যস্থাপনের শুরু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোমক সংস্কৃতি ও জনজীবন

§ ৫৪. প্রাচীন রোমের শিল্পকলা

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন গ্রীসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দুটি কাব্য; খ্রী. পূ. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীক ভাস্করগণ তাদের শিল্পকর্মে কাদের রূপায়িত করতো (§ ৩৮:২; § ৪০:২)।

১. রোমে গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব। রোমক সংস্কৃতিতে হেল্লাসের উন্নততর সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে।

ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত গ্রীক উপনিবেশসমূহে রোমবাসীরা গ্রীসের ভাষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সাথে পরিচিত হয়েছিল। গ্রীক বর্ণমালার ভিত্তিতে তারা **লাতিন বর্ণমালা** সৃষ্টি করে।

রোমে হেল্লেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব আরো বেশি হয় যখন রোমবাসীরা গ্রীস অধিকার করে তখন। জনৈক রোমক কবি লিখে গেছেন: 'বন্দী দশায় আবদ্ধ গ্রীস তার বর্বর বিজয়ীকে শিল্প দ্বারা নিষ্ঠুর **লাৎসিউমে*** বন্দী করে রেখেছে।' গ্রীস থেকে মূর্তি ও ছবি রোমবাসীরা তাদের স্বদেশে নিয়ে এসেছিল। গ্রীসের স্থপতি, চিত্রী ও ভাস্করগণ ধনী রোমকদের ফরমাশে কাজ করেছেন। গ্রীক নাট্যশালার আদলে ইতালির বিভিন্ন শহরে রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়েছে। রোমের অভিজাত যুবকেরা হেল্লাসের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত। 'অলিম্পীয় দেব-দেবীদের পূজা করতো রোমবাসীগণ; দেব-দেবীদের অবশ্য তারা ভিন্ন নামকরণ করেছিল — যেমন, জিউসকে তারা বলতো ইউপিতের্ (Jupiter)। (কোন্ দেবতার নাম হয়েছিল ভুলকান্ — Vulcan — অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি, ভেবে বলো; দ্র. § ২৯:২।)

* **লাৎসিউম্** (Latium) অর্থাৎ লাতিন জাতির বাসভূমি বলতে কবি 'রোম' বুঝিয়েছেন।

১ ইতিহাস ও কাব্যলক্ষ্মীসহ ভের্গিলিউস। (রোমে তৈরি মোজাইক চিত্র। নানা রংয়ের ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো জোড়া দিয়ে দিয়ে যে ছবি ও নক্সা তৈরি করা হয় তাকে মোজাইক বলে। ২. বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণে রোমকদের তৈরি খিলান দেওয়া সেতু। (আলোকচিত্র)। সেতুর নিচ দিয়ে জল সরবরাহ হচ্ছে। জলের উপরিভাগ থেকে সেতুর উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার। ৩ রোমের ধর্মমন্দির। (আলোকচিত্র।) **গ্রীক ও রোমক নির্মাণকৌশলের মধ্যে প্রতিতুলনা করো। রোমক স্থপতিরা গ্রীকদের কাছ থেকে কী নিয়েছিল? গ্রীক ও রোমক স্থাপত্যের মধ্যে কী কী জিনিস তোমার ভালো লাগে?** ৪ রোমের বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক সিসেরো। ৫ পোম্পেই শহরের জনৈক কুসীদজীবীর আবক্ষ মূর্তি।

অবশ্য রোমের সংস্কৃতি গ্রীসের শুধুমাত্র অনুকরণ ছিল না। গ্রীকদের কাছে শিখে তারা নিজেরা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছিল।

২. রোমের সাহিত্য: ক) 'বস্তুপ্রকৃতি সম্বন্ধে'। রোমান সাহিত্যের অজস্র রচনার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে De rerum natura ('বস্তুপ্রকৃতি সম্বন্ধে') নামে একটি কাব্য। খ্রী পূ ১ম শতকের বিজ্ঞানী ও কবি **লুক্রেৎসিউস্***

* **তিতুস্ লুক্রেৎসিউস্ কারুস** (Titus Lucretius Carus) — ৯৯-৫৫ **খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।** — অনু

২
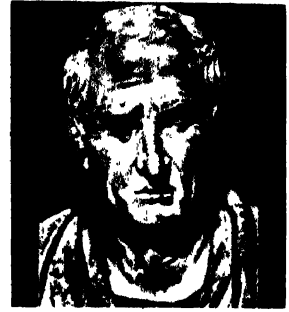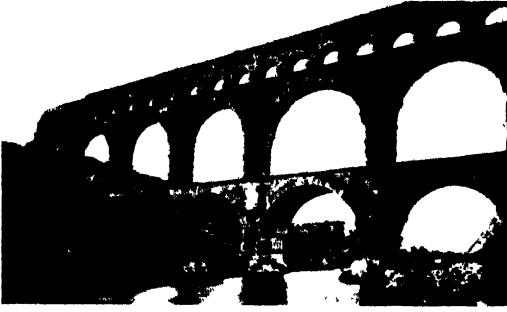
৩

তার রচয়িতা। সেকালের তুলনায় অতিশয় আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস কাব্যটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তাঁর ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতি অণু দ্বারা গঠিত। তারা পরস্পরে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে নক্ষত্র, পৃথিবী, জীবিত প্রাণীকুল, এমন কি মানুষের আত্মা পর্যন্ত নির্মাণ করেছে। তিনি আত্মার অমরতা ও পরলোক অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছেন যে, মানুষ যে আগুন, লোহা, চাষবাসের কলাকৌশল হাতে পেয়েছে তা কোনো দৈবী করুণার দান নয়, মানুষ নিজের শ্রম দ্বারা তা অর্জন করেছে।

ধর্মকে লুক্রেৎসিউস্ লাগামের সাথে তুলনা করেছেন যে লাগাম মানুষের চিন্তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ধর্ম উদ্ভবের কারণ, তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতা ও ভয়। বজ্রপাত, ভূমিকম্প, মানুষের নিদ্রার কারণাদির তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। লুক্রেৎসিউস্ তাঁর রচনা পদ্যে লিখে গেছেন।

খ) রোমান কবিতার 'স্বর্ণযুগ'। 'এনেঈদ'। খ্রী. পূ. ১ম শতকের শেষ পাদে এবং খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের প্রারম্ভে প্রাচীন রোমের বহু প্রতিভাবান কবি বসবাস করতেন। এই সময়কে রোমের কবিতার 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১. পান্থেওন্। (মডেল।) ভিতর ও বাহির ভালোভাবে দেখাবার জন্য পান্থেওনের মডেল এখানে কেটে বিভক্ত করা হয়েছে। মেঝের উপরের দাগগুলো স্তম্ভ ও দেয়ালের অবস্থান নির্দেশ করছে। কুপলা-র মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে মন্দিরে আলো আসতো। **২.** খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের জনৈক সম্রাটের মূর্তি। **কোন্ গ্রীক বীরের চেহারার আদলে স্থপতি সম্রাটকে তৈরি করেছেন?**

আউগুস্তুস্ কবিদেরকে নিজের দলে টানার সর্বদা চেষ্টা করতেন। তাঁর ধনী বন্ধু **মেৎসেনাসের** (Maecenas) প্রাসাদ সর্বদাই কবিকুলের জন্য উন্মুক্ত থাকতো। গৃহস্বামী কবিদের মুক্তহস্তে উপহার দিতেন। 'মেৎসেনাস্' শব্দের অর্থ পরে দাঁড়িয়ে যায় 'শিল্পকলার ধনী পৃষ্ঠপোষক'।

রোমের কবিদের মধ্যে **ভের্গিলিউস্** ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত কবি। প্রায় দশ বৎসর ধরে তিনি তাঁর কাব্য 'এনেঈদ্' রচনা করেন। এই কাব্যে ট্রয় নগরীর পুরাণকথিত রক্ষাকারী দেবীপুত্র **এনেঈস্** (Aeneis) সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এনেঈস্ দেবতাদের সাহায্যে ট্রয়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান; তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে অগ্নিদাহে ভস্মীভূত নগর থেকে কাঁধে তুলে বের করে নিয়ে আসেন। অতঃপর অসাধারণ নানা রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর পর তিনি ইতালিতে বসবাস করতে থাকেন। এনেঈস্ মৃতদের রাজ্য ভূগর্ভস্থ প্রেতপুরীতে গমন করেন। সেখানে রোমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মৃত পিতার আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, রোমবাসীরা 'অধীনস্থদের ক্ষমা এবং অবশীভূতদের অধীন করে' সারা পৃথিবীর জনগণের উপর প্রভুত্ব করবে। পিতার আত্মা এনেঈস্‌কে তাঁর বংশধরদের দেখায়। তন্মধ্যে 'দেবপ্রতিম

২

আউগস্তুস্'ও ছিলেন; তিনি লাৎসিউমে শান্তি ফিরিয়ে দেবেন এবং এমন কি রোমের বহুদূরে বসবাসকারী জনগণকেও ভয়ে কম্পমান হতে বাধ্য করবেন (দ্র. ৩০৫ পৃষ্ঠায় 'এনেঈদ্' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি।)

'এনেঈদ্' যেন হোমারের কাব্যের সম্প্রসারণ। একই ধরনের উদাত্ত ও ভাবগম্ভীর শৈলীতে এ কাব্যটিও রচিত। ভের্গিলিউস্ তাঁর কাব্যে নির্ভীকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণাবলীর গৌরবগান করেছেন। **সাম্রাজ্য এবং স্বয়ং আউগস্তুস্‌কে মহিমান্বিত করার অভিপ্রায়ে কবি ধর্মবিশ্বাস এবং গ্রীক ও রোমকদের প্রাচীন লোককথাকে অতি দক্ষতার সাথে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।**

৩. রোমের স্থাপত্যশিল্প। রোমের বিশাল ও মহা আড়ম্বরপূর্ণ ইমারতগুলো সারা দুনিয়ার সামনে রোমক সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রাচুর্যের বহিঃপ্রকাশ রূপে উপস্থিত। রোমকগণ গ্রীক স্থপতিদের শিল্পোৎকর্ষতা যেমন প্রয়োগ করেছে, তেমনি নতুন বহু অবদানও রেখে গেছে। রোমে আবিষ্কৃত কংক্রীট খুব শক্তভাবে পাথর জোড়া লাগাত, এর ফলে খিলান ও গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ সম্ভবপর হয়েছিল।

খিলান বলতে ধনুকাকৃতি আচ্ছাদন বোঝায়; এর ইংরেজি প্রতিশব্দ arch-য়ের উৎপত্তিস্থল একটি লাতিন শব্দ 'আর্কুস' (arcus), যার মানে — ধনুক। শহরের প্রশস্ত চকে এবং পথে সম্রাটের সম্মানে **খিলানাকৃতি বিজয়তোরণ** (triumphal arch) নির্মিত হতো। সেতু, প্রাসাদ ও **জলসরবরাহ পথ** নির্মাণে প্রায়ই খিলান

ব্যবহার করা হতো। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ঝর্ণা থেকে নিচে রোমবাসীগণ জলসরবরাহ পথ তৈরি করেছিল যা উপর থেকে সোজা নিচে নেমে আসতো। জলসরবরাহ পথ নির্মাণের জন্য তারা নিচু জায়গাগুলোর নালীসহ খিলানাকার সেতু তৈরি করতো যার মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত হতো। (দ্র. ৩০৯ পৃষ্ঠা)। ১০টিরও বেশি জলসরবরাহ পথ রোমে ঝর্ণার জল সরবরাহ করতো।

গম্বুজ হলো — গোল ছাদ। প্রায় অবিকৃতভাবে অদ্যাবধি বর্তমান রোমের যাবতীয় দেব-দেবীদের দেবালয় পান্থেওন্ গম্বুজের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই মন্দিরের উপরের অংশ 'কুপলা'* অর্থাৎ বিরাটাকার উল্টো-করা পেয়ালা সদৃশ ছাদে ঢাকা।

৪. রোমক ভাস্কর্যশিল্প। রোমক ভাস্কর্যের চরম সাফল্য হচ্ছে পূর্ণাবয়ব এবং আবক্ষ মূর্তি দ্বারা মনুষ্যপ্রতিকৃতি নির্মাণ। নির্মিত মূর্তিতে ভাস্কর শুধু মানুষের মুখাবয়বই অবিকলভাবে গড়ে তুলতেন তা নয়, মানুষের মনোজগৎও উদ্ঘাটন করতে পারতেন। কুসীদজীবীর আবক্ষ মূর্তি রচনায় ভাস্কর সদাচিন্তিত এক কৃপণ ও নির্মম ব্যক্তির মুখচ্ছবি গড়েছেন; পোম্পাইকে মূর্খ ও আত্মতুষ্ট লোক রূপে চিত্রিত করেছেন। রোমের বিখ্যাত বক্তা ও লেখক সিসেরোর** মূর্তিতে চোখে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ, অবজ্ঞাভরা চাপা ওষ্ঠদ্বয় মানুষের প্রতি তাঁর অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। (দ্র. ২৯৬ ও ৩০৯ পৃষ্ঠা।)

রোমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ভাস্করগণ সম্রাটের গুণগান করতে বাধ্য হতো। তারা সম্রাটকে দেব, দৈত্য ও পুরাণের বিভিন্ন চরিত্ররূপে নির্মাণ করতো। দুর্বল আউগুস্তুস্‌কে হাতে জয়দাত্রী দেবীসহ শক্তিশালী ইউপিতের্ রূপে দেখানো হয়েছে। খিলান ও বিভিন্ন ভবন যে সব মর্মরখচিত রিলীফ দ্বারা অলঙ্কৃত হতো তাতে সম্রাটের বিজয়ী মূর্তি ও রোমের সফল বিজয়াভিযান খোদাই করা থাকতো।

? ১. কোন্ গ্রীক বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে লুক্রেৎসিউস্ আরো উন্নত করেছিলেন? ২. ভের্গিলিউস্ তাঁর রচনা দ্বারা পাঠককে কোন চেতনা ও ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন? 'এনেঈদ্' কাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে তা বোঝাও। লুক্রেৎসিউস্ এবং ভের্গিলিউসের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য দেখাও। ৩. রোমে সম্রাটের শাসন দৃঢ়তর করার কাজে কীভাবে ধর্ম ও শিল্পকলা ব্যবহার করা হয়েছে? ৪. স্থাপত্যশিল্পে রোমক

* লাতিনে cupula, ইংরেজিতে cupola, স্থাপত্যবিদ্যার এটা একটা পরিভাষা। বাংলায় cupola-কে সর্বদা গম্বুজই বলা হয়ে থাকে। — অনু.

** মার্কুস্ তুল্লিউস্ কিকেরো (Marcus Tullius Cicero) নাম বাংলা ভাষায় সর্বদা সিসেরো নামে লেখা হয়ে থাকে। বোঝবার অসুবিধে হতে পারে বলে লাতিন উচ্চারণের বদলে প্রচলিত বাংলা উচ্চারণ দেয়া হলো। — অনু.

ভাস্করগণ নতুন কী অবদান রেখে গেছেন? ৫. রোমে বিকশিত স্থাপত্যশিল্পের সাথে খ্রী. পূ. ৫ম শতকের গ্রীক স্থাপত্যকলার কী পার্থক্য বিদ্যমান? এই পার্থক্যের কারণ কী? উভয় দেশের স্থাপত্যনির্মাণের মধ্যে তোমার কী কী ভাল লাগে?

§ ৫৫. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর রোম নগরী

মনে করতে চেষ্টা করো—রোমে দরিদ্র জনগণের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কী (§ ৫০:১)।

১. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর 'ফোরুম' ও 'পালাতিন'। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী নগরসমূহের মধ্যে রোম সর্বাপেক্ষা বিরাট আকার ধারণ করেছিল। শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। তিবের্ নদীর উভয় তীরেই নগর প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রস্তরনির্মিত প্রধান প্রধান রাজপথগুলো ফোরুমে গিয়ে মিলতো। প্রায় প্রত্যেক সম্রাটই খ্যাতি অর্জনের জন্য ফোরুম চত্বরের উপরে জমকালো ইমারত তৈরি করতো এবং নিজের মূর্তি স্থাপন করতো। ত্রাইয়ান্ নিজের বিজয়াভিযানের সাফল্য উদ্‌যাপনের জন্য ৪০ মিটার উঁচু এক বিশাল স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। ফিতার আকারে মর্মরখচিত রিলীফ স্তম্ভগাত্রে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত জড়ানো ছিল। যুদ্ধ, নদী অতিক্রম করে সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা, শত্রুপক্ষীয়দের গ্রাম ধ্বংস করা ও যুদ্ধের আরো অনেক দৃশ্য তাতে খোদিত হয়েছিল। আর স্তম্ভের শীর্ষদেশে বসানো হয়েছিল সম্রাটের মূর্তি। (এই স্তম্ভের আলোকচিত্র বর্তমান গ্রন্থে কোথায় আছে খুঁজে বের করো।)

ফোরুম একটি সাধারণ বাজার-চত্বর থেকে খোলা আকাশের নীচে এক বিরাট প্রদর্শনীশালায় উন্নীত হয়।

ফোরুমের একপাশে ছিল **পালাতিন টিলা।** তার উপরে শ্বেতপাথরে তৈরি স্বর্ণখচিত রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। (দ্র. ৩১৫ পৃষ্ঠা।)

২. দাসমালিকদের জীবনযাত্রা। রাজপ্রাসাদের চারপাশে তাকে ঘিরে রোমের অভিজাতবর্গের পাড়া গড়ে উঠেছিল। ধনী দাসমালিকদের ভবন ছায়াচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঘরের দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো থাকতো, ঘরের মেঝে হতো শ্বেতপাথরের **মোজাইক** দিয়ে তৈরি। হলঘরের মাঝখানে ফোয়ারা থাকতো। ঘরের আসবাবপত্র সোনা, গজদন্ত ও রূপা দিয়ে তৈরি করা হতো। গ্রীস থেকে নিয়ে আসা এবং রোমে নির্মিত প্রস্তরমূর্তি তাদের প্রাসাদ ও উদ্যান অলংকৃত করতো।

কোনো ধনী রোমবাসীর সেবায় শত শত দাসদাসী নিযুক্ত থাকতো। এসব দাসের মধ্যে অনেকেই ছিল চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর, এবং প্রায়শঃই তারা তাদের মালিকদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হতো; সচরাচর তারা গ্রীসের লোক হতো। রাস্তায় অভিজাত রোমবাসীদেরকে দাস পাল্কী করে বয়ে নিয়ে যেত। ভবনের প্রবেশপথে শিকল-বাঁধা কুকুরের পরিবর্তে শৃঙ্খলিত দাস প্রহরা দিত। দাসমালিকরা

১. সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রোম নগরী। (পুনঃকল্পিত ও নক্সা।) নক্সায় যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলো ছবির মধ্যে দেখাও। ২. সাম্রাজ্য স্থাপনের পরবর্তী সময়ে ফোরুম ও পালাতিন টিলার রাজপ্রাসাদ। (পুনঃকল্পিত।)

যখন তাদের গৃহে কোনো ভোজ-উৎসবের আয়োজন করতো তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্যান্ত মাছ, দুর্লভ পশুপাখির মাংস, ফলমূল আর মদ জোগাড় করে নিয়ে আসতো।

৩. 'রুটি আর প্রমোদোৎসব'। রোমে এহেন আড়ম্বরের পাশাপাশিই ছিল ভয়াবহ করুণ দারিদ্র্য।

শহরের একেকটা গোটা এলাকা জুড়ে পাঁচ-ছ'তলা ভবন নির্মাণ করা হতো (দ্র. ৩১৭ পৃষ্ঠায় ১ নং ছবি)। এখানে রাস্তাঘাট এত সংকীর্ণ ছিল যে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারতো না। দরিদ্রেরা খুপরিতে, চিলেকোঠায়, মাটির তলার ঘরে ঠেসাঠেসি করে বাস করতো। এসব ঘরবাড়ি অতিশয় খারাপভাবে তৈরি করা হতো বলে প্রায়ই ভেঙে পড়তো; তাছাড়া আগুন লেগে সম্পূর্ণ এলাকাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো — এটা ঘটতো আরো ঘনঘন। গৃহবাসীরা হয় গৃহ ধ্বসে নয়তো আগুনে পুড়ে মারা যেত। অনেক গরিব লোকের কোনো বাড়িঘরই ছিল না; তারা রাস্তাঘাটে, মাঠে রাত কাটাতো। (রোমের রাস্তাঘাটের ছবি ২১ নং রঙিন ছবিতে দেখ)।

২

নিরন্ন দরিদ্র জনতার মধ্যে আন্দোলন হবার আশঙ্কায় সম্রাটেরা খাদ্য ও সামান্য পয়সাকড়ি বিতরণ করতো এবং তাদের জন্য আমোদপ্রমোদের আয়োজন করতো। রোম শহরে বসবাসকারী কমপক্ষে ২ লক্ষ লোক বিনামূল্যে খাদ্য পেত। সামান্য কিছু পাবার আশায় শত শত দরিদ্র দাসমালিকদের প্রাসাদ ঘিরে ভিড় করে থাকতো। সম্রাটদের খরচায় রোমে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ উষ্ণ-স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল, সেখনে এক হাজার লোক একসাথে স্নান করতে পারতো। রোমের স্বাধীন নাগরিকরা প্রায়ই উষ্ণ-স্নানাগারে সারাটা দিন কাটিয়ে দিত। (দ্র. ৩১৬ পৃষ্ঠা)

কর্মহীনতাজনিত বেকার জীবনযাপন ও দান লাভের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রোমের দরিদ্র লোকজন পরিশ্রম করতে চাইতো না। শুধুমাত্র দাসমালিকরাই নয়, এমন কি দরিদ্র ব্যক্তিরাও মনে করতো যে, স্বাধীন মানুষের পক্ষে পরিশ্রম করা একটা অপমানজনক ব্যাপার এবং তা শুধু দাসদেরই করণীয়। তারা সম্রাটের কাছে 'রুটি ও প্রমোদোৎসব' আয়োজন করার দাবি জানাতো।

৪. রোমে আমোদপ্রমোদের বিভিন্ন আয়োজন। রোমে দাসমালিক ও দরিদ্রদের কাছে গ্লাদিয়াতোরদের লড়াই খুবই প্রিয় ছিল। রোমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর এই লড়াই রোম প্রজাতন্ত্রের আমলের চেয়ে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রোমে উষ্ণ-স্নানাগার। (পুনঃকল্পিত।) স্নানাগারের অভ্যন্তরে শীতল ও উষ্ণ জলে ভর্তি মর্মর প্রস্তর নির্মিত চৌবাচ্চা, ব্যায়ামকক্ষ, এমন কি পাঠাগার পর্যন্ত থাকতো। দেয়াল, গম্বুজ ও স্তম্ভ মর্মরপ্রস্তরের, আর মেঝে হতো মোজাইকের।

আউগস্তুসের আদেশ অনুযায়ী রোমের উপকণ্ঠে একটি হ্রদ খনন করা হয়েছিল। এই স্থানে একবার যুদ্ধ হয়েছিল; তাতে ৩০টি বড়ো বড়ো এবং বহুসংখ্যক ছোটো জাহাজে করে প্রায় ৩ হাজার লোক যুদ্ধ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোমে গ্লাদিয়াতোরদের লড়াই অনুষ্ঠিত হবার জন্য বিরাট গ্যালারিযুক্ত এ্যাম্ফিথিয়েটার **কোলোসিউম্** নির্মাণ করা হয়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শকের স্থান সংস্কুলান হতো সেখানে।

ত্রাইয়ান আয়োজিত উৎসবে এ্যাম্ফিথিয়েটারের মধ্যবর্তী ক্রীড়াস্থানে প্রায় ১১ হাজার জন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়। ১০ হাজার গ্লাদিয়াতোর লড়াই করতে একে অপরকে হত্যা করে এবং জন্তুদের সাথে যুদ্ধ করে। এই উৎসব ১২৩ দিন ধরে চলেছিল।

রোমবাসীদের অন্য আরেক প্রিয় খেলা ছিল অশ্বচালিত রথের প্রতিযোগিতা দেখা।
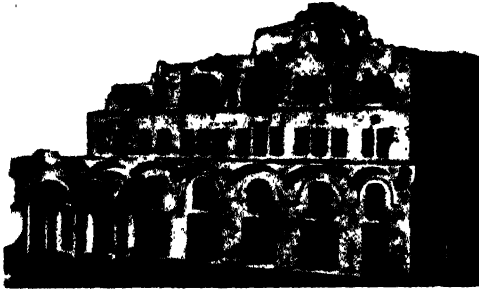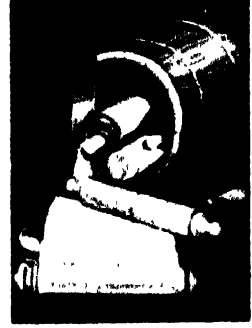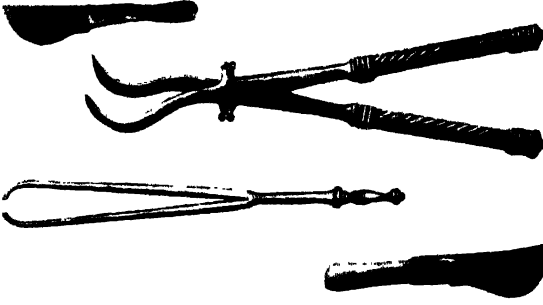
১. রোমে একটি অর্ধধ্বংসপ্রাপ্ত বহুতল ভবনের প্রাচীন মডেল। ২. রোমে শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাক্তারী যন্ত্রপাতি। ৭৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মিশরে ব্যবহৃত ডাক্তারী যন্ত্রপাতির সাথে এগুলোর তুলনা করো। ৩. এই ছবিটি বইয়ের মধ্যে আর কোথায় দেখেছো, খুঁজে বের করো।

৫. রোমক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। রোমের সংস্কৃতি শুধুমাত্র ইতালিতেই ছড়িয়ে পড়ে নি, সমগ্র রোম সাম্রাজ্য জুড়ে তা প্রসারিত হয়েছিল। যেখানেই রোমকগণ প্রবেশ করেছিল, সেখানেই তারা সর্বত্র খিলান, জলসরবরাহ ব্যবস্থা, এ্যাম্ফিথিয়েটার ও পথ নির্মাণ করতো। লাতিন ভাষা রোম থেকে বহু দূর দূরান্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। প্রাচ্য দেশসমূহ ও গ্রীসের বহু রচনা লাতিনে অনুবাদ করা হয়। বহু দিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ভাষায় কথা বলতো এবং লিখতো। পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী যাতে বুঝতে পারেন সেজন্য এখনো খনিজ দ্রব্য, উদ্ভিদ ও পশু-পাখি ইত্যাদির নামকরণ লাতিন ভাষায় করা থাকে। চিকিৎসকগণকে এখনো লাতিন ভাষায় ওষুধের নাম লিখতে হয়। লাতিন বর্ণমালা বিভিন্ন জাতির ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এমন কি বল্টিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের ভাষাতেও এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়। আধুনিক কালের বহু শব্দ লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

রোমে উদ্ভাবিত পঞ্জিকা (ক্যালেণ্ডার) পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত।* বৎসরের বারো মাসের নাম এখনো লাতিনেই রয়ে গেছে। জুলাই মাসের নামকরণ জুলিয়াস সিজারের সম্মানে করা হয়েছিল, এবং এর পরবর্তী মাস — আউগুস্তুসের সম্মানে। সেপ্টেম্বর শব্দের অর্থ 'সপ্তম', অক্টোবর মানে 'অষ্টম' (রোমে বৎসর গণনা শুরু হতো মার্চ থেকে)।

লুক্রেৎসিউস্, ভের্গিলিউস্ ও অন্যান্য রোমক লেখকদের রচনা ইউরোপীয় সাহিত্যকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাঁদের রচনাবলী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

রোমবাসীদের নির্মিত খিলান ও গম্বুজ পৃথিবীর স্থাপত্যশিল্পে এক বিশেষ অবদান।

পোম্পেই নগরের ভূতাত্ত্বিক খননকার্য

ভেসুভিউস আগ্নেয়গিরির অতি নিকটে অবস্থিত ছিল পোম্পেই শহর। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে হঠাৎ আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ শুরু হয়। ভেসুভিউসের মুখ হতে প্রচুর পরিমাণে লাভানির্গত হয়ে চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। প্রায় ১০ মিটার পুরু লাভাস্রোতের তলায় পোম্পেই নগরী ঢাকা পড়ে। শহরের অধিকাংশ অধিবাসী বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে পালিয়ে যায়। যারা পালাতে না পেরে আটকে পড়ে তারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং এদের মধ্যে ভূগর্ভস্থ কুঠরীতে বন্দী দাসদেরও একই পরিণতি হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোম্পেই নগরের খননকার্য শুরু হয়। বর্তমানে শহরের বেশির ভাগ লাভা মুক্ত করা হয়েছে। ঘরবাড়ি, পথঘাট, ফোরুম, এ্যাম্ফিথিয়েটার, গির্জা ইত্যাদি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। (দ্র. রঙিন আলোকচিত্র ষোড়শ-অষ্টাদশ)

? ১. তোমার পঠিত বিষয় ও চিত্রাদির সাহায্যে ধনী রোমবাসীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করো। ২. 'রুটি ও প্রমোদোৎসব' কথাটি কীভাবে এবং কেন প্রচলিত হয়েছিল? গ্রাখি ভ্রাতৃদ্বয়ের আমলে দরিদ্রেরা কী দাবী করতো — মনে করে দেখ। ৩. কী কী খেলা রোমবাসীদের প্রিয় ছিল? ৪. রোমক প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকের সাথে রোম সাম্রাজ্যের অবস্থার প্রতিতুলনা করো। পঠিত বিষয় ও চিত্রাবলীর সাহায্য নিয়ে বলো। *৫. সাম্রাজ্য স্থাপিত হবার পর রোমে এবং খ্রী. পূ. ৫ম শতকীয় গ্রীসে সার্বজনীন ভবন হিসেবে কী কী ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছিল? এসব ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কী?

* এখানে অবশ্য জুলিয়াস সিজারের আমলে প্রবুক্ত ও প্রবর্তিত জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের কথা বলা হচ্ছে। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারের যেটুকু ত্রুটি ছিল তা জর্জিয়ান ক্যালেণ্ডারে (১৫৮২ সালে প্রবর্তিত) সংশোধিত হয়। বর্তমানে পৃথিবী ব্যাপী যে ক্যালেণ্ডার চালু তা জর্জিয়ান ক্যালেণ্ডার। এটির জন্মস্থান ইতালি। — অনু.

ষোড়শ অধ্যায়

রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন

§ ৫৬. খ্রীষ্টীয় ২য়-৩য় শতকে দাসতান্ত্রিক অর্থনীতির অবক্ষয় সূচনা

(দ্র. মানচিত্র ১০)

মনে করতে চেষ্টা করো—রোমে দাসদের কোন ধরনের কাজ করতে হতো (§ ৪৯); দাসমালিকদের সাথে দাসগণ কীভাবে সংগ্রাম করেছিল (§ ৩৫:৫);

১. দাসরা কীরকম পরিশ্রম করতো। দাসমালিকরা খুব সস্তায় দাসদের ভরণপোষণ করতে পারতো, তবে তাদের কাজের মানও ছিল অতিশয় নিকৃষ্ট। যে সব দাস জমি চাষ করতো, জমিতে ফসল ভালো বা খারাপ যাই হোক তাতে তাদের কিছু এসে যেত না। ফসল হাজার ভালো হলেও তারা আহার্য হিসেবে জলের মতো তরল সূপ আর পরিধানের জন্য ছেঁড়া কাপড় ছাড়া তো আর কিছুই পেত না। যত কম এবং যত খারাপভাবে করা সম্ভব, তত কম ও খারাপভাবে তারা কাজ করতো। নিজেদের মালিকদের প্রতি আক্রোশ ও ঘৃণায় তারা কৃষির যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলতো এবং পশুদের পঙ্গু করে দিত।

রোমের জনৈক দাসমালিক দাসশ্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন: 'দাসরা জমির বড়োই ক্ষতি করে। ক্ষেতে বলদ ও অন্যান্য পশু খুবই খারাপভাবে চরায়। জমিতে লাঙ্গল দেয় যাচ্ছেতাই ভাবে। জমিতে ছড়ানো বীজ থেকে কীভাবে ভালো ফসল ফলানো যায় সেদিকে কোনো যত্নই তারা নেয় না। তারা নিজেরা ফসল চুরি করে তো বটেই, অন্য কেউ চুরি করতে এলেও তা ঠেকায় না।'

২. দাসপ্রথা — অর্থনীতি বিকাশের পথে বাধা। দাসপ্রথা থাকার ফলে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ত্বরান্বিত হতে পারে নি। চাষীরা ফলা লাগানো বেশ জটিল ধরনের লাঙ্গল

১. রোমে ফসল তোলার যন্ত্র। (প্রাচীন চিত্র অবলম্বনে পুনঃকল্পিত।)
২. ইতালিতে ৩য় শতকে ধনী ব্যক্তিদের ভূসম্পত্তি। ২৮৪ পৃষ্ঠার মুদ্রিত ছবির সাথে তুলনা করো। ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, বলো।

আবিষ্কার করেছিল, ষাঁড় যখন লাঙ্গল টানতো তখন লাঙ্গলের ফলায় ক্ষেতের জমি ফালা-ফালা করে ভালোমতো চষা হয়ে যেত। তারা ষাঁড় দিয়ে টানা শস্য কাটার যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। অবশ্য যে সব প্রদেশে স্বাধীন কৃষকরা বসবাস করতো একমাত্র শুধু সে সব স্থানেই এই শ্রম-হাতিয়ারটি ব্যবহৃত হতো। দাসদের নতুন ও দামি কৃষিযন্ত্র হাতে তুলে দেওয়ার মতো বিশ্বস্ত মনে করা হতো না বলে তাদের

পুরনো লাঙ্গল ও কাস্তে দেয়া হতো। রোমে যদিও জল-চালিত যাঁতাকল আবিষ্কৃত হয়েছিল, তবু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাসরা পূর্বের মতোই হাত দিয়ে যাঁতা চালিয়ে শস্য ভাঙতো। হস্তশিল্পের কারখানায়, খনিতে এবং অন্যান্য ব্যবসায় দাসরা খুবই সাধারণ ও ভোঁতা যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করতো।

খারাপভাবে জমি চাষ-আবাদ করার ফলে জমির উর্বরতা কমে যেত। কৃষকদের দ্বারা কর্ষিত একদা উর্বর জমিই দাস দিয়ে চাষ করানোর ফলে ধীরে ধীরে অনুর্বর হয়ে উঠতো। দাসদের দিয়ে তৈরি করানো হস্তশিল্পও খুব নিম্নমানসম্পন্ন হতো। দাসমালিকদের অর্থনীতি পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের হারও কমতে শুরু করেছিল।

ইতালিতেই দাস ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। এখানেই অর্থনৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করে।

দাসমালিকদের কাছে দাসশ্রম আর লাভজনক ছিল না। এতদ্ব্যতীত বেশি দাস রাখাও ছিল বিপজ্জনক। দাসমালিকরা বলাবলি করতো: 'যত দাস তত শনি।'

৩. কোলোনুস্‌। ২য় শতাব্দীতে বহু দাসমালিক নিজেদের জমিজমা ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে স্বাধীন দরিদ্রদের ভাড়া দেওয়া শুরু করে। এধরনের রাইয়তদের রোমে বলা হতো **কোলোনুস্‌** (colonus); ফসলের কিছু অংশ রাইয়তরা জমির মালিকদের দিত আর বাদ বাকি ফসল নিজেরা রাখতো। এজন্য রাইয়তরা সব সময়েই চাইতো যাতে ফসল ভালো হয়। দাসদের চেয়ে তারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতো, পশুপাল ও কৃষির যন্ত্রপাতির যত্ন নিত।

গরিব রাইয়তগণ জমির মালিকদের কাছ থেকে পশু, বীজ ও কৃষিযন্ত্র ভাড়া নিত। ঋণগ্রস্ত রাইয়তের মালিক ত্যাগ করে পালিয়ে যাবার অধিকার না থাকায় জমির মালিকরা সুযোগ বুঝে জমির ভাড়া বাড়িয়ে দিত।

৪. 'গৃহী দাস'। কোনো কোনো দাসমালিক দাসদের সামান্য কিছু জমি, কৃষিযন্ত্র এবং নিজের সংসার চালনা ও ভরণপোষণের অধিকার দান করতো। তারা মনে করতো যে, এর ফলে দাসরা ভালোভাবে কাজ করবে এবং নিজ মালিকদের ক্ষতি করবে না বা পালিয়ে যাবে না। এধরনের দাসদের বলা হতো **গৃহী দাস।** শহুরে দাসমালিকরা ছোটোখাটো কর্মশালা ও দোকান করার অনুমতি দিত; উপার্জনের বেশির ভাগ অংশই তারা তাদের মালিকের হাতে তুলে দিত।

এসবের ফলে যদিও কিছুসংখ্যক দাস নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল, তবু তাদের জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই কাটতো। মালিকের অধীনে তাদেরকে পূর্বের মতোই থাকতে হতো।

৫. সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ। দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম চলতে থাকে। এই সংগ্রামে কোলোনুস্‌গণও অংশগ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়। ৩য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের অভ্যুত্থান বিশেষভাবে প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

গলিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা নিজেদের ডাকতো 'বাগাউদে' (bagaudae — সংগ্রামী) বলে। যারা পশুচারণ করাতো তাদের নিয়ে গঠিত হয় অশ্বারোহী বাহিনী, আর পদাতিক দল তৈরি হয়েছিল চাষীদের নিয়ে। বাগাউদেরা দাসমালিকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, তাদের ধনসম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

বিরাট এক অভ্যুত্থান দেখা দেয় উত্তর আফ্রিকায়। বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকটি শহর দখল করে।

রোম শহরেও দাস ও কারিগররা বিদ্রোহ করে বসে। রোমের বিভিন্ন টিলার ভিতর থেকে একটি টিলা বেছে নিয়ে সেখানে বিদ্রোহীরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হতে থাকে। সৈন্যবাহিনী অবশ্য শেষপর্যন্ত প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে টিলা দখল করতে সক্ষম হয়।

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে তার সীমান্ত অঞ্চলেও ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকে।

২য় শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য আরো ক্ষমতাশালী হয়। তথাপি দাসপ্রথার ব্যাপক বিকাশ অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধীর গতিতে ধ্বংস করে দিতে থাকে এবং সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে।

? ১. কী কারণে ২য়-৩য় শতাব্দীতে দাসপ্রথা প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং রোমের অর্থনীতির পতন ঘটিয়েছিল? ২. কীজন্য দাসমালিকরা দরিদ্রদেরকে জমি ভাড়া দিতে এবং দাসদেরকে সাংসারিক জীবনযাপনে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিল? ৩. কোলোনুস্ এবং দাসের অবস্থার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? চাষী এবং কোলোনুসের মধ্যেই বা অবস্থাগত পার্থক্য কী ছিল? ৪. কারা ৩য় শতাব্দীর অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল? খ্রী. পূ. ৭৪-৭১ সালে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল তার অংশগ্রহণকারীদের সাথে এই বিদ্রোহীদের পার্থক্য কোথায়?

§ ৫৭. খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে সাম্রাজ্যের শক্তিহ্রাস এবং সম্রাট দিওক্লিতিয়ানের সময়ে সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণ

(দ্র. মানচিত্র ১০)

১. সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে 'বর্বরদের' আক্রমণ। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এল্‌বা নদীর পূর্ব উপকূলে স্লাভ উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল। রাইন্‌ ও এল্‌বা নদীদুটির মধ্যস্থিত ভূভাগে জার্মান উপজাতি বাস করতো।

জার্মানি ঘন বন ও কর্দমময় জলায় ভর্তি ছিল। অরণ্য ও জলার আশেপাশে জার্মান উপজাতিদের গোত্রভিত্তিক বসবাস ছিল। তারা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলেছিল। মোড়লেরা পরিষ্কৃত জমি গোত্রের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। জার্মানরা জমিতে যব ও গম জাতীয় শস্য এবং বার্লি চাষ করতো। ২-৩ বছর পরে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেলে তারা আরো জঙ্গল পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়। বনেজঙ্গলে তারা পশু চরাতো। আঙুরের চাষ কিংবা ফলমূলের বাগান করার ব্যাপারে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

অন্যান্য 'বর্বরদের'* ন্যায় জার্মানরাও রোম সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও উর্বর সমতলভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্ত উপজাতি একজোট হয়ে রোম সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। অস্ত্রধারী পুরুষেরা থাকতো সবচেয়ে সামনে: সাধারণ যোদ্ধারা পায়ে হেঁটে যেত, উপজাতীয় নেতারা ও তাদের ঘনিষ্ঠ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়ে যেত। তার পিছন পিছন খুবই ভারি ভারি গাড়ি ষাঁড়ে টেনে নিয়ে যেত। মহিলা ও শিশুরা থাকতো ঐ গাড়িগুলোর মধ্যে। পশুচারণকারীরা তাদের পশুপাল তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

সাম্রাজ্য যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন বর্বরদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। রোমবাসীগণ বহু 'বর্বরকে' বন্দী করে এনে দাসে পরিবর্তিত করে।

২. সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা। ৩য় শতাব্দীতে সম্রাটদের ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। লেগিওর সৈনিকরা সম্রাটের সিংহাসন লাভে প্রয়াসী হয়; সম্রাটকে হত্যা বা পদচ্যুত করে তারা তাদের মনমতো লোককে, যে তাদের বেশি মাইনে দিতে পারবে তাদেরকেই সিংহাসনে বসাতে লাগলো। ২-৩ বৎসর পর পরই, কখনো-বা এমন কি ২-৩ মাসেই, সম্রাট বদল হতে লাগলো। খুব কম সম্রাটই স্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যুবরণ করতো। মাঝে মাঝে এমনও হতে লাগলো যে, সাম্রাজ্যে একই সাথে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত বেশ কয়েকজন সম্রাট শাসন চালাচ্ছেন।

সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ এবং সম্রাটদের মধ্যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তুললো। ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগে গলিয়া, স্পেন, মিশর, এশিয়ার এবং দক্ষিণ ডানিউবের প্রায় সমস্ত প্রোভিন্‌ৎসিয়া রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

শক্তিহীন হয়ে পড়ায় সাম্রাজ্য তার রাষ্ট্রসীমা প্রতিরক্ষায় অপারগ হয়ে পড়ে। জার্মান ও অন্যান্য 'বর্বর' উপজাতি তার সীমানায় ঢুকে পড়ে এবং আশপাশের সমস্ত কিছু ধ্বংস করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে।

* গ্রীক ও রোমকগণ যাদের ভাষা বুঝতে পারতো না তাদের 'বর্বর' নামে আখ্যায়িত করতো। তাদের মনে হতো, এসব লোকজন শুধু 'বর-বর-বর' করে বকে। বর্তমানে 'বর্বর' শব্দের অর্থ 'অভদ্র ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি'।

১. 'বর্বরদের' রোমক দুর্গ আক্রমণ। (রোমক রিলীফ।) রোমবাসী ও বর্বরদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিতুলনা করো। ২. রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে দুর্গঘাঁটি: প্রহরীদের পাহারা দেবার জন্য মিনার এবং পরিখা ও প্রাচীর। (প্রাচীন রোমক চিত্রকলা অনুকরণে অঙ্কিত।)

৩. দিওক্লেতিয়ানের আমলে সম্রাটের শাসনক্ষমতা। ইতালি ও প্রোভিন্‌ৎসিয়াগুলোর দাসমালিকেরা চাইতো যে, সাম্রাজ্য বজায় থাকুক। এই কারণে তারা সম্রাট দিওক্লেতিয়ানকে সাহায্য করে। তিনি দৃঢ়হস্তে বিপুল উদ্যমের সাথে সাম্রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

দিওক্লেতিয়ানের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে। কর্মদক্ষতার ফলে সত্বর তিনি সম্রাটের রক্ষীবাহিনীর প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। **২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে** সৈন্যেরা তাঁকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে। অতঃপর ২১ বৎসর ধরে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করেন।

প্রজাতন্ত্রের আমলে প্রবর্তিত সমস্ত পদ দিওক্লেতিয়ান বাতিল করে দেন। তিনি তাঁর অনুগত রাজ কর্মচারীদের নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করলেন। সম্রাটের যে কোনো নির্দেশই আইনরূপে গণ্য হতো। বহুসংখ্যক গুপ্তচর ও গোয়েন্দা সম্রাটের প্রতি যারা প্রসন্ন নয় তেমন ব্যক্তিদের উপর নজর রাখতো।

দিওক্লেতিয়ান ইউপিতের দেবতার পুত্ররূপে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমন্দিরে তাঁর প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত হতে লাগলো। এমন কি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদেরকেও তাঁর সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানাতে হতো। সম্রাট কাউকে তাঁর পা অথবা তাঁর পোষাকের স্বর্ণখচিত প্রান্তদেশ চুম্বনের অনুমতি দিলে তাকে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহের দান হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে নিজের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ়ীকরণের জন্য তিনি বিভিন্ন সমস্ত 'বর্বর' উপজাতিকে নিজ সৈন্যদলে চাকরি দেন। বিরাট বাহিনীর খরচ পোষাবার জন্য তিনি জনগণের উপর ধার্য করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহী সেনাদের নির্মমভাবে হত্যা করে দিওক্লেতিয়ান তাঁর বাহিনীর শৃঙ্খলা দৃঢ়তর করেছিলেন।

৪. বিদ্রোহ দমন। দিওক্লেতিয়ানের বিশাল সেনাবাহিনী গলিয়া আক্রমণ করে বসত জ্বালিয়ে দেয়, তার অধিবাসীদের হত্যা করে। বাগাউদেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়, কিছু বিদ্রোহী পালিয়ে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেনাদল তাদের দুর্গ অবরোধ করে। শেষপর্যন্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। কিছু বন্দীদের হত্যা করা হয়, আর বাদ বাকী বন্দীদের সপরিবারে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। গলিয়ার দাসমালিকেরা সম্রাটকে ভগবানের মতো গৌরবগান করতো।

রোমক সৈন্যবাহিনী দাসমালিকদের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহও দমন করে।

৫. সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা। সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে 'বর্বরদের' হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এক দুর্গ থেকে আরেক দুর্গে যাওয়ার পথে রোমবাসীরা পরিখা খনন করে, বাঁধ নির্মাণ করে এবং তীক্ষ্নমুখ কাঠের গুঁড়ির বেড়া বসায়। বাঁধের উপরে মিনার তৈরি করে তার উপরে প্রহরীরা বসে চতুর্দিক পাহারা দিত। রোমক সেনা এবং যুদ্ধবাহিনীতে চাকুরিরত ভাড়াটে 'বর্বর' উপজাতিরা অন্যান্য 'বর্বর' উপজাতিদের হাত থেকে সাম্রাজ্যের সীমানা প্রতিরক্ষা করতো।

রোম রাষ্ট্র আরেক বার সাম্রাজ্যেই নিপীড়িত জনতার প্রতিরোধ দমন করতে ও তার সীমান্তাঞ্চলের উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

? ১. রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে 'বর্বরদের' আক্রমণের কারণ কী? ২. ৩য় শতকে রোম সাম্রাজ্য যে হীনবল হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ কী? ৩. কোন্ উপায়ে দিওক্লেতিয়ান সাম্রাজ্যকে ফের শক্তিশালী করে তোলেন? এর ফলে সাম্রাজ্য কি সত্যিই অত্যন্ত সুদৃঢ়

হয়েছিল — ভেবে বলো। ৪. দিওক্লেতিয়ান ও আউগুস্তুসের শাসনের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? দিওক্লেতিয়ানের শাসনপদ্ধতির সাথে আর কোন্ রাজার শাসনপদ্ধতির সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছো? এবং সেই সাদৃশ্য কোন্ ক্ষেত্রে? ৫. আউগুস্তুসের শাসনের আরম্ভ ও দিওক্লেতিয়ানের শাসনের মধ্যে কত বৎসরের পার্থক্য?

§ ৫৮. খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব

(দ্র. মানচিত্র ১০)

মনে করতে চেষ্টা করো — 'মরণোত্তর জীবন' কাকে বলা হতো; দেবতার মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে মিশরী কোন্ পুরাণ তুমি জানো; এই পুরাণের উৎস কী (§ ১১:২, ৩)।

১. নতুন ধর্ম উদ্ভবের কারণ। দাস, কোলোনুস্ ও রোম কর্তৃক বিজিত বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ অবদমিত হয়েছিল; সাম্রাজ্য প্রায় অপরাজেয় শক্তিরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন হওয়ার আশা নিপীড়িতেরা পরিত্যাগ করে। দাস ও রাইয়তগণ অক্লান্ত শ্রম, অপমান ও প্রহারের হাত থেকে শুধুমাত্র মৃত্যু হলেই মুক্তি পেত। তাদের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা লাঘব করতে যারা পারে নি সেই দেবতাদের উপর তারা সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকে।

নিপীড়িত জনগণের মধ্যে পরম দয়ালু ও শক্তিমান এক দেবতার আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে; তিনি তাদের সর্বৈব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। অধীর আগ্রহে তারা 'দয়াবান দেবতার' জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

২. যিশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী। ১ম শতাব্দীতে এরকম একটি কাহিনী প্রচারলাভ করে যে, প্যালেস্টাইনে মনুষ্যরূপধারী এক দেবতা বাস করেন, তাঁর নাম **ইউসুস্ খ্রীস্তোস্***। কাহিনীটিতে আরো বলা হতো যে, রোমবাসীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করবে এবং তিনি সে যন্ত্রণা নম্রশিরে সহ্য করবেন। মৃত্যুর পরে যিশু পুনরুজ্জীবিত হয়ে স্বর্গারোহণ করলেও অচিরেই প্রত্যাগমন ও মানুষের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন। পৃথিবীতে যারা পরম সহিষ্ণুতায় দুঃখকষ্ট সহ্য করে ও তাঁকে ভগবানরূপে মান্য করে যিশু তাদের 'মরণোত্তর জীবনে' পুরস্কৃত করার আশ্বাস দেন। এই সব মানুষ পরম সুখে স্বর্গবাসী হয়ে জীবন কাটাবে, আর অন্যান্যেরা নরকে চিরকালের তরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। এসব কাহিনী ওসিরিস দেবতা সম্বন্ধে প্রচলিত সুপ্রাচীন কিংবদন্তী,

* খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রীষ্টের হিব্রু ভাষায় আসল নাম 'জেশুয়া মেশিয়াহ্'। এরই গ্রীক অনুবাদ ইউসুস্ খ্রীস্তোস্, যা থেকে ইংরেজিতে Jesus Christ শব্দ এসেছে। যিশু খ্রীষ্ট ইংরেজি থেকে অনূদিত শব্দরূপে বাংলা ভাষায় চালু হয়েছে। — অনু.

অন্যান্য দেবতাদের মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন লাভ এবং মৃত্যুপরবর্তী লোকে শেষ বিচার ইত্যাদি পুরাণের ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছিল।

১ম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে ২য় শতাব্দী ধরে এই কাহিনীগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এগুলোকে বলা হতে 'সুসমাচার' — গ্রীকে **এভানগেলিয়োন** (euangelion)। বিভিন্ন 'সুসমাচারে' বিভিন্নভাবে যিশুর জীবনবৃত্তান্ত বলা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বহু স্বতঃবিরোধী ও অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবুও এসবই হলো সুসমাচার যার জন্য নিপীড়িতের দল অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল।

৩. **খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের শুরু**। নিপীড়িতের দল সানন্দে এসব সান্ত্বনাদায়ক কাহিনী, যার মধ্যে তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের এবং উৎপীড়কদের শাস্তি দানের প্রতিশ্রুতি ছিল, বিশ্বাস করতো। যারা যিশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস অর্পণ করেছিল তারা নিজেদের **খ্রীষ্টান** এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে **খ্রীষ্টধর্ম** বলে আখ্যায়িত করতো। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ দেশ থেকে দেশান্তরে, এক শহর হতে আরেক শহরে নিজেদের ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। খ্রীষ্টধর্ম সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে দরিদ্র ও দাসরাই খ্রীষ্টান হতো। তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল, যেমন — ইহুদী, গ্রীক, রোমক, মিশরী, গল ও আরো অন্যান্য বহু জাতি।

খ্রীষ্টানরা শুধুমাত্র এক ঈশ্বরের উপাসক ছিল এবং সম্রাটকে দেবতা হিসেবে পুজা করতেও তারা অস্বীকার করে। এর ফলে সম্রাট খ্রীষ্টানদের নির্যাতন করতে শুরু করেন। খ্রীষ্টাবলম্বীগণ গোপনে নিজেদের সমাজ গঠন করেছিল। সেই সমাজের সভ্যরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করতো, একসাথে ভোজোৎসবের আয়োজন করতো এবং একই সঙ্গে উপাসনা ও সুসমাচার পাঠ করতো। তারা সাধারণত ভূগর্ভস্থ কোনো স্থানে কিংবা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সমবেত হতো। (দ্র. ৩৩০ পৃষ্ঠা।)

৪. **ধনী ব্যক্তিদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ**। ধনীরা বুঝতে পারে যে, খ্রীষ্টধর্ম তাদের জন্য খুবই সুবিধাজনক: **খ্রীষ্টধর্ম আজ্ঞানুবর্তিতা ও সহনশীলতা প্রচার করে এবং তার দ্বারা দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাস ও দরিদ্রদের সংগ্রামও প্রভাবান্বিত হয়েছিল**। 'কোনো দাস খারাপ হলে খ্রীষ্টধর্ম তাকে ভালো করে দেয়' — লিখেছিলেন জনৈক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। রোম সাম্রাজ্যে জনজীবন তখন বিপজ্জনক ও সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। গণ-অভ্যুত্থান, সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ ও 'বর্বরদের' আক্রমণের সময়ে লোকজন শুধু বিষয়-সম্পত্তিই নয়, প্রাণও হারাতো। আগামীকাল যে কী ঘটবে তা পর্যন্ত লোকে নিশ্চিতভাবে চিন্তা করতে পারতো না, সকলেই সর্বদা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতো। ধনী-

দরিদ্র উভয়েই সমভাবে পারলৌকিক 'চিরন্তন সুখ' কল্পনা করে মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজতো।

বারংবার যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকায় বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যাই কমে নি, এমন কি সাক্ষর লোকজনের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। এর ফলে জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের পথ খুলে যায়।

যে সব বণিক এক শহর হতে অন্য শহরে যাতায়াত করতো, খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ তাদের জন্যও খুব সুবিধাজনক ছিল। যে কোনো শহরের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সাদরে বহিরাগত খ্রীষ্টান বণিকদের অভ্যর্থনা জানাতো ও তাদের ব্যবসায় সাহায্য করতো।

৫. খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় সমাজ। ধনী খ্রীষ্টানরা সমাজসেবার জন্য টাকাপয়সা খরচ করতো। সচরাচর তাদেরই হিয়েরোস (পুণ্যাত্মা সমাজনেতা) ও এপিস্কোপুস্ নির্বাচন করা হতো। **এপিস্কোপুস্** অর্থ 'তত্ত্বাবধায়ক'। গোটা অঞ্চলের খ্রীষ্টীয় সমাজ বিনাবাক্যে তাঁর আজ্ঞাপালনে বাধ্য হতো।

৩য় শতাব্দীর শেষ দিকে রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। বিভিন্ন শহরের খ্রীষ্টানরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতো। শত শত খ্রীষ্টসমাজ গোপনে এপিস্কোপুসের পরিচালনায় সংঘবদ্ধ হয়ে এক খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো **ধর্মসমাজ**। খ্রীষ্টানদের এই ধর্মসমাজ রোম সাম্রাজ্যের জনগণের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে।

? ১. কী কারণে শক্তিমান দেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস উদ্ভূত ও প্রচারিত হয়েছিল? ২. যিশু খ্রীষ্ট ও ওসিরিস দেবতা সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর মধ্যে কী সাদৃশ্য বর্তমান? মিশর ছাড়া আর কোথায় তোমরা 'মরণোত্তর লোক' সম্বন্ধে কিংবদন্তীর সাথে পরিচিত হয়েছো? ৩. খ্রীষ্টাবলম্বীদের সমাজগঠন প্রথম দিকে কীরকম ছিল? এবং পরবর্তীকালে তার মধ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছিল? খ্রীষ্টধর্মের কোন্ কোন্ জিনিস দরিদ্র ও ধনীদের আকর্ষণ করেছিল? ৪. খ্রীষ্টানদের ধর্মসমাজ কাকে বলা হতো?

§ ৫৯. খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে রোম সাম্রাজ্যের অবনতি

(দ্র. মানচিত্র ১০)

মনে করতে চেষ্টা করো—সুপ্রাচীন কালে প্রাচ্যভূমির দেশসমূহে ও প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো।

১. খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে জনগণের প্রতি নির্যাতন। সম্রাট দিওক্লেতিয়ানের রাজত্বকালের পরে সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নতুনকরে জ্বলে উঠে।

সেই সংগ্রামে সেনাপতি কনস্তান্তিন্ জয়ী হন। ক্ষমতা দখলের জন্য এবং পরে শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য কোনো চেষ্টারই তিনি ত্রুটি করেন নি: প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সহযোগীকেই হত্যা করেছেন। সিংহাসন দখল করতে চায় এই সন্দেহে তিনি নিজ পুত্রকে পর্যন্ত হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

মেহনতী মানুষের প্রতি কনস্তান্তিনের ব্যবহার ছিল আরো নিষ্ঠুর। জমির মালিকরা যাতে ক্ষেতমজুর সর্বদা পেতে পারে তজ্জন্য রাইয়তদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, তারা তাদের মালিকদের ছেড়ে যেতে পারবে না। পলাতক রাইয়তকে শিকলে বেঁধে ধরে আনা হতো। মনে করা হতো যে, মারধোর করে দাসকে মেরে ফেললেও দাসমালিক তার শুভকামনাই করে থাকে, কেন না সে তার দাসের চরিত্র সংশোধন করতেই চায়। সম্রাটের নিজের কর্মশালাগুলোতে শ্রমিকদের দাসদের মতো দেগে দেয়া হতো।

সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মহা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন, বিশাল সৈন্যবাহিনী, কর্মচারী ও গুপ্তচর দল ভরণপোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতো। ফলে খাজনার হার আরো বাড়ানো হয়। কর প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের চাবুক মারা হতো। শহরবাসীরা যাতে খাজনা দিতে অস্বীকার না করতে পারে তাই এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যাওয়া বা কর্মস্থল পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ করা হয়। সন্তানসন্ততি নিজের পিতামাতার পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হতো।

২. খ্রীষ্টধর্ম — প্রধান ধর্ম। কনস্তান্তিন্ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কেবলমাত্র চাবুক, শৃঙ্খল আর মৃত্যুদণ্ডের সাহায্যে লোকজনদের আর নির্বিরোধীভাবে আজ্ঞাপালনে বাধ্য করা যাবে না। তিনি দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে উত্তম, তার দ্বারা শোষিতদের নিজের বশে ধরে রাখা সম্ভব। খ্রীষ্টানদের ধর্মসমাজ দরিদ্র ও দাসদের খুবই প্রভাবান্বিত করে এবং তাদের এ মর্মে শিক্ষাদান করে: 'যিশু নিজে ক্রুশের যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, তিনি তোমাদের কষ্ট সহ্য করতে বলেছেন, তার বদলে মৃত্যুর পরে স্বর্গে তোমরা পুরস্কৃত হবে'; 'সম্রাটের শাসন ঈশ্বর নির্ধারিত'; 'হে দাস, তোমরা তোমাদের প্রভুর আজ্ঞা পালন করো'।

৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তিন্ খ্রীষ্টানদেরকে খোলাখুলিভাবে সভার আয়োজন করা এবং তাদের গির্জা তৈরি করার অনুমতি দেন। সম্রাট ও দাসমালিকরা কোনোরূপ কার্পণ্য না করে ধর্মসমাজের জন্য জমি, ধনসম্পত্তি ও বহুমূল্যবান জিনিসপত্র দান করে। অতঃপর অনতিবিলম্বে ধর্মসমাজ প্রচুর জমির মালিক হয় ও মহাজনী কারবার শুরু করে। খ্রীষ্টসমাজের সব সভাই

১. খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম কয়েক শতকে খ্রীষ্টানদের সমবেত হবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ স্থান। ২. রোমে ৫ম শতাব্দীর একটি গির্জা। ভূগর্ভস্থ স্থান ও গির্জার মধ্যে তুলনা করো। **খ্রীষ্টীয় ধর্মসমাজের অবস্থার কীরকম রূপান্তর ঘটেছিল তা ঐ তুলনার প্রেক্ষিতে নির্ণয় করো।**

১

যে এসব ধনসম্পদ ব্যবহার করতে পারতো এমন নয়, প্রধানত ধর্মযাজক (পুণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গ) ও এপিস্কোপুসের অধিকার ছিল তা ভোগ করার।

কনস্তান্তিনের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের ধর্মসমাজ তাঁকে পুণ্যাত্মা বলে ঘোষণা করে।

৩. রাজধানীর স্থানান্তর। কনস্তান্তিন্ **বস্ফোরাস্** প্রণালীর তীরে শহর নির্মাণ করেন। পূর্বে এতদঞ্চলে গ্রীকদের একটি উপনিবেশ ছিল — **বিজান্তিউম্।**

শহরটির নতুন নামকরণ করা হলো **কনস্তান্তিনোপোল্**, অর্থাৎ কনস্তান্তিন্-নগরী। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় অর্ধাংশের কেন্দ্রস্থলে, সমুদ্র ও স্থলপথের মিলনস্থানে এই শহর অবস্থিত। সম্রাটের রাজকোষে অর্থ কমে যাওয়া সত্ত্বেও কনস্তান্তিনোপোলে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর ভবন নির্মিত হয়, এবং তার ভিতরে গির্জাও ছিল অনেক।

৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপোলে স্থানান্তরিত করা হয়।

৪. খ্রীষ্টানদের দ্বারা শিল্পনিদর্শন ধ্বংস ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ। সম্রাটের সমর্থনপুষ্ট হয়ে খ্রীষ্টানরা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে। তারা দেব-দেবীদের মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং প্রাচীন মন্দিরগুলো হয় ধ্বংস করে দেয়, নয়তো সেগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করে। অজস্র অমূল্য শিল্পসম্ভার নষ্ট হয়ে যায়। দেবতা জিউসের সম্মানে প্রবর্তিত অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার হুকুম জারি করেন সম্রাট ৪র্থ শতাব্দীর শেষ দিকে।

২

সুসমাচারের গল্পকাহিনী বিজ্ঞান বিশ্বাস করতো না বলে খ্রীষ্টানরা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালায়। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ পাঠাগারের বহু পাণ্ডুলিপি তারা পুড়িয়ে ফেলে এবং অন্যান্য শহরেও বহু বৈজ্ঞানিক রচনাদি ধ্বংস করে দেয়। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে সমবেত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা জনৈকা বিদুষী মহিলা **ইপাতিয়াকে** টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করে। জ্ঞানবিজ্ঞানে উৎসর্গীত-প্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে ইপাতিয়াই প্রথম শহীদ, আর তা খ্রীষ্টানদের হাতে।

৫. খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে শ্রেণীসংগ্রাম। খ্রীষ্টধর্ম কিছুসংখ্যক দাস ও দরিদ্রকে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত করলেও না ধর্ম, না নিষ্ঠুরতা — কোনোটাই নির্যাতিতের সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে অবদমিত করতে সক্ষম হয় নি। দাস ও রাইয়তরা অশেষ শাস্তি ভোগ ও অভাবের তাড়নায় বনে-জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শহরবাসীগণও চাবুকসহ খাজনা আদায়কারীদের ভয়ে পালাতে শুরু করে। পলাতকরা সমবেত হয়ে দল গঠন করে আমলা ও দাসমালিকদের ভবনের উপর, এমন কি শহরেরও আক্রমণ চালাতে থাকে। জনৈক এপিস্কোপুস্ তো ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন: '...মালিকদের বিরুদ্ধে অধীনস্থ লোকজনদের ধৃষ্টতা

ক্রমেই বেড়ে উঠছে, তা ছাড়া পলাতক দাসরা খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও শুধু যে মালিকদের হাত ফস্কে পালিয়েই যায় তা নয়, উপরন্তু তাদের নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে বসে।'

সম্রাটদের নিষ্ঠুর শাসন সাম্রাজ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির কিছুমাত্র উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় নি। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ধ্বসে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল — বিশেষত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল — জনশূন্য হয়ে পড়ে।

কোলোন্স্ সম্পর্কে রোম সাম্রাজ্যের আইন

এই আইন কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল? কীসে তুমি তা বুঝতে পারলে?

রাইয়তরা জমিজমা ছেড়ে দেবে — এ এক অন্যায় ব্যাপার; তারা পরের জমি ভোগ করতে জমির মালিকদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এ কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোলোন্স্ জমির সাথে সংলগ্ন থাকতে বাধ্য। তাদের সন্তানদের জন্য লোকালয়ে গিয়ে বসবাস করার কোনো অধিকার নেই এবং তাদের পিতা-পিতামহেরা একদা যে জমি চাষবাস করে গেছে সেই জমি তাদেরও অবশ্যই চাষবাস করতে হবে।

দাসদের যেমন শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তেমনি পলায়নোন্মুখ কোলোন্স্কেও শিকলে বেঁধে রাখা যেতে পারে।

? ১. কী কী উপায় অবলম্বন করে কনস্তান্তিন্ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন? ২. খ্রীষ্টানদের ধর্মসমাজের অবস্থা ৪র্থ শতকে কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল? এই পরিবর্তনের কারণ কী? ৩. খ্রীষ্টীয় ধর্মসমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের প্রতি কোন্ মনোভাব গ্রহণ করেছিল? এই মনোভাবকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ৪. প্রাচীন কালে পৃথিবীতে ধর্মের ভূমিকা কী ছিল, সে সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো। ৫. দেওক্লেতিয়ানের শাসনের শুরু হওয়ার কত বৎসর পরে কনস্তান্তিনোপোলে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল?

§ ৬০. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন

(দ্র. মানচিত্র ১০)

মনে করতে চেষ্টা করো — রোম প্রজাতন্ত্র কবে স্থাপিত হয়েছিল; রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কবে।

১. সাম্রাজ্যের উপর 'বর্বরদের' আক্রমণ বৃদ্ধি। সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়লে 'বর্বরদের' আক্রমণ আরো বেড়ে যায়। 'বর্বর' উপজাতিগুলো মিলে খুব ক্ষমতাশীল জোট গঠন করে। সুশৃংখল না হলেও এক বিরাট বাহিনী তারা
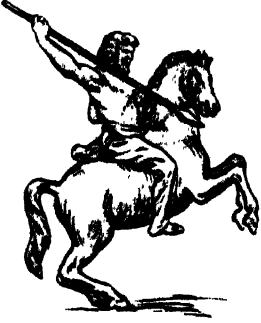
১. অশ্বারূঢ় 'বর্বর' সেনা। (প্রাচীন রোমক চিত্রকলা থেকে।) ২. রোমের দুর্গদ্বার। ৩য় শতাব্দীতে রোমে দুর্গপ্রাচীর নতুনভাবে খুব মজবুত করে তৈরি করা হয় এবং প্রাচীরের উপরে মিনার নির্মিত হয়। ৩১৪ পৃষ্ঠায় রোম নগরীর নক্সায় এই দুর্গ প্রাচীর খুঁজে বের করো।

গঠন করে ফেলে এবং রোমের সীমান্ত অঞ্চলের দুর্গসমূহ আক্রমণ করতে থাকে।

'বর্বরদের' আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্রাটেরা হয় তাদের সোনাদানা ঘুষ দিত, নয়তো তাদের ভিতর থেকে কোনো কোনো উপজাতিকে নিজের সেনাবাহিনীতে চাকরি দিতে বাধ্য হতো। সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমানরূপে দরিদ্র হতে থাকা জনসাধারণের নিকট এ বাবদে অর্থ সংগ্রহ করা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

২. রোম সাম্রাজ্যে গথ্ আগমন। ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধে **ক্যাস্পিয়ান স্তেপ্ অঞ্চল** থেকে **হুন** যাযাবরদের এক বিরাট দল ইউরোপে এসে প্রবেশ করে; নিজেদের দুর্দম অশ্বের পিঠে চড়ে তারা প্রচণ্ড বেগে অভিযান চালায় এবং আশপাশের সবকিছু ছারখার করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে।

এর কিছুকাল পূর্বেই **কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে গথ্** নামে জার্মানদের

এক উপজাতি বসতি স্থাপন করেছিল। তারা হূনদের ধ্বংসাভিযানের মুখে দাঁড়াতে না পেরে ডানিউব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে চলে যায়।

রোম সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে বসবাস করতে সম্রাট গথ্‌দের অনুমতি দান করেন। ভেলা আর ডোঙ্গায় চড়ে হাজার হাজার গথ্‌ সপরিবারে ডানিউবের দক্ষিণ তীরে গিয়ে পৌঁছয়। সম্রাটের আমলার দল তাদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে প্রতারণা করে। গথ্‌রা একটুকরো রুটির জন্য নিজেকে বা নিজ সন্তানসন্ততিকে দাস হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। তারা বিদ্রোহ করে এবং কনস্তান্তিনোপোলের দিকে এগিয়ে যায়।

সম্রাট তাঁর বাহিনী নিয়ে গথ্‌বিরোধী অভিযানে অগ্রসর হন। ৩৭৮ সালে **আদ্রিয়ানোপোল্‌** শহরের নিকটে বিদ্রোহীরা রোমক সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দেয়, সম্রাট নিজেও নিহত হন। নতুন সম্রাট গথ্‌ নেতাদের উৎকোচ দিয়ে বিদ্রোহ থামাবার ব্যবস্থা করেন। বলকান উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলে গথ্‌দেরকে ভূমি প্রদান করা হয়, কেন না সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধপ্রবণ গথ্‌দের বিপুলসংখ্যকভাবে বসবাস সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩. **দ্বিখণ্ডিত সাম্রাজ্য**। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য দুটি ইম্পেরাতোর ভ্রাতার মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দুটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠলো: **পূর্ব সাম্রাজ্য** এবং **পশ্চিম সাম্রাজ্য**।

বলকান উপদ্বীপ, মিশর ও রোম কর্তৃক বিজিত এশীয় দেশগুলো নিয়ে হলো পূর্ব সাম্রাজ্য। ইতালি, ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলো পশ্চিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো।

পশ্চিম সাম্রাজ্যে বসবাসরত দরিদ্র জনগণ শহর ছেড়ে পালাতে থাকে, পূর্ব সাম্রাজ্যের তুলনায় এর অবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্যে বিদ্রোহও ব্যাপকভাবে চলতে থাকে।

৪. **গথ্‌দের রোম অধিকার**। পশ্চিম সাম্রাজ্য ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ার ফলে গথ্‌রা তার সুযোগ নিল। রণলিপ্সু **আলারিখ্‌-কে** নেতা নির্বাচন করে তার নেতৃত্বে তারা ইতালি আক্রমণ করে। রোম প্রেরিত দূতগণ বিপুলসংখ্যক নগররক্ষী যোদ্ধাদের দ্বারা আলারিখ্‌কে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করলে তিনি উপহাসসূচকভাবে মন্তব্য করেছিলেন: 'ঘাস যত ঘন হয়, তাকে কাটা তত সহজ।'

সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ছিল না। সম্রাট দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন। মূলত 'বর্বরদের' নিয়ে সংগঠিত সেনাবাহিনী খুবই অবিশ্বাসী ছিল।

খনন কাজের পর আবিষ্কৃত রোমের ফোরুম ও পালাতিন টিলা। (আলোকচিত্র)। ৩১৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পুনঃকল্পিত চিত্রের সাথে তুলনা করো। ঊনবিংশ-বিংশ সংখ্যক রঙিন আলোকচিত্রও লক্ষ্য করো।

দাস ও কোলোনুস্‌ — যারা সাম্রাজ্য ঘৃণা করতো, তারা দাসমালিকদের বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়, ধনী ও আমলাদের মারধর করে।

গথ্‌রা রোমে হানা দেয় এবং নগর অবরোধ করে বসে থাকে। অভেদ্য প্রাচীর পরিবেষ্টিত নগরী আক্রমণ করার সাহস আলারিখের হয় নি। কিন্তু দাসরা রাত্রিবেলায় প্রাচীরের প্রবেশদ্বার খুলে দেয় এবং গথ্‌রা প্রচণ্ড বিক্রমে রোমের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। সেকালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শহর যার ভয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতি ভয়ে কম্পমান ছিল, ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে সেই রোম নগরী প্রায় বিনা প্রতিরোধে 'বর্বরদের' বিশৃঙ্খল বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করে। গথ্‌রা তিন দিন ধরে রোম নগরীতে লুণ্ঠন চালায়। তার পর শূন্য নগরী পরিত্যাগ করে চলে যায়। (দ্র. রঙিন ছবি ২২)

৫. পশ্চিম সাম্রাজ্যে জার্মান আক্রমণ। গথ্‌দের আক্রমণের পর পশ্চিম সাম্রাজ্যে বহুসংখ্যক জার্মান উপজাতি দ্রুতবেগে প্রবেশ করে। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই জার্মানরা গলিয়া, ইতালি ও স্পেন দখল করে এবং স্পেন হতে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করে।

ঝঞ্ঝাবেগে দুর্বার বিক্রমে সব চুরমার করে দিয়ে জার্মানরা সারা সাম্রাজ্য তছনছ করে বেড়ায়। উর্বর শস্যক্ষেত্রে তারা বসত স্থাপন করে, আঙুর ক্ষেতে সব গাছ উপড়িয়ে ফেলে সেখানে যব-গম জাতীয় শস্যবীজ ছড়িয়ে দেয়, জলপাই বাগান কেটে ভূমিসাৎ করে তা পশুচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। দুর্গ নির্মাণের জন্য পাথরের দরকার পড়ায় জার্মানরা প্রাসাদ ও গির্জার দেয়াল ভেঙে ফেলে। বহু শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়ে ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় আগাছায় তা ঢেকে গিয়েছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে **ভ্যান্ডাল** নামে এক জার্মান উপজাতি আফ্রিকা থেকে ইতালিতে এসে প্রবেশ করে এবং রোম দখল করে বসে। নগরধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য দুসপ্তাহ ব্যাপী সময় ধরে চলতে থাকে। ভ্যান্ডালরা সমস্ত মূর্তি ভেঙে দেয়, বইপত্র নষ্ট করে ফেলে, ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে। তাদের আক্রমণের পর রোমের জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭ হাজার লোক বেঁচে ছিল।*

৬. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানদের এক নেতা রোমের শেষ সম্রাটকে উৎখাত করে। এর ফলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণ অবসান ঘটে। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য অবশ্য খুবই কষ্টে 'বর্বরদের' আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিল।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল অত্যাচারিতদের বিদ্রোহ ও 'বর্বরদের' আক্রমণের ফলে। এই সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথেই পশ্চিম ইউরোপে দাসতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটে। সেজন্যই সকলে মনে করেন যে, পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীন যুগ শেষ হলো।

? ১. রোম সাম্রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে বিদ্রোহ হয়েছিল তা মানচিত্রে খুঁজে বের করো। ২. কোন্ পথ দিয়ে এসে 'বর্বর' উপজাতিরা রোম সাম্রাজ্যের এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছিল তা মানচিত্রে দেখাও। কী কারণে ৪র্থ-৫ম শতকে 'বর্বরদের' আক্রমণ জোরদার হয়েছিল? ৩. কীজন্য বিখ্যাত সেনাপতি হানিবলও যেখানে রোম অবরোধ করতে পারেন নি সেখানে আলারিখ্ রোম দখল করে নিতে পারলেন? ৪. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ কী? ৫. ওক্তাভিয়ানের একক শাসন থেকে শুরু করে মোট কত বৎসর রোম সাম্রাজ্য টিকে ছিল? ২য় পুনিক যুদ্ধ থেকে আলারিখ্ কর্তৃক রোম দখল পর্যন্ত মোট কত বৎসরের ব্যবধান ছিল?

* ভ্যান্ডালদের দ্বারা রোম ধ্বংস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই vandalism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ অত্যন্ত অসভ্যের মতো নির্দয়ভাবে যাবতীয় শিল্পনিদর্শন ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী বস্তুসামগ্রী ধ্বংস করা।

প্রাচীন রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি কী জানো

সূচি ও ৩৪০ পৃষ্ঠার মুদ্রিত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীর সারণী ব্যবহার করে দেখাও যে প্রাচীন রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে এই পাঠ্যপুস্তকে কী কী যুগবিভাগ করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রলক্ষণ নির্দেশ করো:

ক) যুগের প্রারম্ভ ও অন্তিমে রোম রাষ্ট্রের সীমানা; মানচিত্রে তা দেখাও।

খ) পূর্ববর্তী আমলের পরিপ্রেক্ষিতে রোমের অর্থনীতিতে ও বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থায় কী পরিবর্তন এসেছিল?

গ) জনসংখ্যার কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলেছিল? এই সংগ্রামের উৎপত্তি কোত্থেকে? তার প্রকাশই-বা কিসের মধ্যে ঘটতো?

ঘ) রোম রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কোন্ নিয়মে পরিচালিত হতো? উক্ত যুগে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? রোমের সেনাবাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যুগে যুগে কীভাবে তা পরিবর্তিত হচ্ছিল?

ঙ) বিভিন্ন যুগে রোমের ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটনা কী কী ঘটেছিল?

রোমের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের চরিত্রলক্ষণ পৃথক-পৃথকভাবে যদি অনুধাবন করো তা হলে ইতিহাসের রূপরেখাটি বুঝতে সুবিধে হবে।

*বিভিন্ন যুগের চরিত্রলক্ষণ নির্ধারিত করে 'গ্রীক ইতিহাসের মূল যুগবিভাগ' নামাঙ্কিত সারণী অনুসরণে 'প্রাচীন রোমের ইতিহাস' সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত সারণীটি পূরণ করো:

রোমের ইতিহাসের মূল যুগবিভাগ	রোম রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা	অর্থনীতিতে ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা পরিবর্তন	জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রাম	রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতি	সন-তারিখসহ প্রধান প্রধান ঘটনা

দেখো তো, প্রাচীন যুগের ইতিহাসের মূল কথাগুলো মনে আছে কিনা

সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ প্রথমে আদিম গোষ্ঠীসমাজের জীবন যাপন করতো।

প্রাচীন মানুষের আদিম গোষ্ঠীসমাজের জীবনের মূল লক্ষণগুলো কী কী? প্রাচীন মানুষ প্রথমে কেন আদিম গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে বসবাস করতো? প্রাচীন মানুষ কী জানতো, কী কী কাজ আয়ত্ত করেছিল?

আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ প্রথম শুরু হয়েছিল সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশে।

সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির কোন্ কোন্ দেশের অধিবাসী আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ প্রথম শুরু করেছিল? এই উত্তরণ কেনই-বা এই সব দেশে প্রথম শুরু হয়েছিল — তার কারণ দর্শাও। মোটামুটি কোন্ সময়ে তা শুরু হয়? সুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশের সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল? এবং তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের সংগ্রাম চলেছিল?

অসীম ক্ষমতার অধিকারী অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশাল কয়েকটি রাষ্ট্র দেখা দিয়েছিল প্রাচ্যভূমিতে।

শ্রেণীর উদ্ভব ঘটার সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হলো কেন? প্রাচীন কালে প্রাচ্যভূমিতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশাল কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের কথা তোমার মনে আছে? মানচিত্রে সেগুলো দেখাও।

সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সুপ্রাচীন প্রাচ্যের জনগণ বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

কৃষিকাজ, পশুপালন, হস্তশিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন, লিপি আবিষ্কার ও শিল্পচর্চা ইত্যাদির বিকাশে প্রাচীন কালের প্রাচ্য জনগণের অবদান কী?

ইউরোপে দাসতান্ত্রিক প্রথম দেখা দেয় গ্রীসে। প্রাচ্য দেশসমূহ অপেক্ষা এখানে এই সমাজ অনেক বেশি বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

কোন্ সময়ে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজ দেখা দিয়েছিল? তার কারণ কী ছিল? কোন্ সময়ে এই সমাজ সর্বাপেক্ষা বিকাশ লাভ করেছিল? প্রাচ্য দেশ-সমূহের সাথে তুলনায় গ্রীসের দাসতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী ছিল? দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসরা গ্রীসে কী ধরনের সংগ্রাম চালিয়েছিল?

ভূমধ্যসাগর এবং তৎসন্নিহিত অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে গ্রীক নগর-রাষ্ট্র অত্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

প্রাচীন কালে গ্রীক ও প্রাচ্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কোন্ দিক থেকে ছিল? গ্রীস ও প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের লক্ষ্যের সাদৃশ্য ছিল কীসে?

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি উন্নতির শিখর স্পর্শ করেছিল।

হেল্লেনীয় সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশের কারণ কী? প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও শিক্ষাদীক্ষার যে চরম বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ কী?

ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে গ্রীক-মাকিদোনীয় রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব এবং দাসমালিকভিত্তিক অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি ঘটে।

আলেকজাণ্ডারের বাহিনী কবে প্রাচ্যে অভিযান করেছিল? মাকিদোনীয় বাহিনীর বিজয়ের ফলে যে সব শক্তিশালী ও বিশাল রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর অবস্থা মানচিত্রে দেখাও। মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে প্রাচ্য জনগণের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল?

গ্রীক ও প্রাচ্য সংস্কৃতির ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা নতুনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।	খ্রী. পূ. ৩য়-২য় শতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে সংস্কৃতির তুঙ্গস্পর্শী বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ কী? উদাহরণ সহযোগে তোমার বক্তব্য প্রমাণ করো।
প্রাচীন কালে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল রোম।	রোমে প্রজাতন্ত্রের পত্তন হয়েছিল কবে? সাম্রাজ্যের পত্তনই-বা রোমে কখন হয়? রোমের রাষ্ট্রসীমা কোন্ সময়ে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রূপ লাভ করে? তোমার জানা পূর্ববর্তী আর কোন্ রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল?
প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিকে রোমবাসীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল এবং তাদের নিজেদেরও সাংস্কৃতিক অবদান ছিল বিরাট।	রোমকগণ তাদের দ্বারা বিজিত জনগণের সংস্কৃতির কী কী জিনিস গ্রহণ করেছিল? বিশ্ব-সংস্কৃতির বিকাশে রোমের তাৎপর্য কী? প্রাচীন কালে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যে যে অসংগতি ছিল তার প্রমাণ মেলে কীসে?
রোমে দাসতান্ত্রিক সমাজ যেরকম বিকাশ লাভ করেছিল পূর্বে কোথাও তেমন ঘটে নি।	দাসতান্ত্রিক সমাজ যে রোমে সর্বাপেক্ষা বিকশিত হয়েছিল তা প্রমাণ করো। এই বিকাশের পিছনে কারণ কী ছিল? উদাহরণ সহযোগে দেখাও যে, রোমক প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্য উভয়েই দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের মূল স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছিল।
দাসতান্ত্রিক সমাজের বিকাশই রোম রাষ্ট্রের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।	রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অবক্ষয় ও সমগ্র সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেন ও কীভাবে দাসতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ দায়ী?

প্রাচীন রোমের ইতিহাসের কালপঞ্জী

যুগবিভাগ	কোন শতাব্দী	প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার সন-তারিখ
রোমে দাসমালিক-ভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন	৮ম	খ্রী. পূ. ৭৫৩ অব্দ। কিংবদন্তী অনুযায়ী রোম নগরীর পত্তন
	৭ম	
	৬ষ্ঠ	খ্রী. পূ. ৫০৯ অব্দ। রোমে প্রজাতন্ত্র গঠন
	৫ম	
	৪র্থ	
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমের সুদৃঢ় অধিকার পত্তন	৩য়	খ্রী. পূ. ২১৮-২০১ সাল। ২য় পুনিক যুদ্ধ
	২য়	খ্রী. পূ. ১৩৩ সাল। তিবেরিউস্ গ্রাখিউসের ভূমি-সংস্কার আইন
	১ম	খ্রী. পূ. ৭৪-৭১ সাল। স্পার্তাক্যুসের বিদ্রোহ খ্রী. পূ. ৪৯ সাল। সীজার কর্তৃক রোমের শাসনক্ষমতা দখল
প্রজাতন্ত্রের পতন। সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির কাল	১ম	খ্রী. পূ. ৩০ সাল — ১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ওক্তাভিয়ানের রাজত্বকাল
	২য়	১১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ। ইম্পেরাতোর ত্রাইয়ানের সময়ে রোমের সর্বশেষ যুদ্ধ
রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ধ্বংস	৩য়	২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। দিওক্লেতিয়ানের শাসনকাল শুরু
	৪র্থ	৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত
	৫ম	৪১০ খ্রীষ্টাব্দ। গথদের রোম দখল ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন

উপসংহার

বিগত দশ লক্ষ বৎসর ধরে মানুষ যে সুদীর্ঘ ও সুকঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছে তার সাথে তোমরা পরিচিত হলে। সেই পথের প্রারম্ভে মানুষ যেমন পশুসদৃশ ছিল, তেমনি ঠিক 'তাদের মতোই ছিল সহায়সম্পদহীন'। আদিম মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ও পরিশ্রমের দৌলতে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে জয়লাভই শুধু করে নি, নিজেরাও ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছিল, পূর্ণতর রূপ দিতে পেরেছিল শ্রম-হাতিয়ারের ও তার বিভিন্ন প্রয়োগের, এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আদিম মানুষের কঠিন জীবন ও তার জ্ঞানের সংকীর্ণতা ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল।

শ্রম-হাতিয়ারের উন্নতি ও আদিম মানুষের দ্বারা তার প্রয়োগের ফলে মানুষের শ্রম পূর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠলো, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ সম্ভব করে তুললো। এ থেকেই ধীরে ধীরে উদ্ভূত হলো শ্রেণী, গঠিত হলো দাসতান্ত্রিক সমাজ।

দাসতান্ত্রিক সমাজ মানুষের জীবনে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এলো: নিষ্ঠুর অত্যাচার, অসহনীয় লাঞ্ছনা, যুদ্ধের রক্তবন্যা। তা সত্ত্বেও আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে মানুষের উত্তরণ এক বিরাট পদক্ষেপ। অগণিত দাস ও দরিদ্রের শ্রমে অনাবাদী জমি ও অরণ্যকে শস্যক্ষেত্র ও ফলোদ্যানে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল, সম্ভব হয়েছিল নগরনির্মাণ, সমুদ্রপথে জাহাজে করে দূরদূরান্ত পাড়ি দেওয়া। দাস ও দরিদ্র মানুষকে শোষণের ফলে আবার অন্যদিকে কিছু লোক বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চা করতে পেরেছিল। সুপ্রাচীন কালে পৃথিবীতে লিপি উদ্ভাবন, বিজ্ঞানসাধনা ও শিল্পনির্মাণ সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে অবদান রেখেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মের বিরুদ্ধতা করে আসছে।

দাসতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ আবার নিজেকেই নিজের ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আদি যুগে শ্রম-হাতিয়ার এত সাধারণ ধরনের ছিল যে, তার প্রয়োগ ব্যাপারে দৈহিক শক্তিই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা। সে কারণে খনি, কর্মশালা,

জাহাজে ও কৃষিকাজে দাসশ্রমকে বিপ্লুলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। দাসদের শ্রমের ফলে স্বাধীন লোকজনদের শ্রম কমে যায়। দাসশ্রমের মান ছিল অতিশয় নিম্নস্তরের, সে অবস্থায় কারিগরির উন্নতি প্রায় অসম্ভব ছিল।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বিকাশে দাসতান্ত্রিক সমাজ ক্রমশ বাধা হয়ে তো দাঁড়ালোই, উপরন্তু তাদের পতন অনিবার্য করে তুললো। অত্যাচারিত ও শোষিতের শ্রেণীসংগ্রাম দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রের শক্তি ধ্বংস করে দেয়।

দাসতান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করে তুলেছিল।